সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য

গোপালচন্দ্র রায়

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক—
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : শ্রীতপন কর

প্রথম প্রকাশ—
পৌষ, ১৩৬৬

সাহিত্য মুদ্রণ (এ ১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০৭৩) এর
পক্ষে গোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র—

15th April 81

Morning — arranged papers for one hour. Read with [illegible] an article for [illegible] } 2 hours

Noon — Wrote 7 letters private &c. for 2 hours } 5 hrs
Superintended [illegible] for 3 hours }

Evening — Felt exhaustion, was very sleepy — 7 hrs

There was a great hail storm just before candle light. [illegible] Chala was blown down; a part of the great [illegible] gave way.

From this date I am no longer in the service; my leave expired yesterday and I sent in my resignation on that day.

On the suggestion of [illegible] Prasanna drew out a notification for [illegible]. This day I saw its proof.

ডায়রির একটি পৃষ্ঠা

জীবনী

সঞ্জীবচন্দ্রের অনুজ 'সাহিত্য-সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের একটি ছোট অথচ সুন্দর জীবনী লিখে গেছেন। সেইটিই সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র জীবনী।

সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' নামে দুটি গল্প এবং 'পালামৌ' ভ্রমণ কাহিনীটি নিয়ে তার সঙ্গে নিজের লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের এই জীবনীটি দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা' নামে একটি গ্রন্থ করে দিয়ে ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রকে জানতে বা বুঝতে হ'লে তাঁর জীবনী জানা আগে দরকার। তাই আমরা সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলার আগে, বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ঐ জীবনীটিই প্রথমে এখানে উদ্ধৃত করছি। পরে সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে অন্যে যা বলেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর ঐ 'জীবনী'তে সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে যে কথা বলেন নি, সে সম্বন্ধে কিছু বলবো।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীটি এই—

প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃত কাযের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য দেশকালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন ভস্মাচ্ছন্ন, কখন প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেন না অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।

ইহার মধ্যে কোন্ কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ইঁহার প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র, কিন্তু সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র নামই ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত নামের আশ্রয় লইয়াই এই সংগ্রহের নাম দিয়াছি, সঞ্জীবনী সুধা।) তাঁহার জীবিত কালে, বাঙ্গালা সাহিত্য সভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে এ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা যিনি

তাঁহার গ্রন্থগুলি যত্নপূর্বক পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন, কালে সে আসন প্রাপ্ত হইবেন। আমি বা চন্দ্রনাথবাবু এক এক কলম লিখিয়া, তাঁহাকে এক্ষণে সে স্থান দিতে পারিব, এমন ভরসায় আমি উপস্থিত কর্মে ব্রতী হই নাই। তবে আমাদের এক অতি বলবান সহায় আছে। কাল আমাদের সহায়। কালক্রমে ইহা অবশ্য ঘটিবে। আমরাও কালের অনুচর; তাই কাল-সাপেক্ষ কার্যের সূত্রপাতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার সহোদর। আমি ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ তাঁহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্য যাহা করিয়াছি, আমার অগ্রজের জন্য তাহাই করিতেছি। তবে ভ্রাতৃস্নেহ-সুলভ পক্ষপাতের পরিবাদ ভয়ে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ করিলাম না। সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার ও আমার পরম সুহৃদ বিখ্যাত সমালোচক বাবু চন্দ্রনাথ বসু এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে ও পাঠকবর্গকে বাধিত করিয়াছেন।

জীবনী লিখিবারও আমি উপযুক্ত পাত্র নহি। যাঁহার জীবনী লেখা যায়, তাঁহার দোষগুণ উভয়ই কীর্তন না করিলে জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় না—জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মানুষেরই দোষ গুণ দুই-ই থাকে; আমার অগ্রজেরও ছিল। কিন্তু তাঁহার দোষ কীর্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; আমি তাঁহার গুণকীর্তন করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না; ভ্রাতৃস্নেহ-জনিত পক্ষপাতের ভিতর ফেলিবে। কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আমি ভিন্ন আর কেহ সবিশেষ জানে না—সুতরাং আমিই লিখিতে বাধ্য।

লিখিতে গেলে, তাঁহার দোষগুণের কথা কিছুই বলিব না, এমন প্রতিজ্ঞা করা যায় না। কেন না, কিছু কিছু দোষগুণের কথা না বলিলে ঘটনাগুলি বোঝান যায় না। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার দোষে বা তাঁহার গুণে ঘটিয়াছিল। কি দোষে, কি গুণে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে হইবে। তবে যাহাতে গুণ দোষের কথা খুব কম হয়, সে চেষ্টা করিব।

অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় একশ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব তীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়া ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়

মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল স্থানান্তরবাসী।

সেই কাঁটালপাড়া সঞ্জীবচন্দ্রের জন্মভূমি। (জীবনী লিখিবার অনুরোধে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও কেবল সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়া লিখিতে বাধ্য হইতেছি। প্রথাটা অত্যন্ত ইংরেজী রকমের, কিন্তু যখন আমার পরম সুহৃদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্তবাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এই প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছেন, 'তখন' মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।' বিশেষ তিনি আমারই 'দাদামহাশয়'। কিন্তু পাঠকের কাছে সঞ্জীবচন্দ্র মাত্র। অতএব দাদামহাশয়, দাদামহাশয়, পুনঃ পুনঃ পাঠকের রুচিকর না হইতে পারে।) তিনি কথিত রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র; পরমারাধ্য ৺ যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইঁহার জন্ম। যাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণার্থ ইহা লেখা আবশ্যক যে, তাঁহার জন্মকালে তিনটি গ্রহ অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, রাহু, তুঙ্গী এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে লগ্নাধিপতি ও দশমাধিপতি অস্তমিত। দেখিবেন, ফল মিলিয়াছে কিনা।

সে সময়ে গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালার গুরুমহাশয় শিক্ষামন্দিরে দ্বার রক্ষক ছিলেন; তাঁহার সাহায্যে সকলকেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অতএব সঞ্জীবচন্দ্র যথাকালে এই বেত্রপাণি দৌবারিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন। গুরুমহাশয় যদিও সঞ্জীবচন্দ্রের বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি হাট বাজার করা ইত্যাদি কার্যে তাঁহার মনোভিনিবেশ বেশী ছিল; কেন না, তাহাতে উপরি লাভের সম্ভাবনা। সুতরাং ছাত্রও বিদ্যার্জনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। লাভের ভাগটা গুরুরই গুরুতর রহিল।

এই সময়ে আমাদিগের পিতা মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টরী করিতেন। আমরা সকলে কাঁটালপাড়া হইতে তাঁহার সন্নিধানে নীত হইলাম। সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুরের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিছুকালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছুদিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন 'গুরুমহাশয়' নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয় ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন। কেন না, আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন।

সৌভাগ্য ক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম। সেখানে সঞ্জীবচন্দ্র আবার মেদিনীপুরের ইংরেজী স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন।

সেখানে তিন চারি বৎসর কাটিল। সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াসেই সর্বোচ্চ শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন। এইখানে তিনি তখনকার প্রচলিত Junior Scholarship পরীক্ষা দিলে, তাঁহার বিদ্যার্জনের পথ সুগম হইত। কিন্তু বিধাতা সেরূপ বিধান করিলেন না। পরীক্ষার অল্প কাল পূর্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম। সঞ্জীবচন্দ্রকে আবার হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইতে হইল। Junior Scholarship পরীক্ষায় বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এই সকল ঘটনাগুলিকে গুরুতর শিক্ষা বিভ্রাট বলিতে হইবে। আজি এ স্কুলে কাল ও-স্কুলে, আজি গুরুমহাশয়, কালি মাষ্টার, আবার গুরুমহাশয় আবার মাষ্টার, এরূপ শিক্ষা বিভ্রাট ঘটিলে কেহই সুচারু রূপে বিদ্যোপার্জন করিতে পারে না। যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের উচ্চতর চাকরি করেন, তাঁহাদের সন্তানগণকে প্রায় সচরাচর এইরূপ শিক্ষাবিভ্রাটে পড়িতে হয়। গৃহকর্তার বিশেষ মনোযোগ, অর্থব্যয় এবং আত্মসুখের লাঘব স্বীকার ব্যতীত ইহার সদুপায় হইতে পারে না।

কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, দুই দিকেই বিষম সংকট। বালক বালিকাদিগের শিক্ষা অতিশয় সতর্কতার কাজ। এক দিকে পুনঃ পুনঃ বিদ্যালয় পরিবর্তনে বিদ্যা শিক্ষার অতিশয় বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা; আর দিকে আপনার শাসনে বালক না থাকিলে বালকদের বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য বা কুসংসর্গ ঘটনা খুব সম্ভব। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে প্রথমোক্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে অদৃষ্টদোষে দ্বিতীয় বিপদেও তাঁহাকে পড়িতে হইল। এই সময় পিতৃদেব বিদেশে, আমাদিগের সর্বজ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকরি উপলক্ষে বিদেশে। মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র বালক হইলেও কর্তা—

Lord of himself, that heritage of woe!

কাজেই কতকগুলা বিদ্যানুশীলন-বিমুখ ক্রীড়া কৌতুক-পরায়ণ বালক—ঠিক বালক নহে, বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল।

সঞ্জীবচন্দ্র চিরকাল সমান উদার, প্রীতি পরবশ। প্রাচীন বয়সেও আশ্রিত অনুগত ব্যক্তি কুস্বভাবাপন্ন হইলেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

কৈশোরে যে তাহা পারেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কাজেই বিদ্যাচর্চার হানি হইতে লাগিল। নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে তাহা কিছু কালের জন্য একেবারে বন্ধ হইল।

হুগলী কলেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষার সময় উপস্থিত। একদিন হেড মাষ্টার গ্রেবস্ সাহেব আসিয়া কোন্ দিন কোন্ ক্লাসের পরীক্ষা হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া গেলেন। সঞ্জীবচন্দ্র কলেজ হইতে বাড়ী আসিয়া স্থির করিলেন, এ দুইদিন বাড়ী থাকিয়া ভাল করিয়া পড়াশুনা করা যাউক, কলেজে যাইব না, পরীক্ষার দিন যাইব। তাহাই করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের ক্লাসের পরীক্ষার দিন বদল হইল। অবধারিত দিবসের পূর্বদিন পরীক্ষা হইবে স্থির হইল। আমি সে সন্ধান জানিতে পারিয়া, অগ্রজকে তাহা জানাইলাম। বুঝিলাম যে, তিনি পরীক্ষা দিতে কলেজে যাইবেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন কলেজে যাইবার সময় দেখিলাম, তিনি উপরি লিখিত বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে একজনের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলিতেছেন। বিদ্যার মধ্যে এইটি তাহারা অনুশীলন করিত, এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে এ বিদ্যা দান করিয়াছিল। আমি তখন পরীক্ষার কথাটা সঞ্জীবচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। কিন্তু বানর সম্প্রদায় সেখানে দলে ভারি ছিল; তাহারা বাদানুবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিল যে, আমি অতিশয় দুষ্ট বালক। কেন না, লেখাপড়া করার ভাণ করিয়া থাকি; এবং কখন কখন গোয়েন্দাগিরি করিয়া বানর সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ মাতৃদেবীর শ্রীচরণে নিবেদন করি। কাজেই ইহাই সম্ভব যে আমি গল্পটা রচনা করিয়া বলিয়াছি। সরলচিত্ত সঞ্জীবচন্দ্র তাহাই বিশ্বাস করিলেন। পরীক্ষা দিতে গেলেন না। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে কাজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন না। ইহাতে এমন ভগ্নোৎসাহ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ কলেজ পরিত্যাগ করিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না।

তখন পিতাঠাকুর বর্দ্ধমানে ডেপুটি কালেক্টর। তখন রেল হয় নাই; বর্দ্ধমান দূর দেশ। এই সম্বাদ যথাকালে তাঁহার কাছে পৌঁছিল। তাঁহার বিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল; তিনি এই সম্বাদ পাইয়াই পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার স্বভাবচরিত্র বিলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন যে, ইহাকে তাড়না করিয়া আবার কলেজে পাঠাইলে এখন কিছু হইবে না, যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যোপার্জন করিবে, তখন সুফল ফলিবে।

তাহাই ঘটিল। সহসা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা জ্বলিয়া উঠিল। যে আগুন

এতদিন ভস্মাচ্ছন্ন ছিল, হঠাৎ তাহা জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া চারিদিক্ আলো করিল। এই সময়ে আমাদিগের সর্বাগ্রজ ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বারাকপুরে চাকরি করিতেন। তখন সেখানে গবর্ণমেণ্টের একটি ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র Junior Scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি এরূপ প্রস্তুত হইলেন যে সকলেই আশা করিল যে, তিনি পরীক্ষায় বিশেষ যশ লাভ করিবেন। কিন্তু বিধিলিপি এই যে, পরীক্ষায় তিনি চিরজীবন বিফল যত্ন হইবেন। এবার পরীক্ষার দিন তাঁহার গুরুতর পীড়া হইল; শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তারপর আর সঞ্জীবচন্দ্র কোন বিদ্যালয়ে গেলেন না। বিনা সাহায্যে, নিজ প্রতিভা বলে, অল্পদিনে ইংরেজী সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষা লাভ করিলেন। কলেজে যে ফল ফলিত, ঘরে বসিয়া তাহা সমস্ত লাভ করিলেন।

তখন পিতৃদেব বিবেচনা করিলেন যে, এখন ইহাকে কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে বর্দ্ধমান কমিশনরের আপিসে একটি সামান্য কেরাণিগিরি করিয়া দিলেন। কেরাণিগিরিটি সামান্য, কিন্তু উন্নতির আশা অসামান্য। তাঁহার সঙ্গে যে যে সে আপিসে কেরাণিগিরি করিত, সকলেই পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিল। ইনিও হইতেন, উপায়ান্তরে হইয়াও ছিলেন। কিন্তু এ পথে আমি একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিলাম। তিনি যে একটি ক্ষুদ্র কেরাণিগিরি করিতেন, ইহা আমার অসহ্য হইত। তখন নূতন প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিয়াছিল; তাহার 'Law Class' তখন নূতন। আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন যে কেহ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়া, কেরাণিগিরিটি পরিত্যাগ করাইয়া ল-ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম। আমি শেষ পর্যন্ত রহিলাম না; দুই বৎসর পড়িয়া চাকরি করিতে গেলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত রহিলেন। কিন্তু পড়াশুনায় আর মনোযোগ করিলেন না। পরীক্ষার সুফল বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই; পরীক্ষায় নিষ্ফল হইলেন। তখন প্রতিভা ভস্মাচ্ছন্ন। তখন উদারচেতা মহাত্মা, এ সকল ফলাফল কিছু মাত্র গ্রাহ্য না করিয়া কাঁটালপাড়ায় মনোহর পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। পিতা-ঠাকুর মনে করিলেন, পুত্র পুষ্পোদ্যানে অর্থব্যয় করা অপেক্ষা, অর্থ উপার্জন

করা ভাল। তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহা করিতেন। তখন উইলসন সাহেব নূতন ইন্‌কাম টেক্স বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় জেলায় আসেসর নিযুক্ত হইতেছিল। পিতাঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রকে আড়াইশত টাকা বেতনের একটি আসেসরিতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন।

কয়েক বৎসর আসেসরি করা হইল। তারপর পদটা এবলিশ হইল। পুনশ্চ কাঁটালপাড়ায় পুষ্পপ্রিয়, সৌন্দর্যপ্রিয়, সুখপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র আবার পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার একটা বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন যে, পিতৃদেবের দ্বারা নূতন শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পুষ্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার উপর শিব মন্দির প্রস্তুত করাইলেন। দুঃখে সঞ্জীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিত প্রতিভা আবার জ্বলিয়া উঠিল—সেই অগ্নি-শিখায় জন্মিল—'Bengal Ryot'।

এই পুস্তকখানি ইংরেজীতে লিখিত। এখনকার পাঠক জানেন না যে, এ জিনিসটা কি? কিন্তু একদিন এই পুস্তক হাইকোর্টের জজদিগেরও হাতে হাতে ফিরিয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রণয়নে সঞ্জীবচন্দ্র বিস্ময়কর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কাঁটালপাড়া হইতে দশটার সময়ে ট্রেনে কলিকাতায় আসিয়া রাশি রাশি প্রাচীন পুস্তক ঘাঁটিয়া অভিলষিত তত্ত্ব সকল বাহির করিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী যাইতেন। রাত্রে তাহা সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাতে আবার কলিকাতায় আসিতেন। পুস্তক খানির বিষয়, (১) বঙ্গীয় প্রজাদিগের পূর্বতন অবস্থা, (২) ইংরেজের আমলে প্রজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত ও ফলাফল বিচার, (৩) ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার, (৪) প্রজাদিগের উন্নতির জন্য যাহা কর্ত্তব্য।

পুস্তকখানি প্রচারিত হইবা মাত্র বড় বড় সাহেব মহলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী চাপমান সাহেব স্বয়ং কলিকাতা রিবিউতে ইহার সমালোচনা করিলেন। অনেক ইংরেজ বলিলেন যে, ইংরেজেও এমন গ্রন্থ লিখিতে পারেন নাই। হাইকোর্টের জজেরা ইহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরাণী দাসীর মোকদ্দমায় ১৫ জন জজ ফুল বেঞ্চে বসিয়া প্রজা পক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ অনেক

পরিমাণে তাহার প্রবৃত্তি দায়ক। গ্রন্থখানি দেশের অনেক মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে লোপ পাইয়াছে; তাহার কারণ, ১৮৫৯ সালের দশ আইন রহিত হইয়াছে; Hills vs Iswar Ghose মোকদ্দমার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। এই দুই ইহার লক্ষ্য ছিল।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি ডেপুটি ম্যাজেষ্ট্রেটি উপহার দিলেন। পত্র পাইয়া সঞ্জীবচন্দ্র আমাকে বলিলেন, 'ইহাতে পরীক্ষা দিতে হয়; আমি কখন পরীক্ষা দিতে পারি না, সুতরাং এ চাকরি আমার থাকিবে না।'

পরিশেষে তাহাই ঘটিল। কিন্তু এক্ষণে সঞ্জীবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে নিযুক্ত হইলেন। তখনকার সমাজের ও কাব্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র তখন তথায় বাস করিতেন। ইঁহাদের পরস্পরে আন্তরিক অকপট বন্ধুতা ছিল; উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মা ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট সমাগত হইতেন। দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশয় সুরসিক ছিলেন। সরস কথোপকথন-তরঙ্গে প্রত্যহ আনন্দস্রোত উচ্ছলিত হইত। কৃষ্ণনগর বাস কালই সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে সর্বাপেক্ষা সুখের সময় ছিল। শরীর নীরোগ, বলিষ্ঠ, অভিলষিত পদ, প্রয়োজনীয় অর্থাগম, পিতামাতার অপরিমিত স্নেহ, ভ্রাতৃগণের সৌহৃদ্য, পারিবারিক সুখ এবং বহু সংসুহৃদ-সংসর্গসঞ্জাত অক্ষুণ্ণ আনন্দ প্রবাহ। মনুষ্য যাহা চায়, সকলই তিনি এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

দুই বৎসর এইরূপে কৃষ্ণনগরে কাটিল, তাহার পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কোন গুরুতর কার্যের ভার দিয়া পালামৌ পাঠাইলেন। পালামৌ তখন ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস ভূমি, বন্য প্রদেশমাত্র। সুহৃদপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র সে বিজন বনে একা তিষ্ঠিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন। বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে হইল, কিন্তু যে দিন পালামৌ পৌছিলেন, সেই দিনই পালামৌর উপর রাগ করিয়া বিনা বিদায়ে চলিয়া আসিলেন। আজিকার দিনে এবং সেকালেও এরূপ কাজ করিলে চাকরি থাকে না। কিন্তু তাঁহার চাকরি রহিয়া গেল। আবার বিদায় পাইলেন। আর পালামৌয়ে গেলেন না। কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্পকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়া গেল! 'পালামৌ' শীর্ষক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে

প্রকাশিত হয়। প্রকাশ কালে তিনি নিজের রচনা বলিয়া ইহা প্রকাশ করেন নাই। 'প্রমথনাথ বসু' ইতি কাল্পনিক নামের আদ্যক্ষর সহিত ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি এগুলি লিখিয়াছিলেন, অতএব এগুলি যে তাঁহার রচনা, তদ্বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এবার বিদায়ের অবসানে তিনি যশোহরে প্রেরিত হইলেন। সে স্থান অস্বাস্থ্যকর, তথায় সপরিবারে পীড়িত হইয়া আবার বিদায় লইয়া আসিলেন। তারপর অল্পদিন আলিপুরে থাকিয়া পাবনায় প্রেরিত হইলেন।

ডিপুটিগিরিতে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অদৃষ্ট তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কর্ম গেল। তাঁহার নিজ মুখে শুনিয়াছি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হইয়াছিল। কিন্তু বেঙ্গল আপিসের কোন কর্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্বক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে একথা জানাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম। জানানও হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

কথাটা অমূলক কি সমূলক, তাহা বলিতে পারি না। সমূলক হইলেও গবর্ণমেণ্টের এমন একটা গলৎ সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরাণি যদি কোন কৌশল করে, তবে সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ কথার আন্দোলনে যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা দুইদিক রাখা রকমের। সঞ্জীবচন্দ্র ডিপুটিগিরি আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটি চাকরি দিলেন। বারাসতে তখন একজন স্পেশিয়াল সব রেজিষ্ট্রার থাকিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।

যখন তিনি বারাসতে, তখন প্রথম সেন্‌সস্ হইল। এ কার্যের কর্তৃত্ব Inspector General of Registration এর উপর অর্পিত। সেন্‌সসের অংক সকল ঠিকঠাক্ দিবার জন্য হাজার কেরাণি নিযুক্ত হইল। তাহাদের কার্যের তত্ত্বাবধানের জন্য সঞ্জীবচন্দ্র নির্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন।

এ কার্য শেষ হইলে পরে, সঞ্জীবচন্দ্র হুগলীর Special Sub Registrar হইলেন। ইহাতে তিনি সুখী হইলেন; কেন না, তিনি বাড়ি হইতে আপিস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে হুগলীর সাব রেজিষ্ট্রারী পদের বেতন

কমান' গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হওয়ায়, সঞ্জীবচন্দ্রের বেতনের লাঘব না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি বৰ্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

বৰ্দ্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্র খুব সুখে ছিলেন। এইখানে থাকিবার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে। বাল্যকাল হইতেই সঞ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার বাল্যরচনা কখন প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণেও বিদ্যমান নাই। কিশোর বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত শশধর নামক পত্রে তিনি দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসিতও হইয়াছিল। তাহার পর অনেক বৎসর বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বড় সম্বন্ধ রাখেন নাই। ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আমি 'বঙ্গদর্শন' সৃষ্টি করিলাম। ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়িতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নাম দিলেন 'বঙ্গদর্শন প্রেস'। তাঁহার অনুরোধে বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনে দুই একটা প্রবন্ধ লিখিলেন। তখন আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে, আর একখানা ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায় তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে, তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানুসারে তিনি 'ভ্রমর' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন; আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ সচরাচর করিতেন না। এই সংগ্রহে যে দুটি উপন্যাস দেওয়া গেল, তাহা ভ্রমরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক কাজ তিনি নিয়মিত অধিক দিন করিতে ভাল বাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া গেল। আমিও ১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিলে পর, তিনি আমার নিকটে ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। পূর্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে

বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা পূর্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন। অনেক নূতন লেখক যাঁহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও লিখিতে লাগিলেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী' তাঁহার সম্পাদকতা কালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া, 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'পালামৌ', 'বৈজিকতত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে এবং কার্যাধ্যক্ষের কার্যের বিশৃংখলতায় বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না। এক মাস, দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর বাকি পড়িতে লাগিল।

বর্দ্ধমানেরও স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রীর বেতন কমিয়া গেল। এবার সঞ্জীবচন্দ্রকে যশোহর যাইতে হইল। তাঁহার যাওয়ার পরে, বার্টন নামা একজন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর হইয়া সেখানে আসিল। যে কালেক্টর, সেই ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই রেজিষ্ট্রার। ভারতে আসিয়া বার্টনের একমাত্র ব্রত ছিল—শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন বা পদচ্যুত করাইবেন, তাহাই তাঁহার কার্য। অনেকের উপর তিনি অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের উপরও আরম্ভ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন।

বাড়ী আসিলে পর আমাদিগের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। এতদিন তাঁহার ভয়ে সঞ্জীবচন্দ্র আপনার মনের বাসনা চাপিয়া রাখিয়া ছিলেন। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর আমরা দুইজনের দুইটি সংকল্প কার্যে পরিণত করিলাম। আমি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উঠিয়া আসিলাম—সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি ত্যাগ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় ও কার্যালয় কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন।

কিন্তু আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল। বঙ্গদশনের কোন কোন কর্মচারী এমন ছিল যে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয় যতদিন বর্ত্তমান ছিলেন ততদিন তিনি সে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে কাহার শস্য কাহার গৃহে যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক নাই যিনি মালিক, তিনি উদারতা এবং চক্ষুলজ্জাবশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকা কড়ি

'মুগুরি বাঁটা' হইতে লাগিল। প্রথমে ছাপাখানা গেল—শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাত মৃত্যু হইল।

তারপর সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বসিয়া রহিলেন। কয়েক বৎসর কেবল বসিয়া রহিলেন। কোন মতে কোন কার্যে কেহ প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। সে জ্বালাময়ী প্রতিভা আর জ্বলিল না। ক্রমশঃ শরীর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে ১৮১১ শকে বৈশাখ মাসে, জ্বর বিকারে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে (১) মাধবীলতা (২) কণ্ঠমালা (৩) জাল প্রতাপচাঁদ (৪) রামেশ্বরের অদৃষ্ট (৫) যাত্রা সমালোচন (৬) Bengal Ryot, এই কয়খানি পৃথক ছাপা হইয়াছে। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, এজন্য তাহাও এই সংগ্রহ ভুক্ত হইল।

সঞ্জীবচন্দ্রের ডেপুটির চাকরি

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের 'জীবনী'তে সঞ্জীবচন্দ্রের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাওয়া এবং সেই চাকরি হারানো সম্বন্ধে একটা বিবরণ পাওয়া গেল।

সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবেশী এবং উভয়েরই স্নেহভাজন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও সঞ্জীবচন্দ্রের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি চলে যাওয়া সম্বন্ধে একটা কাহিনী লিখে গেছেন। শাস্ত্রী মশায়ের সেই লেখাটি এই—

'সঞ্জীবচন্দ্র খুব রসিক লোক ছিলেন। একদিন একজন বড় সাহেবের সহিত রসিকতা করিতে গিয়া তাঁহার ডেপুটিগিরিটি যায়। সঞ্জীববাবু তখন প্রোবেশনারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। কয়েকটি পরীক্ষায় পাস হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪ সালে ডিষ্ট্রিক্ট টাউন্স অ্যাক্ট পাস হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজ সাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠিল—রাস্তার নাম দিতে হইবে। টিনের উপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় দিতে হইবে। সঙ্কল্প হইল ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজ সাহেব বলিলেন—'আরও ৭৫ টাকা চাই, কারণ বাঙ্গলা নামগুলা কে বুঝিবে? ও গুলা ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া দিতে হইবে। 'বৌমার গলি' বলিলে কেহই চিনিবে না, Daughter-in-Law's Lane বলিতে হইবে।' জজ সাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছেন না, অথচ তিনি বার বার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন—'৭৫ টাকায় হইবে না, আমি প্রস্তাব করি আরও ৩০০ টাকা দেওয়া দরকার।' জজ সাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন? কেন?' সঞ্জীববাবু বলিলেন—'আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজীতে তর্জমা করিতে হইবে। মনে করুন, কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে? উঁহাকে Black-footed friend বলিয়া তর্জমা করিতে হইবে।' সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। জজ সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি টুপি লইয়া কমিটি হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন—সঞ্জীব ভাল কাজ করিলে না। বাড়ি গিয়া উঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস।

সঞ্জীববাবু তিন দিন গেলেন, জজ সাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন। সাহেব দেখা করিলেন না।

সপ্তাহ খানেক পরে খবর আসিল জজ সাহেব সেক্রেটারী হইয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু তিন চারবার পরীক্ষা দিলেন কিছুতেই পাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার নাম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জজ সাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাস করিতে না পারিবার কার্য কারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন আছে।

তখন দিন কতক তিনি সাব রেজিষ্ট্রার থাকিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিবার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়।'

বঙ্কিমচন্দ্র এবং শাস্ত্রী মশায় উভয়েরই লেখায় দেখা যাচ্ছে যে, সঞ্জীবচন্দ্রের মতে তাঁর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরিটি যাওয়ার পিছনে একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে যদিও সঞ্জীবচন্দ্রের রসিকতার কাহিনীটি বা জজ সাহেবের সেক্রেটারী হওয়া ও সঞ্জীবচন্দ্রকে ফেল করানোর কথা নেই, তবুও তিনি বেঙ্গল অফিসের কর্মচারিটির ইচ্ছাপূর্বক ফেল করানোর যে কথাটি বলেছেন, সেই কথাটিকেই, সেক্রেটারী সাহেবের নির্দেশে ঐ কর্মচারিটি ঐরূপ করেছিল বলেও অনুমান করা যেতে পারে।

পরীক্ষায় পাস মার্ক থাকা সত্ত্বেও ঠিক ভুল করে ইচ্ছাপূর্বক সঞ্জীবচন্দ্রকে ফেল করানো হয়েছে, একথা সঞ্জীবচন্দ্রের মুখে শুনে বঙ্কিমচন্দ্র বড় সাহেবদের সে কথা জানাবার জন্য সঞ্জীবচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখেছেন—'কোন কেরাণি যদি কৌশল করে, তবে সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাগুলি থেকে যেন মনে হয়, সঞ্জীবচন্দ্রের চাকরি যাওয়ার ব্যাপারে তিনি সাহেবদিগকে নির্দোষ বলেই জানিতেন। তাই সেক্রেটারী সাহেবের চক্রান্তের কথা ও সঞ্জীবচন্দ্রের রসিকতার কাহিনীটি তাঁর জানা ছিল না, এমনও হতে পারে। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তাঁর রসিকতার কাহিনীটি গোপন করলে, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে তা না জানবারই কথা। কিন্তু একটা প্রশ্ন ওঠে, সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট একথা

গোপন করবেনই বা কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলেও এজন্য কথা শুনবার ভয়ে তিনি গোপন করতেও পারেন।

যে কর্মচারিটি ঠিক ভুল করে ইচ্ছাপূর্বক সঞ্জীবচন্দ্রকে ফেল করিয়েছিল, সেই কর্মচারিটি থেকে সেক্রেটারী সাহেব পর্যন্ত মাঝে নিশ্চয়ই আরও অনেক সাহেব কর্মচারী ছিল। বড় সাহেবদের জানানোর কথায় বঙ্কিমচন্দ্র যদি কেবল তাঁদেরই বুঝিয়ে থাকেন, তা হলে অবশ্য সেক্রেটারী সাহেবের কথা বাদ পড়ে এবং সঞ্জীবচন্দ্রের রসিকতার কাহিনীটি তাঁর জানা ছিল, এমন অনুমান করাও যেতে পারে। কিন্তু ঘটনাটি জানা থাকলে, তিনি উল্লেখ করবেনই না বা কেন? এরও উত্তরে বলা যেতে পারে, হয়তঃ বা অনাবশ্যক বোধেই উল্লেখ করেন নি।

যাই হোক, রসিকতার কাহিনীটি বঙ্কিমচন্দ্রের জানা থাকুক আর নাই থাকুক, ইচ্ছাপূর্বক যে সঞ্জীবচন্দ্রকে ফেল করানো হয়েছিল, একথা বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের মুখেই শুনেছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এবং শাস্ত্রী মশায় উভয়েরই লেখায় সঞ্জীবচন্দ্রের পরীক্ষায় ফেল হওয়ার পিছনে একটি চক্রান্তের সামঞ্জস্য দেখে শাস্ত্রী মশায় বর্ণিত সঞ্জীবচন্দ্রের রসিকতার কাহিনীটিকে সত্য বলেই মনে হয়।

পরীক্ষায় পাস মার্ক থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাপূর্বক সঞ্জীবচন্দ্রকে ফেল করানো হয়েছিল, এ কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের মুখে যেমন শুনেছিলেন, তেমনি শাস্ত্রী মশায় তাঁর বর্ণিত সঞ্জীবচন্দ্রের রসিকতার কাহিনীটি সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের মুখে শুনেছিলেন কিনা তার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। উল্লেখ না থাকলেও সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে শাস্ত্রী মশায়ের যথেষ্ট হৃদ্যতা ও মেলামেশা ছিল বলেই এটি তিনি সঞ্জীবচন্দ্রেরই মুখে শুনেছিলেন বলে ধরা যেতে পারে।

সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। আর শাস্ত্রী মশায় সঞ্জীবচন্দ্রের এই রসিকতার কাহিনীটি লেখেন ১৩২২ সালে বৈশাখ মাসের 'নারায়ণ' পত্রিকায়, অর্থাৎ সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর ২৬।২৭ বৎসর পরে। শাস্ত্রী মশায় অনেকদিন পরে কাহিনীটি লেখেন বলেই হোক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার বর্ণিত সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ রসিকতার কাহিনীটির মধ্যে দু একটা ছোটখাট ভুল থেকে গেছে। এইবার সেইগুলিরই আলোচনা করছি। যেমন—শাস্ত্রী মশায়ের লেখায় আছে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ডিষ্ট্রিক্ট টাউন্স অ্যাক্ট' পাস হওয়ার পর কমিটির এক দিনকার সভায় সঞ্জীবচন্দ্র

রসিকতা করেছিলেন এবং তারই ফলে জজ সাহেব সেক্রেটারী হয়ে সঞ্জীবচন্দ্রকে ফেল করিয়ে ছিলেন। কিন্তু কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম ভবনে প্রতিষ্ঠিত 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় রক্ষিত সঞ্জীবচন্দ্র সংক্রান্ত কাগজপত্র থেকে জানা যায়, সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পেয়ে ছিলেন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এবং তাঁর ঐ চাকরি যায় ১৮৬৯ এর ৫ই জুলাই

এখন কথা হচ্ছে, তাহলে শাস্ত্রী মশায় বর্ণিত ডিষ্ট্রিক্ট টাউনস অ্যাক্ট পাসের তারিখটি কি ছাপার ভুল, না তাঁর নিজেরই লেখার ভুল? এই তারিখটি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ না হয়ে আরও কয়েক বছর পিছিয়ে একটা তারিখ হলে হয়ত সমস্ত দিকেই একটা মিল হতে পারে। এইটাই ঠিক। কারণ, অনুসন্ধান করে জেনেছি, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিষ্ট্রিক্ট টাউনস অ্যাক্ট পাস হয়েছিল। তা হলে, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিষ্ট্রিক্ট টাউনস অ্যাক্ট পাস হওয়ার পর কোন এক সময়ে রাস্তার নাম করণ সংক্রান্ত সেই সভা (যাতে সঞ্জীবচন্দ্র রসিকতা করেছিলেন), তারপর সঞ্জীবচন্দ্রের পরীক্ষা এবং পরীক্ষায় ফেল হওয়া, সব দিক থেকে তারিখের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

এই তারিখের ভুল ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার সঙ্গে শাস্ত্রী মশায়ের বর্ণিত কাহিনীর আরও একটু অমিল রয়েছে। যেমন—শাস্ত্রী মশায় লিখেছেন—সঞ্জীবচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরিটি হারাইয়া দিন কতক সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিবার পর সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়।

শাস্ত্রী মশায়ের এই লেখাটা পড়লে মনে হবে—সঞ্জীবচন্দ্র 'দিন কতক' অর্থাৎ অল্প কয়েক দিন মাত্র সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন। আর ঐ চাকরিতে তিনি সুবিধা করতে পারেন নি। ফলে, হয় তিনি নিজে ঐ চাকরি ছেড়ে দিয়ে ছিলেন, নয়ত ঐ চাকরিটিও হারিয়ে বন্ধ বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নিয়ে ছিলেন।

শাস্ত্রী মশায়ের কথাগুলি ঠিক নয়। কারণ, আমরা জানি সঞ্জীবচন্দ্র 'দিন কতক' নয়, দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রারের চাকরি করেছিলেন। এবং বেশ দক্ষতার সহিতই এ চাকরি করেছিলেন। আর এই সাব রেজিষ্ট্রার থাকা কালেই নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি সাহিত্যিক বন্ধুদের অনুরোধে এবং বঙ্কিমচন্দ্রেরও ইচ্ছায় ১২৮৪ সালে বা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন।

আমি যে বলেছি, সঞ্জীবচন্দ্র দীর্ঘ ১২ বছর সাব রেজিষ্ট্রারের চাকরি করেছিলেন, তার প্রমাণ হিসাবে বারাসতে তাঁর স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রারের চাকরির নিয়োগ পত্র এবং তাঁর নিজের ডায়রি থেকে তাঁর এই চাকরি ছেড়ে দেওয়ার তারিখটিও এখানে পর পর উদ্ধৃত করছি—

R

No———

1372

From—illegible

Secretary to the Government of Bengal

To—Baboo Sunjeeb chunder Chatterjee,

Baraset

Fort William, the 18th Octr 1869

Appt, Dept.

Sir,

I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to officiate as special sub Regr of assurances of Baraset during the absence on deputation of Baboo Uma charan Gangooly or until further order, subject to any rules that may hereafter be passed in regard to the examination of Officers of the Registration Department.

2. You are requested to report yourself in person or by letter to the Registrar General from whom you will receive further instruction.

I have the honor to be

Sir

Your most obedient servant

illegible

Secretary to the Government of Bengal

এই নিয়োগ পত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের ঠিকানা কাঁটালপাড়ার বদলে বারাসত লেখা হয়েছে। তাই প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি সঞ্জীবচন্দ্র ১৮ই অক্টোবর (১৮৬৯) এর আগেই মুখের কথায় ঐ চাকরিতে ঢুকে তখন বারাসতবাসী হয়েছিলেন ?

যাই হোক্, দেখা গেল সঞ্জীবচন্দ্র জুলাই মাসে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি হারিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই সাব রেজিষ্ট্রারের চাকরিটি পেয়ে ছিলেন। এরও প্রায় দেড় মাস পরে তিনি ঐ বারাসতেরই স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রার পদে অস্থায়ী থেকে স্থায়ী হন।

তখনকার সেই নিয়োগ পত্রটি ছিল এই—

G
No——
369

From—H. S. Beadon Esq

Offg. Under-Secretary to the Government of Bengal

To—Babu Sunjeeb chunder chatterjee,

Offg. Sub Registrar of Baraset.

Fort William, the 5th Decr 1870

Appt. Dept.

Sir,

I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to be special Sub Registrar of Assurances of Baraset.

I have the honor to be

Sir,

Your most obedient Servant

H. S. Beadon

Offg. Under-Secretary to the

Government of Bengal

এবার সঞ্জীবচন্দ্রের ডায়রি থেকে তাঁর স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রারের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার লেখাটি উদ্ধৃত করছি—

15th April '81

From this date I am no longer in the service ; my leave expired yesterday and I sent in my resignation on that day.

অতএব দেখা যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬৯ থেকে ১৮৮১ পযন্ত স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন।

সাব রেজিষ্ট্রার থাকাকালে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর সম্বন্ধে উপরওয়ালাদের মন্তব্যগুলি রেজিষ্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে সংগ্রহ ক'রে একটি কাগজে লিখে রেখে ছিলেন। তিনি যে দক্ষ সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন, তার প্রমাণ হিসাবে সেই লেখা থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃত করছি—

Registration Dept.

1. Extract from a letter from P. Diskins Esq Registrar of Presidency District No. 94 of the 7th May 1870

'I desire to notice among Special Sub Registrars Babus ....and Sunjeeb chunder Chatterjee for the energy and care they have displayed.'

2. Extract from a letter from the Registrar General, No 2120 of the 9th July 1870 Para 9 to the Registrar of the Presidency District.

'Babu Sunjeeb chunder Chatterjee deserves great credit for his lucid and able report upon the state of the Satkhira office.'

3. Extract from a letter from the Registrar General to Babu Sunjeeb chunder Chatterjee Special Sub Registrar No. 3364 dated 25th November 1870

'I have to thank you for the suggestions you have offered in regard to the Registration Bill.'

4. Administration Report of the Registration Department for 1871—72, para 46 makes mention that Babu Sunjeeb chunder Chatterjee deserves credit for the manner in which he supervised his office.

5. Govt. Resolution dated 25th October 1872 para 27 noticed with pleasure the praise bestowed by the Inspector General upon Babu Sunjeeb chunder Chatterjee.

6. Govt. Resolution dated 11 January 1875 para 18 notices with pleasure the favourable testimony borne to the work done by Babu Sunjeeb chunder Chatterjee.

7. Extract from the administration Report of the District of Jessore No 1287 dated 18th May 1880

'The special Sub Registrar Babu Sunjeeb chunder Chatterjee has been of the most material assistance to me He takes a thoroughly intelligent interest in the work.'

এখানে এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে ২য় উদ্ধৃতিটিতে সাতক্ষীরার কথা আছে। মনে হয়, তখন সাতক্ষীরা বারাসতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সাতক্ষীরা বারাসত থেকে খুব বেশী দূরও নয়।) কেন না, সঞ্জীবচন্দ্র বারাসতের স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রার থাকাকালেই ১৮৭১ এর জুলাই মাসে ওখান থেকে হুগলীতে বদলি হয়ে আসেন। এ সম্পর্কে তাঁকে লেখা তখনকার সরকারী চিঠিটি এই—

G
No——
619

From R. H. Wilson Esq.

Offg. Under-Secretary to the Government of Bengal.

To Baboo Sunjeeb Chunder Chatterjee

Special Sub Registrar at Baraset

Dated Fort William, the 26th June 1871

Appointment Dept.

Sir,

I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to be Special Sub Registrar of Hooghly, with effect from 1st July 1871.

I have the honor to be

Sir,

Your most obedient servant

R. H. Wilson

Offg. Under-Secretory to the Government of Bengal.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্ত্রী মশায় বর্ণিত সঞ্জীবচন্দ্রের 'ব্ল্যাক ফুটেট ফ্রেণ্ড' রসিকতাটি নিয়ে তাঁর সম্পাদিত 'সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

'ক্ষুব্ধ জজ সাহেবের প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টার ফলে পরীক্ষায় ভালো লিখেও সঞ্জীবচন্দ্র অকৃতকার্য হলেন।* ছুটি নিয়ে বাড়ি বসে রইলেন। ইতিমধ্যে পিতা যাদব চন্দ্রের মৃত্যু হ'ল। সঞ্জীবচন্দ্রও চাকরির দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেন। পিতার ভয়েই তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজে কর্মে লিপ্ত ছিলেন। এবার সে ভয়ও ঘুচে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাস উঠিয়ে কলকাতায় চলে এলেন, সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটির চাকরি ত্যাগ করে কাঁটালপাড়ায় অলস ভাবে দিন গুজরাণ করতে লাগলেন।

* এই গল্পটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন। দ্রষ্টব্য—হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪ পাদটীকা। বার্টন নামে একজন নরাধম ইংরেজ কালেকটারের (সঞ্জীবনী সুধা) দ্বারা অপমানিত হয়েই তিনি চাকরি ত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন।'

দেখা যাচ্ছে, অসিতবাবু বঙ্কিমচন্দ্র এবং শাস্ত্রী মশায় উভয়েরই লেখা পড়ে এই কথাগুলি লিখেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি হারিয়ে সাব রেজিষ্ট্রারের চাকরি করেছিলেন—এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র তো অতি বিস্তৃতভাবেই এবং শাস্ত্রী মশায়ও সংক্ষেপে লিখলেও, অসিতবাবু সঞ্জীবচন্দ্রের এই চাকরির কথা আদৌ উল্লেখই করেন নি।

পিতার মৃত্যুর পর সঞ্জীবচন্দ্র স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রারের চাকরি ত্যাগ

করেন, এ কথা না বলে, ডেপুটির চাকরি ত্যাগ করেন বলে অসিতবাবু যেমন ভুল করেছেন, তেমনি, সঞ্জীবচন্দ্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে রইলেন, একথা বলেও ভুল করেছেন। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় সঞ্জীবচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি থেকে অপসারিতই করা হয়েছিল। তাই ছুটি নেওয়ার কোন কথাই উঠতে পারে না। আর রাস্তা সংক্রান্ত সভায় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি না লিখে, জজ সাহেব সভাপতি লিখেও অসিতবাবু ভুল করেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটির চাকরি ছেড়ে দিয়ে কাঁটালপাড়ায় অলসভাবে দিন গুজরাণ করতে লাগলেন ব'লে, এরপরে অসিতবাবু আবার যা যা বলেছেন, সেগুলোও ভুল। তিনি লিখেছেন—সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রকাশের প্রথম দিকে খুব উৎসাহের সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদনা ও অন্যান্য কাজে যোগ দিলেন, কিন্তু দু এক বছরের পর তাঁর পুরাতন আলস্য, কর্মে অনিচ্ছা ও অনুৎসাহ আবার ফিরে এল। তাঁর অসহযোগিতার জন্য পত্রিকা আর নিয়মিত প্রকাশিত হয় না। ইত্যাদি

বঙ্গদর্শন প্রকাশের শুধু প্রথম দিকে কেন, এই পত্রিকার প্রথম চারটা বছরই সম্পাদনার কাজে সঞ্জীবচন্দ্রের যোগ দেওয়ার কোন কথাই আসতে পারে না। কারণ, ঐ সময় তিনি দূরে তাঁর স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রারের চাকরি নিয়ে ব্যস্ত, আর স্বয়ং সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর ডেপুটির চাকরি নিয়ে অন্যত্র ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র 'অন্যান্য কাজের' মধ্যে বঙ্গদর্শন প্রকাশের দ্বিতীয় বছরে বাড়িতে যে 'বঙ্গদর্শন প্রেস' করেছিলেন, সেটা মূলত তাঁর উপার্জনহীন পুত্রের একটা উপায় করে দেবার জন্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনা কালে বঙ্গদর্শন ঠিক সময়েই প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি এক বছর বন্ধ থাকার পর, সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনা কালেও প্রথম দু বছরের অর্থাৎ ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষের বঙ্গদর্শনও যথা সময়েই বেরিয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্র তখনও পুরাদমে এবং সুখ্যাতির সহিতই দূরে তাঁর চাকরিতে ব্যাপৃত ছিলেন।

অসিতবাবু বলেছেন—ক্রমে বঙ্গদর্শনের ও ছাপাখানার অপমৃত্যু হ'ল। এরপর কর্মহীন, উৎসাহহীন, অলস সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বসে তাকিয়া আশ্রয় করে কেবল উৎসাহ সহকারে ফুল বাগান পাহারা দিতেন।

আগে বঙ্গদর্শন নয়। আগে ছাপাখানা যায়। ছাপাখানা গেলে তখন বঙ্গদর্শন 'জনসন প্রেসে' ছাপা হ'ত। ছাপাখানা যাওয়ার অন্তত বছর দুই

পরে বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়। আর ছাপাখানা ও বঙ্গদর্শন বন্ধ হওয়ার অনেক আগেই বাড়ির ফুল বাগানে পিতা যাদবচন্দ্রের শিবমন্দির তৈরি হয়েছিল।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য হ'লে কিভাবে সঞ্জীবচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি থেকে অপসারিত করা হয়েছিল, আর সঞ্জীবচন্দ্রও এই হারানো চাকরি আবার ফিরে পাওয়ার জন্য কত যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন, সে সব সম্বন্ধে, শতছিন্ন হলেও কিছু কাগজপত্র কাঁটালপাড়ায় 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় রয়েছে। এখানে এখন সেই সব কাগজপত্র থেকে কিছু বলছি—

সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬৯ এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায়, পরীক্ষার ফল বেরোবার পর ৫ই জুলাই তারিখে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এক প্রস্তাব ক'রে তাঁকে চাকরি থেকে অপসারিত করেন।

সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি হারিয়ে ১৮ই আগষ্ট (১৮৬৯) তারিখে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর কাছে এই নিয়ে এক দীর্ঘ দরখাস্ত করেছিলেন। তাতে তিনি প্রধানত যে যে কথা বলেছিলেন, সেগুলো হ'ল—

জুডিশিয়াল পেপারে আমাকে ২৩ নম্বর দিয়ে ফেল করানো হয়েছে। সেণ্ট্রাল কমিটি থেকে জেনেছি, ২৩ নয়, আমি ৭৩ পেয়েছি। আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে ঐ বিভাগে খোঁজ নিতে পারেন।

পরীক্ষায় আমি একটা বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার মত যাঁরা একটা বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন, আমার সেই সব সহকর্মীদের সকলেরই চাকরি আছে। তাই আমাকেও একটা বিভাগে উত্তীর্ণ ঘোষণা করে, চাকরিতে বহাল রাখা হোক্।

সঞ্জীবচন্দ্র এইভাবে তাঁকে চাকরিতে রাখার জন্য অনেকগুলি যুক্তি দেখিয়ে তাঁর দরখাস্তের শেষে এ কথাও লিখেছিলেন—মাননীয় লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যদি একান্তই আমাকে আর আমার কাজে পুনর্বহাল করতে না পারেন, তবে যেন আমার চাকরির সমান বেতনের এবং সমান উন্নতির একটি চাকরি দেন।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সঞ্জীবচন্দ্রকে আর তাঁর আগের চাকরিটি না দিয়ে, বারাসতে তাঁকে সমান বেতনের একটি স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রারের চাকরি দিয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর শেষ প্রার্থনা মত সমান বেতনেরই একটা চাকরি পেলেও তিনি কিন্তু তাঁর ডেপুটির চাকরির কথা ভুলতে পারলেন না। তাই তিনি বারাসতে নতুন চাকরিতে লেগে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি তারিখে এই নিয়ে 'ভাইসরয় অ্যাণ্ড গবর্ণর জেনারেল' বা বড়লাটের কাছেও একটি দরখাস্ত করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন—আমি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে আমার উপরওয়ালারা আমার কাজের যে সব সুখ্যাতি করেছিলেন, তার ভিত্তিতেও অন্তত আমাকে কাজে পুনর্বহাল করা হোক।—এই বলে তিনি দরখাস্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে তাঁর উপরওয়ালাদের লেখা প্রশংসার কথাগুলিও দিয়ে ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র বড়লাটের কাছে দরখাস্তে এও বলেছিলেন—আমাকে অন্তত আর একবার পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক্।

বড়লাট, লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বা ছোটলাটের সিদ্ধান্তের উপর কোনও মত প্রকাশে অনিচ্ছুক হন। তাই সঞ্জীবচন্দ্র বড়লাটের কাছে আবেদন করেও ব্যর্থ হন।

এরপর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখে সঞ্জীবচন্দ্র বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর কাছেও আবেদন জানান, তাঁকে আর একবার পরীক্ষায় বসতে দেবার অনুমতি দেওয়া হোক।

এ আবেদনও ব্যর্থ হয়।

কয়েক বছর কেটে গেল। সঞ্জীবচন্দ্র এবার তাঁর এই নতুন চাকরিতেই বর্ধমানে বদলি হয়ে এলেন। এই সময় ১৮৭৮ এর নভেম্বর মাসে তিনি আর একবার চেষ্টা করলেন।

তখনকার দিনে অনেক অভিজ্ঞ এবং উপযুক্ত সরকারী কর্মচারীকে নীচু পদ থেকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নতী করার নিয়ম ছিল। সেই হিসাবে তিনি এবার বর্ধমানের রেজিষ্ট্রারকে দিয়ে তখনকার রেজিষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের ইন্‌সপেকটর জেনারেলকে এক চিঠি লেখান। তাতে বর্ধমানের রেজিষ্ট্রার ইন্‌সপেকটর জেনারেলকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন সঞ্জীবচন্দ্রকে দক্ষ কর্মচারী ঘোষণা করে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে বলেন—তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত করা হোক্।

ইন্‌সপেকটর জেনারেল তখন বর্ধমানের রেজিষ্ট্রারের চিঠির উত্তরে তাঁকে লিখেছিলেন—লেফটেনাণ্ট গবর্ণর একবার যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ

বলে অপসারিত করেছেন, পুনরায় তাঁকে সেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিতে চান না। ইত্যাদি

সঞ্জীবচন্দ্র এই সময় বর্ধমান থেকে যশোহরে বদলি হন। সেখানে বার্টন নামা এক 'নরাধম' ইংরাজের অত্যাচারে সঞ্জীবচন্দ্র কিভাবে তাঁর চাকরি ছেড়ে দেন, সেকথা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় আমরা আগেই দেখেছি।

সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি হারিয়ে পুনরায় সেই চাকরি পাওয়ার আশায় তাঁর সম্বন্ধে তাঁর উপরওয়ালাদের মন্তব্য সহ বড়লাটের কাছে যে দরখাস্ত করেছিলেন, এখানে উপরওয়ালাদের সেই মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করছি। এ থেকে দেখা যাবে, সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবেও বেশ সুদক্ষ ছিলেন। উপরওয়ালা ও তাঁদের মন্তব্যগুলি এই—

Mr. E. Grey, Magistrate of Nuddea, in his Police Report for 1864,

'A very good officer. He is painstaking and intelligent ; his natural self-reliance and independence of character ought to make him a valuable judicial officer.'

Lord Ullicke Browne, Magistrate of Nuddea, Police Report for 1865

'He is very willing and quick, and it will be seen that there were no appeals from his decisions. He promises to turn out a very good officer.'

Lord Ullicke Browne, Collector of Nuddea, Revenue Report for 1865-1866.

'An officer of good ability and acquirements.'

Mr. H. L. Dampier, Commissioner of Presidency Division, Revenue Report, some year.

'Very able.'

Mr. H. L. Dampier, Police Report for 1865.

(In allusion to my transfer from Nuddea)

'His loss is very much regretted in the District.'

Colonel Dalton, Commissioner of Chota Nagpore, Revenue Report 1865-1866.

'Zealous and intelligent officer.'

Mr. J. Monro, Collector of Jessore, Revenue Report 1867-1868.

'An officer of ability and promise, intelligent and willing.'

Mr. P, A. Humphrey, Magistrate of Pubna, Police Report for 1868.

'Very intelligent ; works hard, and does his work satisfactorily.'

Mr. P. A. Humphrey, Collector of Pubna, Revenue Report for 1868-1869.

'An excellent executive officer and an efficient Abkaree Deputy Collector : his decisions also have been good, and he takes pains in his work.'

সঞ্জীবচন্দ্র এত ভাল অফিসার হয়েও, এক সাহেবের সঙ্গে সামান্য একটা রসিকতা করতে গিয়েই নিজের অমন চাকরিটি হারিয়ে ছিলেন।

ঋণের বোঝা

বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত অনাবশ্যক ভেবেই তাঁর লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে দাদার সম্বন্ধে একটা কথা বলেন নি। সেটা হ'ল—সঞ্জীবচন্দ্র অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত ছিলেন এবং সেই ঋণের জন্য তাঁকে বেশ দুর্ভোগও ভুগতে হয়েছিল।

সঞ্জীবচন্দ্র খুবই সৌখীন, আড়ম্বর-প্রিয় ও অমিতব্যয়ী মানুষ ছিলেন। তিনি কাজেকর্মে ঋণ করেও অযথা আড়ম্বর করতেন। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্র মুখে ব'লে এবং চিঠি লিখেও দাদাকে নিষেধ করতেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র সে কথায় আদৌ কান দিতেন না।

সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের এইরূপ একটা চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি। সেবার সঞ্জীবচন্দ্র নিজের এবং বৃদ্ধ পিতারও ইচ্ছায় ঋণ করেই একমাত্র পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রের খুব ধুমধাম সহকারে বিয়ে দেবার উদ্যোগ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা চিঠিটি এই—

১৫ নভেম্বর, ১৮৭৪

To

Babu Sanjib Chandra Chatterji

সেবক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্মণঃ

প্রনামা শত সহস্র নিবেদঞ্চ বিশেষ,

আপনি যতীশের (বঙ্কিমচন্দ্র 'জ্যোতিশ' না বলে 'যতীশ' বলতেন) বিবাহ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর আমি বাঙ্গলায় লিখিলাম। ইহার কারণ এই যে, আবশ্যক হইলে বা উচিত বিবেচনা করিলে পিতাঠাকুরকে পত্রটি পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত—আপনাকে যতীশের বিবাহ সম্বন্ধে ১৬০০ যোলশত টাকা কর্জ করিতে বলিয়াছেন। কর্জ পাওয়া আশ্চর্য নহে। আপনি না পান শ্রীযুক্ত আজ্ঞা করিলে অনেকে কর্জ দিবে। কর্জ করিলে আপনার বর্তমান পাঁচ হাজার টাকা ঋণের উপর ৭০০০ টাকা হইবে। ইহা পরিশোধের সম্ভাবনা কি? এক্ষণে আপনি কত করিয়া মাসে কর্জ শোধ করিয়া থাকেন। কোন মাসে কুড়ি টাকা, কোন মাসে কিছুই না। অদ্য ২০ বৎসর অবধি আপনি

ঋণগ্রস্ত, কখনও ঋণের বৃদ্ধি ব্যতীত পরিশোধ করিতে পারেন না। ভবিষ্যতে যে অন্য প্রকার হইবে, তাহার কি লক্ষণ দেখা যায়? কিছুই না! তবে ইহা নিশ্চিন্ত বলা যাইতে পারে যে, এক্ষণে আপনি যে ঋণ করিবেন, তাহা পরিশোধের সম্ভাবনা নাই।

যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না, মনে জানিতেছেন, তাহা গ্রহণ করা পরকে ফাঁকি দিয়া টাকা লওয়া হয়। আপনি যদি এখন ১৫০০ টাকা কর্জ করেন, তবে ঋণ গ্রহণ করাকে বঞ্চনা বলিতে হইবে। বরং ভিক্ষাবৃত্তি ভাল, তথাপি বঞ্চনা ভাল নহে। এরূপ অধর্মাচরণ অপেক্ষা পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্ত্তব্য।

২। এই ৭০০০ টাকা ঋণ পরিশোধ হইবে না। ইহার পরিণাম কি হইবে? মহাজন ছাড়িবে না, তাহারা নালিশ করিয়া ডিক্রি করিবে। এমন কোন সম্পত্তি আমাদের নাই, যাহা বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় হইতে পারিবে। সুতরাং আপনি যে পরিমাণ পরামর্শের কথা লিখিয়াছেন, তাহা অন্যায় হইল কি প্রকারে? এমন সর্বনাশ যাহাতে ঘটিবার সম্ভাবনা, সে ঋণ কেন করিবেন? ইহা জানেন যে ডিক্রি হইলেই আপনার চাকরিটি যাইবে, এরূপ নিয়ম হইয়াছে।

৩। আপনি যদি এই ঋণ বৃদ্ধি করেন, তবে যতীশের যাবজ্জীবনের জন্য যে কি গুরুতর অনিষ্ট করিবেন, বলা যায় না। যতীশ সে সবেরই দায়িক। যেদিন সে প্রথম উপার্জন করিতে শিখিবে, সেইদিন হইতে এই ঋণের ভার তাহার মাথার উপর চাপিবে। আর ইহজন্মে তাহা নামাইতে পারিবে কি না বলা যায় না। আপনাদিগের অবস্থা দেখিয়া ভরসা হয় না যে কখনও উদ্ধার পাইবে। যাহার স্কন্ধে ঋণের ভার চাপে, তাহার অপেক্ষা অসুখী পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যত টাকা উপার্জন করে, তাহার একটি পয়সাও আপনার বলিয়া বোধ করিবার অধিকার থাকে না। উদাহরণ আমাকেই দেখিতেছেন। রমেশ মিত্র হাইকোর্টের জজ, আর আমি মালদহের ক্ষুদ্র চাকুরিজীবী। পিতৃঋণই ইহার কারণ। অতএব আপনি যদি আর ঋণ বৃদ্ধি করেন, তবে আপনাকে যতীশের শত্রু বিবেচনা করিব। যদি বলেন, ঋণ না করিলে পিতার এই শেষ অবস্থায় অত্যন্ত মনঃপীড়া পাইবেন। আমার বিবেচনায় তাঁহাকে এই সকল কথা বুঝাইলে, তিনি কদাচ ঋণ করিতে বলিবেন না। তিনি পুত্রবৎসল, অবশ্য আপনার এবং যতীশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি

দৃষ্টি করিবেন। যদি না করেন, তবে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হইবে। পিতার অনুরোধে পুত্রের অনিষ্ট করিলে, আপনি ধর্মে পতিত হইবেন।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে, তিনি আপনাকে ঋণ করিতে দিবেন না। কিন্তু স্বয়ং ঋণ করিয়া যতীশের বিবাহ দিবেন। আপনার কাছে বিশেষ ভিক্ষা এই যে, কোন মতে তাহা করিতে দিবেন না। তিনি যদি ঋণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি যে ঋণ করিতেছেন, তাহা কে পরিশোধ করিবে? তিনি বলিবেন যে, আমার ২২৫ টাকা পেন্সন আছে, আমি তাহা হইতে পরিশোধ করিব। তখন বুঝাইয়া দিবেন যে, তাহা ভ্রম মাত্র। আজি নয় বৎসর হইল আমরা পৃথক হইয়াছি। তখন শ্রীযুক্তের ৮০০ টাকা দেনা ছিল। এক্ষণে ৩৬০০ টাকা আছে। অতএব এই নয় বৎসরে ৪৪০০ টাকা মাত্র পরিশোধ হইয়াছে। আমাতে ও দাদাতে ঋণ পরিশোধার্থে এই নয় বৎসরে ৪৪০০ টাকা দিয়াছি। অতএব নয় বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত পেনসন হইতে একটি পয়সাও কর্জ শোধ করেন নাই। অতএব ভবিষ্যতে করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

অতএব তিনি এক্ষণে ঋণ করিলে তাহা পরিশোধ করিবে কে? তিনি বলিবেন—পুত্রগণ। কিন্তু পুত্রগণের মধ্যে মধ্যম নিজের দেনাই পরিশোধ করিতে অশক্ত। পিতৃঋণের এক পয়সাও পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা নাই। কনিষ্ঠও তদ্রূপ। তাহার যে আয়, তাহাতে কোন মতে সংসার নির্বাহ হয়, ঋণ পরিশোধ হইতে পারে না। জ্যেষ্ঠ এক পয়সাও দিবেন না। ইহা নিশ্চিত, বাকি আমি কেবল একা দায়ে ধরা পড়ি। অতএব তিনি যদি এখন যতীশের বিবাহের জন্য ঋণ করেন, তবে আমার ঘাড়ে ফেলিবার জন্য। উহা আমার প্রতি কত বড় অত্যাচার হইবে, তাহা তাঁহাকে আপনি বুঝাইবেন।

আর একটি কথা যদিও অবক্তব্য, তথাপি এ স্থলে না বলিলে নয়। আমার উপর রাগ করিবেন না, আমার দেহের প্রতি বিশ্বাস নাই। আমার শরীরে শ্বাস কাশাদির বীজ রোপিত আছে। অন্যান্য উৎকট রোগেরও লক্ষণ আছে। তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করি না। কেননা দীর্ঘ জীবন বাসনা করি না। অধিক দিন বাঁচিলে অধিক কষ্ট পাইতে হয় এবং প্রতিকারের চেষ্টায় কষ্ট পাইতে হয়। প্রায়ই কোন না কোন ব্যাধিতে আমার শরীর রোগগ্রস্ত।

অতএব কতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় ঋণ পরিশোধ পর্যন্ত আমাকে আর বাঁচিতে হইবে না। আর কেবল ঋণ পরিশোধের জন্য বাঁচিয়া কি হইবে? যদি ঋণ হইতে মুক্তি না পাই, তবে রোগের কোন চিকিৎসা হইবে না।

যতীশের বিবাহে আপনি বা শ্রীযুক্ত এক পয়সাও ঋণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে বলিবেন, যতীশের কি বিবাহ দেওয়া হইবে না? আমার বিবেচনায় যতীশের বিবাহ দুই বৎসর পরেও ভাল, তথাপি ঋণ কর্তব্য নহে। নিতান্ত যদি বিবাহ দেওয়া কর্তব্য হয় (কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই), অক্ষয় সরকারের কাছে আপনার চারিশত টাকা পাওনা আছে, সে এখন দিবে না সত্য বটে, কিন্তু গঙ্গাচরণকে ধরিতে পারিলে সে দিতে পারে। সেই চারিশত টাকা আদায় করুন। আর আপনি ২০০ টাকা দিতে পারেন, শ্রীযুক্ত ২০০ টাকা, আমিও দুই শত টাকা দিব। এই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ দিন। ঋণ করিতে পারিবেন না। এই সকল টাকা সংগ্রহ করিতে দুই তিন মাস লাগিবে। অতএব এই ফাল্গুন মাসে বিবাহ হইতে পারে।

প্রণত—বঙ্কিম

৩০ কার্তিক

চিঠির অক্ষয় সরকার হলেন 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার। গঙ্গাচরণ হলেন অক্ষয়বাবুর পিতা।

বঙ্কিমচন্দ্র বৃথাই এই নিষেধপত্রটি লিখেছিলেন। কারণ, তাঁর নিষেধ না শুনে যাদবচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়ে মিলে জাঁক করেই মাত্র ১৪ বছরের বালক জ্যোতিশচন্দ্রের বিয়ে দিয়েছিলেন। জ্যোতিশের বিয়ে হয়েছিল হাওড়া শহরে শালকিয়ার এক জমিদার বংশে। বিয়ের জাঁকজমক কি রকম হয়েছিল, তার একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। বর বিয়ে করতে গিয়েছিল, সেকালের প্রথা অনুযায়ী পালকি বা জুড়ি গাড়ীতে চেপে নয়। গিয়েছিল রাজকীয়ভাবে হাতীতে চেপে।

এবার সঞ্জীবচন্দ্রের আর একটি ঋণের কাহিনী—

সক্ষম সন্তানদের চেয়ে অক্ষম সন্তানদের প্রতি বাপ-মায়ের সাধারণত একটা স্বাভাবিক টান বা দুর্বলতা থাকে। সেই হিসাবে যাদবচন্দ্রেরও ঋণগ্রস্ত সঞ্জীবচন্দ্রের উপর একটু দুর্বলতা ছিল। এইজন্যই যাদবচন্দ্র মৃত্যুর কিছুদিন আগে, সঞ্জীবচন্দ্র

যখন তাঁর 'বঙ্গদর্শন প্রেসে'র জন্য কলকাতার মথুরামোহন রায়ের কাছে ১৫০০ টাকা ঋণ করেন, সেই ঋণ পত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে যাদবচন্দ্রও একটা সই দিয়েছিলেন। যাদবচন্দ্রের সই থাকার ফলে এই হয় যে, যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই পাওনাদার যখন নালিশ করেন, তখন তিনি যাদবচন্দ্রের চারি পুত্রের নামেই নালিশ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে যখন প্রথম বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন থেকে পুরা এক বছর কলকাতার এক প্রেসে এই পত্রিকা ছাপা হয়। বঙ্গদর্শন পত্রিকার দ্বিতীয় বছরের শুরুতে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় নিজেদের বাড়িতে 'বঙ্গদর্শন প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা করেন। তখন থেকে এই প্রেসেই বঙ্গদর্শন পত্রিকা ছাপা হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র পত্রিকা ছাপান বাবত টাকা অন্যকে না দিয়ে নিজের দাদাকেই দিতেন। সঞ্জীবচন্দ্র এই বঙ্গদর্শন প্রেসকে আরও বড় করবার জন্য কিছু টাকা ঋণ করে পরে প্রেস কাঁটালপাড়া থেকে কলকাতায় তুলে আনেন। যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রেস দেখাশুনা করতেন যাদবচন্দ্র নিজে এবং সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশ। সঞ্জীবচন্দ্র তখন চাকরি করতেন। অতএব সঞ্জীবচন্দ্র ঋণগ্রস্ত থাকলেও সংসারে আয় বাড়াবার জন্য যে কোনও চেষ্টা করেন নি, তা নয়। তিনি কেবল প্রত্যেক কাজে হাত লম্বা করে খরচ করে ও বিলাসিতা করেই ঋণের পর ঋণ করে গেছেন। আর তাঁর আদৌ ব্যবসায় বুদ্ধি না থাকার জন্য এবং উদাসীন প্রকৃতির মানুষ হওয়ার জন্য তিনি বঙ্গদর্শন প্রেসের ব্যবসায় শেষ পর্যন্ত ঐ ঋণে জর্জরিত হয়ে অকৃতকার্য হন।

যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর পর (মৃত্যু হয় ১৮৮১র জানুয়ারিতে) মথুরামোহন রায় তাঁর পাওনা আদাদের জন্য সঞ্জীবচন্দ্র সহ যাদবচন্দ্রের অপর তিন পুত্রের নামে যে নালিশ করেন, সেই মামলায় তিনি অনায়াসেই ডিক্রি পেয়ে যান। সেই ডিক্রির নকলটি এখানে উদ্ধৃত করছি। এ থেকে মামলার ইতিহাসটা জানা যাবে—

ডিক্রি

জেলা ২৪ পরগনার দ্বিতীয় সব-জজ আদালত

রুজুর তারিখ ২ সেপ্টম্বর ১৮৮১

মোকদ্দমা নং ১১৫ সন ১৮৮১ সাল

নিষ্পত্তির তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮১

বাদী—মথুরামোহন রায়, পিতা গুরুপ্রসাদ রায়, সাং ভাগ্যকূল, স্টেশন শ্রীনগর, জেলা ঢাকা। কারবার স্থান শহর কলিকাতা, মোকাম্ কুমারটুলি।

বনাম

প্রতিবাদী—১ নং শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ২ নং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩ নং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪ নং পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাকিনান কাঁটালপাড়া, জেলা ২৪ পঃ

দাবি

প্রতিবাদীগণের পিতা মৃত যাদব চট্টোপাধ্যায় ও ৩ নং প্রতিবাদী সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়া দেওয়া ১৮৭৯ সালের ৩০ মার্চ তারিখের প্রোমেসরি নোটের দরুণ আসল পনের শত টাকা ও শতকরা বার্ষিক পনের টাকা হিসাবে সুদ ১১৮ টাকা দশ আনা একুনে ১৬১৮ টাকা দশ আনা তলব তাগাদায় আদায় না করায় ঐ টাকা মায় ভাবীকালের সুদ ও খরচা সহ মৃত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্যাজ্য সম্পত্তি ও প্রতিবাদী সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আদায় পাইবার প্রার্থনায় বাদী প্রতিবাদীগণের নামে নালিশ করে ও প্রকাশ করে যে উক্ত যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার ওয়ারিশ উক্ত প্রতিবাদীগণ হইতেছেন।

এই মোকদ্দমা সন ১৮৮১ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর দ্বিতীয় সব জজের সমক্ষে বাদীর পক্ষে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ও বাবু পরেশনাথ ঘোষ ও প্রতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের উকিল বাবু ব্রজলাল পালিত ও প্রতিবাদী সঞ্জীবের উকিল বাবু রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু নিস্তারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাতে বাদী-প্রতিবাদীগণের অসাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া হুকুম হইল যে—

এ মোকদ্দমা ডিক্রি হয়। দাবীকৃত ১৬১৮ টাকা দশ আনা ও মুলতবি কালের সুদ ৭০ টাকা দশ আনা এবং এই মোকদ্দমার খরচা বাবদ মঃ ১৫৩ টাকা পনের আনা চার গণ্ডা, একুনে ১৮৪৩ টাকা তিন আনা চার গণ্ডা, তদুপরি অদ্য হইতে আদায়ের দিন তক শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হিসাবে সুদ সহ মৃত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্যাজ্য সম্পত্তি ও প্রতিবাদী সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে বাদী প্রাপ্ত হয়, ইতি—



যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অদ্য সন ১৮৮২ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

Sd. K. M. Mukherjee
2nd Sub-Judge

মথুরামোহন ডিক্রি পেয়ে ডিক্রি জারির জন্য কোর্টে দরখাস্ত করেন। ঐ দরখাস্তে তিনি প্রতিবাদীদের সীমানা সহ কয়েকটি সম্পত্তির উল্লেখ ক'রে সে সবের একটা করে আনুমানিক মূল্যও দিয়ে দেন। মথুরামোহনের দেওয়া ঐ আনুমানিক মূল্যগুলি যে কিরূপ হাস্যকর তা পাঠক-পাঠিকারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। এখানে মথুরামোহনের দরখাস্ত থেকে চৌহদ্দী বাদ দিয়ে প্রতিবাদীদের ঐ সব সম্পত্তি ও তাঁর দেওয়া আনুমানিক দরগুলি এখানে দিলাম—

১। কাঁটালপাড়া গ্রামে লাখরাজ জমি কমবেশী আট বিঘা বাগান মায় আওলাত। আনুমানিক মূল্য—৫০ টাকা

২। ঐ গ্রামে দশ কাঠা বাগান ওরফে ফুলবাগান এবং কমবেশী চার বিঘা পাঁচ কাঠা লাখরাজ জমি মায় আওলাত ও তার উপর ঘর। মূল্য আন্দাজ—২৫ টাকা

কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রদের প্রজা ঈশানচন্দ্র প্রভৃতির বসত লাখরাজ জমি কমবেশী আট কাঠা। মূল্য আন্দাজ—৫ টাকা

৪। ঐ গ্রামে নূতন পুষ্করিণী, লাখরাজ জমি কমবেশী ছয় কাঠা। মূল্য অনুমান—৫ টাকা

৫। ঐ গ্রামে এক বন্দ লাখরাজ জমি কমবেশী এক বিঘা আট কাঠা মায় আওলাত। আনুমানিক মূল্য—৫০ টাকা

ঐ গ্রামে সরকার বাগান নামক বাগান, লাখরাজ জমি কমবেশী একবিঘা সাত কাঠা মায় আওলাত। দাম আন্দাজ—১০ টাকা

৭। ঐ গ্রামে যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্যাজ্য ভদ্রাসন বাটী। লাখরাজ জমি কমবেশী একবিঘা দশ কাঠা। এর উপর একতলা ও দুতলা ইমারত, প্রাচীর ও পুষ্করিণী ইত্যাদি মায় আওলাত। মূল্য অনুমান—২০০ টাকা

আনুমানিক মূল্য সহ এই সাত দফা সম্পত্তির হিসাব দিয়ে ঐ দরখাস্তে মথুরামোহন যে কথা বলে নিজে স্বাক্ষর করে ছিলেন, তা এই—

আমি বাদী ডিক্রিদার শ্রীমথুরামোহন রায় এতদ্বারায় জানাইতেছি যে,

অত্র দরখাস্তের লিখিত বিবরণ যাহা আমি নিজ জ্ঞানে প্রকাশ করিলাম, তাহা সত্য বলিয়া জানি ও যাহা সন্ধান ও বিশ্বাস করিয়া প্রকাশ করিলাম, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। এই সত্য পাঠে জেলা ঢাকা শ্রীনগর থানায় স্বাধীন ভাগ্যকূল গ্রামে নিজ বাটীতে বসিয়া দরখাস্ত করিলাম। ইতি সন ১৮৮২ সাল ২২শে মে

শ্রীমথুরামোহন রায়

মথুরামোহন দরখাস্তের পর ডিক্রি জারি করে তাঁর দরখাস্তে উল্লেখিত ঐ সাত দফা সম্পত্তিই ক্রোক করেন।

ঐ ক্রোক করা সাত দফার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রেরও বাড়ি এবং জমি থাকায় তখন তিনি কর্মস্থল থেকে তাঁর কার্যকারক উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠি লিখে ঐ সঙ্গে আদালতে আপত্তি জানাবার জন্য কয়েকটা বক্তব্যও লিখে পাঠিয়ে ছিলেন। চিঠিটি নষ্ট হয়ে গেছে, তবে বক্তব্যটি ছিন্ন হলেও পাওয়া গেছে। প্রতিবাদ জানাবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যটি ছিল এই—

১। আমার পিতা সন ১২৭২ সালে তাঁহার সম্পত্তির অধিকাংশ তাঁহার পুত্রগণকে ও কন্যাকে দান করেন। দানপত্র রেজেষ্ট্রি করা।

২। তাঁহার ভদ্রাসন বাটী ঐ দানপত্রে দানকৃত হইয়াছে। তাঁহার চারিপুত্রের মধ্যে শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র দানকালে বলিয়াছিলেন যে, আমরা ভদ্রাসনের কোন অংশ চাই না। আমরা পৃথক বাড়ি প্রস্তুত করিব। এ জন্য ঐ বাড়ি কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রকে লিখিয়া দেওয়া হয়।

ঐ বাড়ির নকশায় ক, খ, গ এই তিন অংশের মধ্যে খ চিহ্নিত অংশে শ্যামাচরণ বাস করিতেন এবং গ চিহ্নিত অংশে সঞ্জীবচন্দ্র বাস করিতেন। দানপত্রে খ চিহ্নিত সঞ্জীবচন্দ্রকে ও গ চিহ্নিত অংশ পূর্ণচন্দ্রকে দেওয়া হইয়াছিল। ক চিহ্নিত সদর ও পূজারবাড়ি পূর্ণচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের সাধারণ রহিল।

শ্যামাচরণ পৃথক বাড়ি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ভদ্রাসন ত্যাগ করিতে সকলে নিষেধ করায়, তিনি পৃথক বাড়ি প্রস্তুত না করিয়া, সঞ্জীবচন্দ্রের (খ) চিহ্নিত মহলে বাস করিতে লাগিলেন। উহাতে নূতন ঘর আর প্রস্তুত করিলেন না। ১২৮১ সালে সঞ্জীবচন্দ্র ঐ মহল

দানপত্রের দ্বারা তাঁহাকে লিখিয়া দিলেন। তিনি ও পূর্ণচন্দ্র একত্রিত হইয়া ক চিহ্নিত সদর মহলের এক-তৃতীয়াংশ বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখিয়া দিলেন।

দানপত্রের পর পূর্ণচন্দ্র ঘ চিহ্নিত নূতন মহল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দখলিকার রহিলেন।

অতএব ভদ্রাসন বাড়ির মধ্যে ক চিহ্নিত সদর মহল এই তিন জনের সাধারণের। খ বঙ্কিমচন্দ্রের, গ ও ঘ পূর্ণচন্দ্রের।

ঙ খণ্ডে কোন ইমারত নাই। উহা বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয় মুখোপাধ্যায়ের নিকট খোস কোবলায় খরিদ করিয়াছেন।

চ খণ্ড আমাদের জ্ঞাতি রাখালচন্দ্রের। উহাতে আমাদের পিতার কখন কোন স্বত্ব ছিল না।

৬ ও ৭ নং ক্রোক সম্পত্তি দানপত্রের দ্বারা পূর্ণচন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই সকল দান ও লেখাপড়া সকলই দেনার অনেক পূর্বে। ১২৭২ সাল হইতে আমরা সকলে পৃথক অন্ন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই বক্তব্যের সঙ্গে ক, খ, ইত্যাদি চিহ্নিত করে যে নকশাটি উমাচরণের কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেটিও পাওয়া গেছে, তবে খুবই ছিন্ন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রেরও প্রতিবাদযোগ্য কথাগুলি থাকায়—তিনি সম্ভবত আর পৃথকভাবে প্রতিবাদ জানান নি। তবে শ্যামাচরণ নিজে পৃথক প্রতিবাদ পত্র পেশ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশ মত উমাচরণ নিজে আগে একটি প্রতিবাদের খসড়া করেছিলেন। পরে সেই প্রতিবাদ উকিল মারফৎ কোর্টে দাখিল করেন। উমাচরণের ঐ খসড়াটিও পাওয়া গেছে। তার প্রথমাংশের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

দ্বিতীয় সব জজ বিচারালয়—

দরখাস্ত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাং কাঁটালপাড়া, পঃ হাবিলিশহর,

সন ১৮৮২ সালে·· নং ডিক্রি জারিতে ডিক্রিদার তদীয় দেনদারের সম্পত্তি বলিয়া আমার সম্পত্তি ক্রোক দেওয়াতে আমি দেওয়ানি কার্যবিধির···ধারানুসারে নিম্নলিখিত হেতু বাদে আপত্তি করিতেছি—

১ম। আমার দ্বিতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পিতা

যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ডিক্রিদার নালিশ করিলে আদালত বিচার করিয়াছেন। যেহেতু পিতার মৃত্যুর সময়ে আমরা চারি ভ্রাতা তাঁহার কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হই নাই, তন্নিমিত্ত পিতৃঋণের জন্য কোন পুত্র দায়ী হইতে পারেন না। অতএব ডিক্রি কেবল ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র ও পিতার এস্টেট থাকিলে তদ্বিরুদ্ধে জারি হইবার আদেশ হইয়াছে।

২। ৭ নং লাট পিতার ত্যাজ্য ভদ্রাসন বলিয়া ক্রোক দেওয়া হইয়াছে। ইহার নকশা অত্র দরখাস্তের সহ দাখিল হইল। (চ) চিহ্নিত স্থান আমাদিগের জ্ঞাতি রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হইতেছে। আমাদিগের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই।

৩। আমাদিগের পিতার যে ভদ্রাসন ছিল, তাহা নকশায় লিখিত (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত হইতেছে। আমরা চারি সহোদর হইতেছি। সন ১২৭২ সালে পিতা আমাদিগের মধ্যে ভবিষ্যৎ গোলযোগ নিবারণার্থ এক দানপত্র লিখিয়া ভদ্রাসনের (খ) স্থান সঞ্জীবকে এবং (গ) স্থান সর্বকনিষ্ঠ পূর্ণ-চন্দ্রকে দান করেন। ইত্যাদি···

বঙ্কিমচন্দ্রের এই দরখাস্তের পর কোর্ট থেকেই তাঁর বাড়ি ও জমি ক্রোক করা থেকে রেহাই দেওয়া হয়।

এবার মথুরামোহন বাকি ক্রোক করা পাঁচটি লাটের সম্পত্তি নীলামে চড়ান। কিন্তু নীলামে কোন খরিদ্দার না থাকায় শেষে নিজেই এক হাজার টাকা নিলামী মূল্যে সমুদয় ক্রোকী সম্পত্তি কিনে নেন।

মথুরামোহনের এই নিলামে কেনা সম্পত্তির দলিল, যা প্রথম সব জজের স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত, সেটিও পাওয়া গেছে। ঐ দলিলের প্রথমাংশের ও শেষাংশের কিছুটা করে এখানে উদ্ধৃত করছি—

ভূমি বিক্রয়ের সার্টিফিকেট বায়নামা
(দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের ৩১৬ ধারা)
জেলা ২৪ পরগণায় প্রথম সবরডিনেট জজ আদালত
মোকদ্দমার নং ১১৬, সন ১৮৮১
৫৫ নং ডিক্রিজারি সন ১৮৮৪ সাল

ডিক্রিদার মথুরামোহন রায়, সাং ভাগ্যকুল, স্টেশন শ্রীনগর, জেলা ঢাকা, কারবার স্থান মোকাম কুমারটুলি, শহর কলিকাতা।···

ঐ ব্যক্তি ১০০০ টাকা মূল্যে খরিদ করায় উহাকে খরিদ্দার অবধারিত করা হইয়াছে এবং উক্ত নীলাম আদালত কর্তৃক বহাল হইয়াছে বর্তমান সনের ২৬ আগস্ট। অদ্য সন ১৮৮১ সালের ২৮ নভেম্বর তারিখে আমার দস্তখত্ ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

মথুরামোহন মামলায় জিতে মামলা খরচা ইত্যাদি সহ ডিক্রি পেয়েছিলেন ১৮৩৪ টাকা তিন আনা চার গণ্ডার। এখন নীলামে সম্পত্তি কিনে হাজার টাকা আদায় হলেও, ৮৩৪ টাকা তিন আনা চার গণ্ডা আদায় হয় না। তখন তিনি বাকি টাকার জন্য সঞ্জীবচন্দ্রের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার করেন এবং সঞ্জীবচন্দ্রের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার তোড়জোড় করেন।

এই সময়ে সঞ্জীবচন্দ্র বিভ্রান্ত হয়ে ভাইদের কিছু না বলে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন এবং কিছুদিন বাইরে কাটিয়েছিলেন। ফলে মথুরামোহন সঞ্জীবচন্দ্রের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার করেও কিছু করতে পারলেন না।

আর এদিকে জ্যোতিশও কাকা বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ মত দিনে বাড়ির সদর দরজা বন্ধ রেখে রাত্রে খোলার ফলে মথুরামোহন সঞ্জীবচন্দ্রের কোন অস্থাবর সম্পত্তিতেও হাত দিতে পারলেন না।

মথুরামোহন এখানে যেমন ব্যর্থ হলেন, তেমনি নামমাত্র হাজার টাকায় বহু হাজার টাকার সম্পত্তি নিলামে কিনেও দেখলেন, কাঁটালপাড়ায় গিয়ে সে সম্পত্তি ভোগ করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তিনি আরও দেখলেন, নীলামের সময় যেমন কোন খরিদ্দার আসেনি, তেমনি ঐ সম্পত্তি বিক্রি করলেও কেউই কিনতে সাহস করবে না বা কিনবে না।

মথুরামোহন এবার স্থির হয়ে ভাবলেন—টাকার সুদ, মামলা খরচ সে তো গেছেই, আসল টাকাও ডুবলো। তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখে, আসলেরও কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে প্রতিবাদীর সঙ্গে একটা মিটমাটের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র কি তাঁর ভাইদের কাছে যাবার তিনি মুখ রাখেন নি, তাই বঙ্কিমচন্দ্রের কার্যকারক উমাচরণকে ধরে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

আমরা দেখেছি, মথুরামোহন ঢাকার ভাগ্যকুলে নিজের বাড়িতে বসে কোর্টে এক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। তাই তাঁরই কেউ জানকী রায় তখন এ বিষয়ে মিটমাটের চেষ্টা করেছিলেন।

এই চেষ্টার ফলে মথুরামোহন তাঁর আসল টাকা থেকেও ২৫০ টাকা ছেড়ে দিয়ে ১২৫০ টাকা নিয়ে, কয়েক হাজার টাকার যে সম্পত্তি তিনি নীলামে মাত্র এক হাজার টাকায় কিনেছিলেন, বিক্রি কোবলা করে আবার ফেরত দিলেন। মথুরামোহনের লিখে দেওয়া ঐ বিক্রি কোবলাটিও পাওয়া গেছে। বিক্রি কোবলা লেখাপড়া হয়েছিল জ্যোতিশের নামে। ঐ কোবলার কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

পূজনীয় শ্রীযুত জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পিতার নাম শ্রীযুত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাকিন কাঁটালপাড়া, স্টেশন নৈহাটী, জেলা ২৪ পরগণা, মহাশয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীমথুরামোহন রায় পিতা গুরুপ্রসাদ রায়, সাকিন ভাগ্যকুল, স্টেশন শ্রীনগর, জেলা ঢাকা, হাল বাসস্থান কলিকাতা কুমারটুলি ১৬ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, জাতি তিলি, ব্যবসা জমিদারি ও তেজারতি কস্য বিক্রয় কোবলা লিখিতং কার্যঞ্চাগে আপনার পিতা শ্রীযুত সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় দিগর নামে আমি জিলা ২৪ পঃ দ্বিতীয় সবরডিনেট জজ আদালতে ১৮৮১ সনের ১১৫ নং নালিশ করিয়া ঐ সনের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে যে ১৮৩৪ টাকা তিন আনা চার গণ্ডার ডিক্রি প্রাপ্ত হই, উক্ত ডিক্রি অবশেষ উক্ত জেলার প্রথম সবরডিনেট জজ আদালতে ১৮৮৪ সালের ৫০ নং জারি করিয়া ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্যাজ্য পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দখলে সবরেজিষ্টার স্টেশন নৈহাটীর মোতাবেক কাঁটালপাড়া গ্রামের নিম্ন তপশীলের লিখিত সম্পত্তি ১৮৮৪ সালের ৪ জুন তারিখে উক্ত আদালতের হুকুম মতে নীলাম বিক্রয় হওয়ায় আমি ১০০০ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া বয়নামা গ্রহণে রীতিমত উক্ত আদালত কর্তৃক দখল লইয়া স্বত্ববান ও দখলীকার আছি।

অদ্যাবধি উক্ত ডিক্রিতে ও নিম্নলিখিত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বত্যাগে আপনি সম্পূর্ণ স্বত্ববান হইবেন, এতদর্থে আপনার পক্ষীয় শ্রীযুত উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মারফতে নিম্নলিখিত মতে ১২৫০ টাকা গ্রহণে স্বীয় স্বেচ্ছায় ও সুস্থ-শরীরে এই বিক্রয় কোবলা লিখিয়া দিলাম ও নীলাম খরিদের বয়নামা ও উক্ত ডিক্রির জাবেদা সকল আপনাকে অর্পণ করিলাম। ইতি সন ১২৯২ সাল ১৮ শ্রাবণ

তপশীল সম্পত্তি…। শ্রীমথুরামোহন রায়

এই বিক্রি কোবলার যেখানে '…' চিহ্ন দিয়েছি, ঐ জায়গায় এই কথাটাও

ছিল—'ডিক্রিজারিতে উক্ত ডিক্রির পাওনা বাকি টাকা দেনদারগণ হইতে রীতিমত আদায় করিয়া নিজে ভোগ দখল করুন।'

দলিলের এই কথাটা থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মথুরামোহন তখন ঐ ১২৫০ টাকার বেশী আর একটি পয়সাও আশা করতে পারেন নি।

এখানে দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মচারী বা কার্যকারক উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মারফতই ঐ টাকা মথুরামোহনকে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ উমাচরণবাবুই এ পক্ষের কথাবার্তা বলেছিলেন।

এই দলিল লেখাপড়ার সময় জ্যোতিশ ছিলেন বেকার ও কয়েকটি সন্তানের জনক। তাঁর সংসারের সমস্ত ব্যয়ই তখন বহন করতেন বঙ্কিমচন্দ্র। আর ঐ সময় সঞ্জীবচন্দ্রও যে কপর্দকশূন্য ছিলেন, সে তো আগেই দেখা গেছে। তাই মনে হয়, পূর্ণচন্দ্র বা অন্য কেউ ঐ ১২৫০ টাকার কিছু দিলেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বাকি সমস্ত টাকা দিয়ে তাঁর কার্যকারক উমাচরণের দ্বারায় এ ব্যাপারে মিটমাট করিয়েছিলেন এবং মেজদাকে ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করেছিলেন।

মথুরামোহন মামলা রুজু করার আগে বঙ্কিমচন্দ্র অসুস্থ অবস্থাতেও মথুরামোহনের পক্ষের জানকী রায়ের সঙ্গে কথা ব'লে এ বিষয়ে একটা মিটমাটের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ঐ সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় এবং মথুরামোহনও তাঁকে অগ্রাহ্য করে মামলা ডিক্রিজারি ইত্যাদি করায়, বঙ্কিমচন্দ্র এ নিয়ে জানকী রায় বা মথুরামোহনের সঙ্গে আর কোন কথা বলেন নি।

শেষে মথুরামোহন অত্যন্ত বেকায়দায় পড়ে একটা আপোষ করার আগ্রহ প্রকাশ করলে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন নিজে কিছু না বলে, উমাচরণকেই কথাবার্তা বলতে ও মিটমাট করে নিতে বলেছিলেন।

মথুরামোহন যে অত্যন্ত বেকায়দায় পড়েছিলেন, তা তাঁর ঐ বিক্রয় কোবলায় প্রথমেই 'পূজনীয় শ্রীযুত জ্যোতিশচন্দ্র' দেখেই বোঝা যায়। জ্যোতিশ ব্রাহ্মণ এবং মথুরামোহন অব্রাহ্মণ ছিলেন বলে বয়ঃনিষ্ঠ জ্যোতিশকে এরূপ লিখে ছিলেন, তা মনে হয় না।

আমি আগে বলেছি, মথুরামোহন রায় তাঁর টাকা আদায়ের জন্য সঞ্জীবচন্দ্রের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার ক'রে সম্পত্তি ক্রোকের উদ্যোগ করলে,

তখন সঞ্জীবচন্দ্র বিভ্রান্ত হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এখন সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে কিছু বলছি—

ঋণগ্রস্ত সঞ্জীবচন্দ্র ভাইদের, এমন কি পুত্র জ্যোতিশকেও কিছু না বলেই বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যান। বাড়ি থেকে গিয়ে পরে পুত্র জ্যোতিশকে, সেজ ভাই বঙ্কিমচন্দ্রকে ও ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্রকে তাঁর বাড়ি ছাড়ার কারণ এবং কখন কোথায় থাকছেন, তা জানান।

জ্যোতিশ বাড়িতে থাকায় তাঁর পিতার বাড়ি ছাড়ার কারণটা জানতেন, কিন্তু তিনি কোথায় যে গেলেন, তা জানতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র তাঁদের নিজ নিজ কর্মস্থলে থাকায় কিছুই জানতেন না। সঞ্জীবচন্দ্রের চিঠি পেয়ে সমস্ত জানতে পারেন।

এই সময় জ্যোতিশও নিজেদের বাড়িতে বিপদের কথা জানিয়ে সেজ কাকা বঙ্কিমচন্দ্রকে চিঠি লিখে তাঁর উপদেশ চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং হাওড়াতেই থাকতেন। তিনি তখন জ্যোতিশকে এই চিঠি দুটি লিখেছিলেন—

প্রিয়তমেষু,

তোমার পিতাকে আসিতে লিখিয়াছি। কিন্তু তিনি আমার পত্র পাইতেছেন না। ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

অত ভীত হইও না। দ্বার খুলিয়া রাখিও—পিয়াদা অন্দরে যাইতে চায়, আগে স্ত্রীলোকদিগকে সরাইয়া দিও। ইতি তাং ২৭ মাঘ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলে, সে বিষয়ে যে আইন আছে, তাহা নকল করিয়া পাঠাইলাম।

দস্তকে একটি সময় নিরূপিত থাকে। তাহার মধ্যে দস্তক জারি না হইলে দস্তকে ফেরৎ হয়। ঐ সময় প্রায় এক হপ্তা কি দুই হপ্তা এইরূপ থাকে। তাহার পর ডিক্রিদার প্রার্থনা করিলে নূতন দস্তক হইতে পারে।

সারদার সম্বন্ধী অধ্যাপকদিগকে দিবার জন্য ২৫০ টাকা দিয়াছিল। তাহা মেজবাবুকে দিয়াছিলাম। তাহা তিনি অধ্যাপকদিগকে দিয়াছেন, কি রাখিয়া

গিয়াছেন, কি লইয়া গিয়াছেন, আমাকে লিখিবে। তাঁহার কোন পত্র পাই নাই। ইতি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

For the purpose of making an arrest no dwelling house shall be entered after sunset and before sunrise. No outer door of any dwelling house shall be broken open. অতএব দিনমানে বাড়ির দ্বার বন্ধ রাখিবে, রাত্রে খুলিবে।

But when the peon has duly gained access to any dwelling house he may unfasten and open the door of any room in which he has reason to believe the judgment debtor is to be found. Provided that if the room be in the actual occupancy of a woman who is not the judgment debtor and who according to the customs of the countries does not appear in public the peon shall give notice to her that she is at liberty to withdraw and after allowing a reasonable time for her to withdrrw and giving her every reasonable facilities for withdrawing he may enter such room for the purpose of making the arrest.

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম চিঠিটিতে লিখেছিলেন—'তোমার পিতাকে আসিতে লিখিয়াছি। কিন্তু তিনি আমার পত্র পাইতেছেন না। ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।' সঞ্জীবচন্দ্র ঐ সময় বাড়ি ছেড়ে কখন কোথায় কিভাবে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, তার হদিস পাওয়া যায়, জ্যোতিশকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের তখনকার কয়েকটি চিঠি থেকে। সঞ্জীবচন্দ্র তখন বঙ্কিমচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্রকে সব সময়ে চিঠি না দিলেও, জ্যোতিশকে কিন্তু নিয়মিত চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠির কয়েকটা এখানে উদ্ধৃত করছি। এই চিঠিগুলিতে শুধু সঞ্জীবচন্দ্রের তখনকার ঘুরে বেড়াবার স্থানগুলিই নয়, জ্যোতিশের করণীয় প্রভৃতি সম্বন্ধেও সঞ্জীবচন্দ্রের বেশ কিছু নির্দেশ ছিল। কয়েকটি চিঠি এই—

প্রাণাধিকেষু,

আমি ৮।১০ দিনের নিমিত্ত যাইতেছি। কোনরূপ ব্যস্ত হইওনা। আমি হয়তো চুঁচুড়ায়ই থাকিব। ভুবন সা-র হোটেলের নিকট রন্ধনের যদি কোন স্থান পাই, তবে সেইখানেই থাকিব। আর যদি বর্ধমান কি বৈদ্যনাথ অথবা

ভাগলপুর যাই ৮।১০ দিনের অধিক থাকিব না। এখানে রাষ্ট্র হওয়া আবশ্যক যে, আমি কাশী গিয়াছি, তাহাই আমি কাশী যাইব বলিয়াছি।

রাধানাথ দাদাকে লইয়া থাকিবা।…

আমার সঙ্গে মাত্র পারানি পয়সা আছে। তাহা লইয়া চুঁচুড়ায় চলিলাম। অন্দরে যে একশত টাকা আছে, তাহা গোপালকে দিয়া ভাঙ্গাইয়া রাধানাথ-বাবুর মারফত ভুবন সাহার হোটেলে টাকা পাঠাইয়া দিবা। গোপাল খানসামাকে উহা হইতে ৫ টাকা দিবা। না দিলে সে আর থাকিবে না। ঐ টাকা তাহার হাত-চিঠিতে উশুল দিবা।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভিতরে যে টাকা পাঠানোর কথা লিখিয়াছি, তাহা রাধানাথ দাদার দ্বারা না পাঠাইয়া তাহা গোপালের দ্বারা পাঠালেও হইবে।

এই চিঠির রাধানাথ হলেন, বঙ্গদর্শন পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গঙ্গার এক পারে কাঁটালপাড়া, অপর পারে চুঁচুড়া। চিঠিতে যে পারানির পয়সার কথা আছে, সে ঐ গঙ্গা পার হওয়ার পয়সার কথা।

চিঠির '…' অংশটি ছিন্ন।

প্রাণাধিকেষু,

কল্য বৈকালে চুঁচুড়া হইতে রওনা হইয়া অদ্য ভাগলপুর পৌছিয়াছি। তুমি আপত্তি করিবে বলিয়া তোমায় পূর্বে সম্বাদ দিই নাই। এখানে কীর্তির নিকট শুনিলাম, হাজার টাকার অধিক মূল্যের ডিক্রি হইলেও 'মুভেবেল্‌স' ঘটি বাটি ক্রোক নীলাম হইতে পারে। অতএব সাবধান। আলিপুরে তোমার রাধানাথ জ্যেঠাকে পাঠাইয়া সম্বাদ জানিবে। যে পর্যন্ত তাহা নিশ্চয় জানা না যায়, সে পর্যন্ত সদর দরজা বন্ধ রাখিবে। আমি এখানে অল্প দিন থাকিয়া ফিরিয়া যাইব। রাধানাথ দাদাকে বলিবে এবং এই পত্র দেখাইবে যেন তিনি ফরাসডাঙ্গায় একটা ঘর দেখিয়া রাখেন। গৃহস্থের বাটী হইলে ভাল হয়, অল্প খরচে হইবে। আমি মোটে ১৫।২০ টাকায় তথায় চালাইব। এই মত বন্দোবস্তর বাটী দেখিতে বলিবে। রাত্রে গাড়িতে বড় শীত হইয়াছিল। লেপ মুড়ি দিয়াও শরীর গরম হয় নাই। তোমার জ্যেঠা মশায়

এখানে ৩।৪ দিন হইল আসিয়াছিলেন। কি মতলব তাহা জানিতে পারি নাই। চিরণ, অনিল আমার জন্য না আবদার করে। তাহাদের খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখিবে। ইতি ৩ জানুয়ারি ১৮৮৫, শুক্রবার

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির কীর্তি হলেন—সঞ্জীবচন্দ্রের জ্ঞাতি ভাইপো। জ্যাঠামশায় হলেন—সঞ্জীবচন্দ্রের দাদা শ্যামাচরণ। চিরণ ও অনিল হলেন—চিরঞ্জীব ও অনিল সুন্দরী, জ্যোতিশচন্দ্রের পুত্র ও কন্যা।

প্রাণাধিকেষু,

ডাকে তোমা‹ পত্র পাইয়াছি। একদিন অন্তর পত্র লেখার সুবিধা নাই, প্রয়োজনও নাই। ডাকঘর দূরে, নিজে যাইতে পারি না। চাকরদের পাঠাইতে গেলে তাহাদের কার্য ক্ষতি হয়। আর একদিন অন্তর পাওয়া নিয়ম করিলে যদি কোন কারণে নিয়মিত দিনে পত্র না পাও তবে অনর্থক চিন্তিত হইবে।

ডাকে পত্র লেখার বিষয় এত সতর্ক কেন? আর একজনের নামে শিরোনামা দিতে হইবে, অন্যের দ্বারা শিরোনামা লিখাইতে হইবে, পত্র রেজিস্টারি করিতে হইবে, এ সকল কেন?

রাধানাথদাদাকে বারাসত ও আলিপুর পাঠাইয়া এত টাকা আপাতত ব্যয় করা অন্যায় হইয়াছে। আমি সেখানে নাই। আবার দস্তক বাহির হইলেও কোন ক্ষতি হইত না। তবে যদি movables ক্রোক সম্বন্ধে সংবাদ রাখিবার জন্য এরূপ করিয়া থাক, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আর না ব্যয় হয়। এখন ব্যয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ করিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র শিবচন্দ্রর ২৫০ টাকার নিমিত্ত বড় পেড়াপেড়ি নিজে করিতেছেন এবং পেড়াপেড়ি করিবার নিমিত্ত সারদাকে লিখিয়াছেন। যদি ঐ টাকার অন্তত ২০০ টাকা অতি শীঘ্র তাঁহার নিকট দাখিল না হয় তবে তোমাদের মাসহারা বন্ধ হইবে নিশ্চয়ই। এবং সে টাকা দাখিল না হওয়া পর্যন্ত আমিও বাটী ফিরিয়া যাইতে পারিব না। কোন জিনিসপত্র নাই যে বিক্রয় করিয়া সে টাকা দিতে লিখিব। আমি আর বঙ্কিমের নিকট মুখ দেখাইতে পারিব না। সুতরাং এখন আর বাটী ফিরিয়া যাইব না।

পুঃ—তোমায় যখন একদিন রাত্রে civil procedure কোডের কয়েক

সেকশন দেখিতে বলি তুমি তাহার 'প্রভিসো' পড় নাই, তাহাই বলিয়াছিলে দরওয়াজা খোলা কি বন্ধর কথা কিছু নাই। অদ্য আমি এখানে সিভিল প্রসিডিওর খুলিয়া দেখিলাম সকলই আছে।

১। সদর দরওয়াজা সম্বন্ধে দেখ sect 336 Pro (a)

২। অন্দরের দরওয়াজা সম্বন্ধে দেখ Do 271 Proviso

৩। ভিন্ন জেলায় arrest See 223 a

৪। অস্থাবর সম্বন্ধে See Sect 236

পূর্ণিমার দিন সত্যনারায়ণ পূজা করিবে।

জ্যোতিশকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় চিঠিটিতে আছে—সারদার সম্বন্ধী অধ্যাপকদিগকে দিবার জন্য ২৫০ টাকা দিয়াছিল।

সারদা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞাতি খুড়তুতো ভাই। তাঁর সম্বন্ধী ছিলেন ভাগলপুরের প্রখ্যাত আইনজীবী রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজা শিবচন্দ্র তাঁর মা মোক্ষদা দেবীর নামে ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং পিতা দুর্গাচরণের নামে ঐ ভাগলপুরেই আর একটি বালক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছেলেবেলায় ভাগলপুরে থাকার সময় এই দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয় থেকেই ছাত্রবৃত্তি পাস করেছিলেন।

মনে হয়, শিবচন্দ্র তাঁর মা অথবা বাবার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভাটপাড়ায় টোলের পণ্ডিত বা অধ্যাপকদের দেবার জন্য ঐ ২৫০ টাকা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের চিঠির শিবচন্দ্র হলেন, ভাগলপুরের ঐ শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঞ্জীবচন্দ্র এই চিঠিটি ভাগলপুরে কীর্তিবাবুর বাড়িতে বসে লিখেছিলেন।

চিঠিতে যে বারাসত ও আলিপুরের কথা আছে সে হ'ল—কাঁটালপাড়া-বাসীদের মামলা-মোকদ্দমার কোর্ট বারাসতে। আর জেলার আপিল কোর্ট আলিপুরে।

প্রাণাধিকেষু,

অদ্য আমি ভাগলপুর হইতে বাঁকিপুর চলিলাম। সেখানে পৌছিয়া পত্র লিখিব। যদি দিদি সেখানে না থাকেন তবে আমার থাকিবার নিমিত্ত

ভাবনা নাই। অদ্য আলাপী আছে। যেখানে থাকি, তাহা পৌছিয়া পত্র লিখিব। ইতি—রবিবার

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—সদর দরওয়াজা বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন কি? অদ্য মাধবীলতা শেষ করিয়া বিনা যন্ত্রে manuscript পাঠাইলাম। proof আসিলে ভাল করিয়া দেখিয়া দিবে।

চিঠির দিদি হলেন, সঞ্জীবচন্দ্রের দিদি নন্দরানী মুখোপাধ্যায়। এঁর স্বামী শশীবাবুর কর্মস্থল ছিল বাঁকিপুরে।

দেখা যাচ্ছে, এইরূপ দারুণ মানসিক অশান্তির মধ্যেও সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'মাধবীলতা' গ্রন্থটি লিখে শেষ করেছিলেন। এই 'মাধবীলতা' উপন্যাসের প্রথম দিকের কিছুটা অংশ মাত্র সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' আগে প্রকাশিত হয়েছিল।

চিঠির 'বিনা যন্ত্র' হচ্ছে সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বীণা প্রেস'।

প্রাণাধিকেষু,

অদ্য প্রাতে বাঁকিপুর পৌছিয়াছি। এখানে শশীবাবু কি দিদি কেহই নাই। কেবল একা নরেশ আছে। সুরেশের বড় পীড়া হইয়াছে। তাহাকে লইয়া সকলে ছাপরা গিয়াছেন। আমার ইচ্ছা যে কল্য প্রাতে তথায় যাই। ওপারে এখন ট্রেন হইয়াছে। এখান হইতে প্রাতে গেলে সেখানে প্রায় বেলা ১০টার সময় পৌছিব। দুই-এক দিনের মধ্যে ফিরিব। এখানে আসিয়া যেন তোমার পত্র পাই। ৩।৪ দিন তোমার পত্র পাই নাই। নিম্নমত শিরোনামা দিবা—

Babu Naresh Chandra Mukherjee
Longortoli
Bankipur, E. I. R

এই পত্র নরেশ খুলিবে না, আমার নিমিত্ত রাখিবে। তোমার হস্তাক্ষর সে চিনে। আমার শরীর ভাল আছে। মনের অবস্থাও মন্দ নহে। ইতি
২ ফেব্রুয়ারি

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—ভাগলপুরে সকলে ভাল আছেন। কীর্তি আমাকে বিশেষ যত্ন করিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল যে, আমি আরও দশ দিন সেখানে থাকি। কিন্তু শশীবাবুকে দেখিবার বেগ হইবায় আমি চলিয়া আসিয়াছি। ছাপরা হইতে আসিয়া একবার গয়ায় যাইবার ইচ্ছা হইতেছে। যাব কিনা তাহা স্থির নাই, তথাপি তোমার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার জ্যাঠাই ও খুড়ির নাম পাঠাইয়া দিবা। তদ্‌ভিন্ন আর যে যে নাম তিনি বলেন, তাহা লিখিয়া পাঠাইবা। যদি তোমার রাখাল কাকার স্ত্রীর নাম ও তোমার ছোট কাকা ও সেজ কাকার প্রথম স্ত্রীর নাম জানিতে পার তাহা পাঠাইবা। একখানা পত্র আমায় ছাপরায় তোমার বড়দাদার কেয়ারে লিখিতে পারিলে ভাল হয়, কেননা কি জানি যদি সেখানে আমার বিলম্ব হয়।

চিঠির নরেশ ও সুরেশ হলেন, সঞ্জীবচন্দ্রের দিদি নন্দরানী দেবীর দুই পৌত্র। কৈলাসের পুত্র।

প্রাণাধিকেষু,

আমি অদ্য ছাপরা পৌঁছিয়াছি। তোমার বড়দাদা মফঃস্বলে গিয়াছেন। কল্য আসিবেন। বোধ হয় এখানে ৩।৪ দিন থাকিব। যদি তুমি পত্রপ্রাপ্ত মাত্রই উত্তর লেখ, তাহা হইলে আমি রওনা হইবার পূর্বে বাটীর সংবাদ পাইয়া যাইতে পারি। অনেক দিন পত্র পাই নাই বলিয়া কষ্ট হইয়াছে। নলিনের বিবাহের কি উদ্যোগ হইতেছে? প্রসন্নর মোকদ্দমা আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি সোমবার হইবে। ঐ তারিখে নলিনের আয়ুর্বর্ধন অন্ন। তোমার রাধানাথ জ্যাঠা মহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দিবে। ছেলেদের কাহারও কোন অসুখ হইয়া থাকিলে, আমায় না লিখিলে ভাল হয়। তাহাদের জন্য আমি বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছি। অগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা পাইতেছি, কিন্তু পারিতেছি না। ইতি ৪ ফেব্রুয়ারি, সোমবার

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যাদবচন্দ্র নিজের বাড়ির নিকটেই একমাত্র কন্যা নন্দরানীর জন্য পৃথক বাড়ি করে দিয়েছিলেন এবং কন্যার বিয়ে দিয়ে জামাতাকে একরূপ ঘরজামাই করেই রেখেছিলেন। নন্দরানীর পুত্র কৈলাস, জ্যোতিশের জ্যাঠতুতো খুড়তুতো সব ভাইয়ের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন, তাই জ্যোতিশ ও তাঁর ভাইরা কৈলাসকে বড়দা বলতেন। কৈলাসের কর্মস্থল ছিল ছাপরায়।

নলিন ছিলেন পূর্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র।

প্রাণাধিকেষু—

গত রাত্রে তোমার আর এক পত্র পাইয়াছি। তুমি Insolvency লইতে বলিয়াছ, কিন্তু তাহা আর এখন হইতে পারে না। মাল ক্রোক না করিলে অথবা দেনাদারকে গ্রেপ্তার না করিলে Insolvencyর দরখাস্ত হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র পরামর্শ দিয়াছেন যে ধরা দিয়া ঐরূপ দরখাস্ত করা অবশ্যক। কিন্তু এখন কাহাকে ধরা দিব। কে ধরিবে, warrant এর মিয়াদ ৮ দিন ছিল, তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। অতএব তাহা এখন হইতে পারে না। আর লিখিয়াছ যে এখন কোন ভয় নাই, তবে তুমি সদর দরওয়াজা বন্ধ রাখিয়াছ কেন? অস্থাবর মাল ক্রোক করিয়া তাহাদের কোন লাভ নাই, তবে যদি করে তাহা কেবল অপমান নিমিত্ত। কিন্তু সে সম্বাদ তো তুমি পূর্বেই পাইবে; রাধানাথ দাদা তো তাহার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন। তবে অনর্থক সদর দরওয়াজা বন্ধ রাখা হইতেছে। লোকে কেবল হাসিতেছে, যাহা ভাল হয় করিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র ৬০ টাকা দিয়াছেন, ভালই। পূর্বের ২৫০ টাকার দং যে টাকা ছিল তাহাতে এ মাস চালাইবে লিখিয়াছিলে, তাহাই চালাইও। বঙ্কিম এখন মাসে ৬০ টাকা করিয়াই দিবেন, ইহার অধিক প্রত্যাশা করাও অন্যায়। এই ৬০ টাকায় চালাইবার চেষ্টা করিবে। খরচ লিখিয়া রাখিবে। তোমার স্বভাব উড়া ছেঁড়া ফর্দে হিসাব লিখিয়া থাক। তাহা হারাইয়া যায়, প্রয়োজন মত পাওয়া যায় না, অতএব একখানা খাত্তা করিবে। প্রসন্নর মোকদ্দমা ১৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার। আমি সেখানে নাই, মোকদ্দমার তদ্বির হইবে না দেখিতেছি। আর একটা উকিল দেওয়া আবশ্যক। তাহাকে মোকদ্দমা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই। মোকদ্দমা হারিলে প্রসন্ন তোমার বিষয়টি লইয়া টানাটানি করিবে। যদি পারি কাল পরশুর মধ্যে উকিলের স্মারকপত্র স্বরূপ

একটা লিখিয়া পাঠাইব। রাধানাথ দাদা তাহা লইয়া যাইবেন। আমার না যাওয়ার নিমিত্ত ব্যস্ত হইও না। সংসার চালাইবার উপায় করিবার নিমিত্ত আমি দিন কতক বেড়াইব। উপায় করিতে পারি না পারি সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু চেষ্টা করা অন্যায় নহে। কিছু চেষ্টা না করিয়া বাটী বসিয়া থাকিলে কোন ফল নাই, বরং কষ্টই বাড়িবে। ইতি ২৭ মাঘ

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রাণাধিকেষু—

গত রাত্রে তোমার এক পত্র পাইলাম। তুমি আমাকে বাটী যাইতে লিখিয়াছ। না গেলে তুমি নিজে আসিবে। শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি একা কখন কলিকাতা যাইতে পার না, এখন বাঁকিপুর ছাপরা একা আসিবে। একা আসিতে পারিলে ভাল। কিন্তু আসিলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। আমি কল্য অন্যত্রে যাইতাম, সংক্রান্তি বলিয়া দিদি যাইতে দেন নাই। অদ্য ১লা বলিয়া যাইতে দিলেন না, আগামী কল্য যাইব।

আমায় বাটী লইয়া যাইবার নিমিত্ত এত ব্যস্ত কেন? তোমাদের কষ্ট হইতেছে বলিয়া? না আমার কষ্ট হইতেছে বলিয়া আমাকে বাটী যাইতে বল। আমি সেখানে লজ্জা পাইয়াছি, অপমানিত হইয়াছি, সুতরাং সেখানে মুখ দেখাইতে আপাততঃ আমার ইচ্ছা নাই। কিন্তু তুমি জেদ করিতেছ যে, আমি সেইখানে মুখ দেখাই লোকের উপহাস্য হই। তুমি স্বীকার করিয়াছ যে আমার এ সময় মনের...তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে...নানাস্থানে নানারূপ দেখিয়া কি কতক...মনস্ক হওয়া যায় না? কতক কষ্ট দূর হয় না? তুমি সে কষ্ট দূর করিতে দিতে চাও না। তাহার পর কোনরূপ অর্থাগমের উপায় করিব, সন্ধান করিব, তাহাতেও তুমি প্রতিবাদী। ভাল! তুমি এখন আমার উপযুক্ত সন্তান, তোমার পরামর্শ শুনিব। শীঘ্র বাটী যাইব। দেখা যাক্, কি সুবিধা তুমি স্থির করিয়াছ। ইতি ১লা ফাল্গুন বুধবার

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির '...' অংশগুলি ছিন্ন।

সঞ্জীবচন্দ্র জ্যোতিশের অনুরোধে এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রও তাঁকে বাড়ি ফিরে আসার কথা লেখায়, তিনি আর বেশী না ঘুরে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন।



সঞ্জীবচন্দ্র

(১৮৩৪-১৮৮৯)

সঞ্জীবচন্দ্র পাওনাদারের ডিক্রির টাকা কিভাবে মিটিয়েছিলেন, তা জানা গেল না। তবে অনুমান হয়, জ্যোতিশের নামের কিছু জমি বিক্রি করে এবং সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রেরও কিছু সাহায্য নিয়ে ঐ ঋণ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রচুর ঋণ আছে দেখে, যাদবচন্দ্র মৃত্যুর আগে জ্যোতিশকে কিছু জমি দিয়ে ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র এক তো ভাবুক সাহিত্যিক, তার উপর ছিলেন কিছুটা উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। তাই ব্যবসা-বুদ্ধি না থাকায় বঙ্গদর্শন প্রেসে তাঁর লাভ না হয়ে প্রচুর লোকসানই হয়েছিল। কিন্তু পাওনাদার তো কিছু ছাড়ার লোক ছিলেন না। তিনি নির্মমভাবে তাঁর পাওনা আদায় করে নিয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র ভাগ্যদোষে নিজের অবিবেচনা, অমিতব্যয়িতা ও উদাসীনতার জন্য জীবনের অনেকটা সময়ই ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়িয়েছেন, আর তাঁর ঋণদাতাদের যে কি জুলুম ও অত্যাচার ছিল, সে তো এই আলোচনা থেকেই দেখা গেল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে 'সঞ্জীবচন্দ্র' প্রবন্ধে বলেছেন— 'তাঁহার (সঞ্জীবচন্দ্রের) প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। ভালো গৃহিণীপনায় স্বল্পকে যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে···কিন্তু অনেক থাকিলেও উপযুক্ত গৃহিণীপনার অভাবে সে ঐশ্বর্য ব্যর্থ হইয়া যায়।·· তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন, তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই। তাহার কারণ সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী, কিন্তু গৃহিণী নহে।'

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনের এই বেদনাময় দিকটার কথা হয়তো জানতেন না। জানলে তিনি সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা স্বীকার করেই, তাঁর গৃহিণীপনার অভাবের বদলে নিশ্চয়ই অন্য কথা বলতেন।

আমরা দেখলাম, সঞ্জীবচন্দ্র দেনার দায়ে আত্মগোপন করে দূরে থেকেও ঐরূপ একটা অশান্তিময় বিশ্রী মানসিক অবস্থাতেই 'মাধবীলতা' লিখে প্রেসে পাঠাচ্ছেন। সচ্ছল অবস্থায়, শান্ত মনে ও নিরুপদ্রব পরিবেশে তিনি যদি দীর্ঘদিন লেখার সুযোগ পেতেন, তা হলে নিঃসন্দেহেই তিনি তাঁর প্রতিভার দানে বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন।

একটি অন্য মামলা

এই বইয়ের ৪৬ ও ৫৭ পৃষ্ঠায় জ্যোতিশকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের চিঠিতে 'প্রসন্নর মোকদ্দমা'র কথা আছে। ঐ মামলা সম্বন্ধে এখন কিছু বলছি—

সঞ্জীবচন্দ্র অনেকের কাছে ঋণ করেছিলেন এবং তাঁর দু-একজন পাওনাদার পাওনা আদায়ের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কোর্টে নালিশও করেছিলেন—এ কথা সত্য। তাহলেও এই প্রসন্নর মামলাটা কিন্তু আদৌ তাঁর ঋণ সংক্রান্ত ছিল না।

মামলাটা টাকা-পয়সারই মামলা। তবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির মতে এটা ছিল একটা জাল মামলা। এই মামলার বাদী প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্ররা চার ভাই।

কোর্টের সীলমোহরযুক্ত এই মামলার একটি বিবরণ এবং উভয় পক্ষেরই সাক্ষীর সাক্ষ্য দানের কিছু নকল দেখেছি। এই সাক্ষ্য দানের নকলগুলি স্ট্যাম্প পেপারে লেখা এবং সীলমোহরযুক্ত। এই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ঐ মামলায় তদারককারী তাঁর কর্মচারী উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মামলায় প্রতিবাদের জন্য তখন তিনি যে বক্তব্য লিখে পাঠিয়ে ছিলেন, সেটিও দেখেছি। এগুলি সবই বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাড়িতে স্থাপিত 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায়' রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবাদ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার আগে বিবরণপত্র থেকে মামলার বিবরণ এবং বাদীর নিজের সাক্ষ্যদানেরও কিছুটা উদ্ধৃত করছি। এ থেকে মামলার গোড়ার দিকের ইতিহাসটা পরিষ্কার জানা যাবে। বিবরণপত্রটি এই—

মহামহিম জেলা ২৪ পঃ শ্রীযুত দ্বিতীয় সাব জজ বরাবরেষু—

বাদী—প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়। পিতার নাম ৺নবকুমার মুখোপাধ্যায়। সাং কাঁটালপাড়া, পঃ হাবিলিশহর, স্টেঃ নৈহাটি, চৌকী বারাসত।

প্রতিবাদী—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী পুত্র—

১। শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

২। শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাং কাঁটালপাড়া

উক্ত ৩ নং প্রতিবাদী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেকটর মোঃ হাঃ হাবড়া।

দাবী, গচ্ছিত টাকা পাইবার কারণ তের শত টাকা পরিমাণ দাবী।

নালিশের বিবরণ এই যে—

১। প্রতিবাদীগণের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাদীর পিসি থাকমণি দেব্যার হিতৈষী ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন।

২। মৃত থাকমণি দেব্যার আপন জীবদ্দশায় সন ১২৮৬ সালের ২ মাঘ তারিখে নগদ তের শত টাকা উক্ত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন।

৩। উপরোক্ত থাকমণি দেব্যা বাদীর পিতার সহোদরা হইতেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে বাদীর অনুকূলে এক কেতা রেজেষ্টারিযুক্ত উইলের দ্বারা সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাদীকে ১২৮৮ সালের ১৫ ভাদ্র তারিখে উইল করিয়া দিয়া ঐ সনের ২৩ ভাদ্র তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন।

৪। পরে বাদী উক্ত উইলের অত্র জেলায় জজ সাহেবের আদালত হইতে প্রোবেট পাইবার কারণ দরখাস্ত করেন এবং উইল সম্বলিত প্রোবেট প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৫। উক্ত উইলের লিখিত মৃত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থানে গচ্ছিত ১৩০০ টাকা তাঁর জীবদ্দশায় বাদীর পিসি থাকমণি দেব্যা বার বার চাহিয়াছিলেন এবং উক্ত যাদবচন্দ্র ঐ টাকা পরিশোধ করিবার কারণ আপন পুত্রগণকে আদেশ করেন।

৬। যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সন ১২৮৭ সালের মাঘ মাহায় পরলোক গমন করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে আপন পুত্রগণকে শ্রীমত্যা থাকমণি দেব্যার ঋণ সর্বাগ্রে পরিশোধ করিবার আদেশ দেন।

৭। বাদী, যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর পর উইলের লিখিত গচ্ছিত টাকা প্রতিবাদীগণের নিকট বার বার তলব করেন।

৮। প্রতিবাদীগণের মধ্যে ৩ নং প্রতিবাদী বাদীকে পাঁচ শত টাকা লইয়া বক্রি আট শত টাকা পরিত্যাগ করিয়া রসিদ দিতে বলায় বাদী তাহাতে অসম্মত হন। কাজেই নালিশ ভিন্ন অন্য উপায় না থাকায় নালিশের কারণ শেষ

ডিম্যাণ্ড সন ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাহায় অত্র আদালতের এলাকাধীন কাঁটালপাড়া গ্রামে উত্থিত হইয়াছে।

প্রার্থনা যে—

১। দাবীকৃত তের শত টাকা মৃত যাদবচন্দ্রের এস্টেট হইতে আদায় দিবার পক্ষে বিহিতাদেশ হয়।

২। মৃত যাদবচন্দ্রের এস্টেট যাহা প্রতিবাদীগণের হস্তবশে আসিয়াছে, ঐ এস্টেট হইতে বাদীর প্রাপ্য তের শত টাকা ও আদালত খরচার ডিক্রি দিতে আজ্ঞা হয়।

৩। আদালতের ন্যায়-বিচারে বাদী অপর যে-কোন প্রকার উপকার পাইতে পারেন, তাহার ডিক্রি দিতে আজ্ঞা হয়।

এবার বাদীর নিজের সাক্ষ্য দানের নকল থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

জেলা চব্বিশ পরগণা দ্বিতীয় সব জজ আদালত

মোকদ্দমা নং ১০৬ সন ১৮৮৪ সাল

বাদী—শ্রীপ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রতিবাদী—শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় দিঃ

সন ১৮৮৫ সালের ১৩ জুলাই তারিখে বাদীর খোদ প্রতিজ্ঞা পূর্বক সাক্ষ্য হইতে গৃহীত হইল—

আমার নাম শ্রীপ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়। আমি এই মোকঃ বাদী। থাকমণি দেবী আমার পিসি হইতেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কাঁটালপাড়ায় তাঁহার পিত্রালয়ে ছিলেন। তাহার স্বামী অর্থশালী লোক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর থাকমণি ধনসম্পত্তি লইয়া কাঁটালপাড়ায় আসেন। তাঁহার ৪/৫ হাজার টাকা ছিল। পুণ্যকর্মে তাহা খরচ করিতেন। যাদব চাটুয্যেকে চিনিতাম। থাকমণি দেবী যাদব চাটুয্যের কাছে তের শত টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। ১২৮৬ সালের ২রা মাঘ তারিখে রাখেন। শিব প্রতিষ্ঠা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঐ টাকা গচ্ছিত রাখেন। যখন গচ্ছিত রাখেন তখন তাঁহার সঙ্গে আমি ও আমার মামা হরিনাথ গড়গড়ি গিয়াছিলাম। পরে সেখানে নটবর চক্রবর্তী আসিয়াছিল। মন্দির তৈয়ার হইলে ১২৮৭ সালের কার্তিক মাসে আমি ঐ টাকার তাগাদা যাদব চাটুয্যের

নিকট করিয়াছিলাম। যাদব চাটুয্যে সেই বছরের মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। পৌষ মাসে বলায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি ছেলেদের বলিয়াছি, মাঘ মাসের ১৫ই-য়ের মধ্যে টাকা যোগাড় করিয়া দিব। সংক্রান্তিতে প্রতিষ্ঠা হইবে। মাঘ মাসে যাদব চাটুয্যে পীড়িত হইয়া পড়েন ও সেই মাসের শেষাশেষি তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার পীড়িত অবস্থায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। থাকমণি মরিয়াছেন ১২৮৮ সালের ২৩শে ভাদ্র তারিখে। যাদব চাটুয্যেকে যেদিন গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ হয়, সেইদিন আমার পিসি সেখানে গিয়াছিলেন ও আমিও গিয়াছিলাম। তাহাতে বঙ্কিমবাবু বলেন—তোমার তের শত টাকার কথা বাবা আমাকে বলিয়াছেন, তোমার ভাবনা নাই। আমি তার দায়ী রহিলাম। বাবাকে এ সময়ে আর বিরক্ত করিও না।—তারপর থাকমণি জীবিত থাকিতে আর তাগাদা হয় নাই। তিনি মরিয়া গেলে আমি তাগাদা করিয়াছি। থাকমণি দেবী আমাকে তাঁহার সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়াছেন। আমি সেই উইলের প্রোবেট লইয়াছি। আমি বঙ্কিমবাবুর কাছে নিজে দুবার তাগাদা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—'শীঘ্র টাকা জোগাড় করিয়া দিতেছি।' ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে পাঁচ শত টাকা লইয়া বাকি দাবী ছাড়িয়া দিতে, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। আমি তাহাতে স্বীকার না হইয়া এই নালিশ করিয়াছি। থাকমণি দেব্যা ঐ টাকা সুদ পাইবার আশায় যাদব চাটুয্যেকে কর্জ দেন নাই। অনেকেই যাদব চাটুয্যের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিতেন। যাদব চাটুয্যের ত্যাজ্য সম্পত্তি প্রতিবাদীদের দখলে আছে।...

যাদব চাটুয্যের বাটী ও থাকমণির বাটী এপাড়া ওপাড়া—রশি ৩।৪ তফাৎ। থাকমণি যাদববাবুদের বাটীতে সর্বদা যাইতেন ও যাদববাবুকে বাবা বলিয়া ডাকিতেন ও তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেন। থাকমণি শ্যামাচরণ চাটুয্যের নিকট পাঁচ শত টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহার দরুণ সুদ ছিল। এই স্বজন ছাড়া থাকমণি আর কোন লোককে কখনও কোন টাকা কর্জ দেয় নাই। শ্যামাচরণবাবুর কাছের টাকা ও সুদ থাকমণি নিজে আনিত। থাকমণির কোন হিসাবপত্র খাতা দেখি নাই ও পাইও না।

Q—এমন হইতে পারে যে, যাদববাবুর কাছে থাকমণি টাকা আনিয়াছেন, তাহা তুমি জানিতে পার নাই।

Ans—তিনি যদি আনিতেন তো আমাকে বলিতেন। ঐ গচ্ছিত

রাখার পূর্ব হইতে থাকমণি পীড়িত। গচ্ছিত রাখার পর, তিনি আর যাদব চাটুয্যের বাটীতে যান নাই।···

বঙ্কিমবাবু এখন ঝিনাইদহে আছেন। ইতি—

শ্রীপ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়

এবার বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজের বইয়ের ও বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে দেখাশুনা করবার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই মামলায় প্রতিবাদ করতে যে কথা ক'টি ঝিনাইদহ থেকে লিখে জানিয়ে ছিলেন, সেই লেখাটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

১। আমাদের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট থাকমণি দেবীর কোন গচ্ছিত টাকা ছিল না।

২। থাকমণির নিকট পিতাঠাকুর মহাশয় কিছু টাকা কর্জ লইয়াছিলেন। থাকমণি রীতিমত তাহার সুদ লইয়াছে। ইহার প্রমাণার্থ পিতাঠাকুর মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত খাতাপত্র দাখিল করিতেছি। ঐ কর্জ টাকা ভিন্ন পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট থাকমণির অন্য কোন টাকা ছিল না।

৩। ঐ·· এক্ষণে তামাদি হইয়াছে।· সালের মাঘমাসে পরলোক গমন করেন। বাদীর নালিশী আরজিতেই তাহা প্রকাশ আছে।

৪। পিতাঠাকুর মহাশয়ের ত্যাক্ত কোন সম্পত্তি আমাদের দখলে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই নির্দেশ চারটির মধ্যে, কাগজটি বর্তমানে ছিন্ন হওয়ায় তিন সংখ্যক নির্দেশে কি কি কথা ছিল, তা সম্পূর্ণ জানা গেল না।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর ভাইদের পক্ষ থেকে প্রসন্নর মামলায় প্রতিবাদ জানাবার সময় কোর্টে বঙ্কিমচন্দ্রদের পিতার স্বহস্ত লিখিত খাতাপত্র দাখিল করা হয়েছিল।

মামলার শেষের দিকের কোন কাগজপত্র না পাওয়ায়, মামলার শেষ ফল কি হয়েছিল, তা জানা যাচ্ছে না। তবে মনে হয়, প্রসন্নই হেরেছিল এবং মামলাটি জাল বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

আমরাও দেখছি, প্রসন্নর নিজেরই সাক্ষ্যদানের মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। তিনি একবার বলছেন—যাদব চাটুয্যের গঙ্গাযাত্রার দিন থাকমণি যাদববাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। আবার বলছেন—গচ্ছিত রাখার আগে থেকেই

থাকমণি পীড়িত এবং গচ্ছিত রাখার পর তিনি আর যাদববাবুর বাড়িতে যান নি। ইত্যাদি

প্রসন্নর মামলাটি জাল বলে আমাদেরও মনে হওয়ার আরও কারণ এই যে, প্রসন্নর পিসি যদি সত্যই যাদববাবুর কাছে টাকা গচ্ছিত রাখতেন, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই সে টাকা শোধ করে দিতেন।

আমরা জানি, যাদবচন্দ্র দানপত্র করার সময় তাঁর পাওনা এবং দেনার টাকাও চার পুত্রের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন। শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই ভাইয়ে এঁদের দেয় পিতৃঋণ যথাসময়ে শোধ করলেও, পিতার মৃত্যু সময় পর্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র তাঁদের দেয় পিতৃঋণের কিছুই শোধ করতে পারেন নি।

যাদবচন্দ্র মৃত্যুর কয়েকদিন আগে, সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রের ভাগের দেয় তাঁর ঋণের বাকি ৪ হাজার টাকার কথা বঙ্কিমচন্দ্রকে বললে বঙ্কিমচন্দ্র তখন পিতাকে বলেছিলেন—আপনি নিশ্চিন্ত হোন, ঐ টাকা আমিই দিয়ে দোব।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা শুনে যাদবচন্দ্র শান্তিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এবং বঙ্কিমচন্দ্রও পিতার মৃত্যুর পর কিছুদিনের মধ্যেই ঐ ৪ হাজার টাকা শোধ করেছিলেন।

যাদবচন্দ্র অত্যন্ত ধার্মিক লোক ছিলেন। তাই আমাদেরও মনে হয়, থাকমণির যদি তেরশ টাকা সত্যই যাদবচন্দ্রের কাছে পাওনা থাকতো, তাহলে যাদবচন্দ্র মৃত্যুর সময় সেকথাও বঙ্কিমচন্দ্রকে বলতেন। আর বললে, বঙ্কিমচন্দ্র পিতৃঋণের বাকি ৪ হাজার টাকা যখন দিয়েছিলেন, তখন থাকমণির ঐ তেরশ টাকাও নিশ্চয়ই দিতেন।

তাছাড়া এমনও তো হতে পারে, ঐ ৪ হাজার টাকা বাকি ঋণের মধ্যে যাদবচন্দ্রের হিসাবের খাতায় উল্লেখিত থাকমণির কর্জ দেওয়ার টাকাও ছিল এবং যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর পর থাকমণি নিজেই সে টাকা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে নিয়েছিলেন।

গচ্ছিতের টাকার কথা নিয়েই হাকিম নিজেও প্রসন্নকে এই ধরণের একটা প্রশ্ন করেছিলেন—গচ্ছিতের টাকা থাকমণি নিজে এনেছিলেন, তুমি হয়ত তা জান না।

এরই উত্তরে প্রসন্ন অপ্রস্তুত হয়ে, তাঁর মামলার মূল বয়ানের উল্টো কথাই বলেছিলেন।

আগে বলেছি, থাকমণি যাদবচন্দ্রের কাছে টাকা রাখলে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই সে টাকা দিতেন। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র কারও পাওনা ফাঁকি দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর এই আদর্শ নিয়েই জ্যোতিশকে লেখা দুটি চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি—

কল্যাণবরেষু,

...পরম্পরায় শুনিলাম যে, বরদা ভট্টাচার্য ও রাম ফক্কড় তোমার নামে নালিশ করিয়াছে। সত্য মিথ্যা জানি না।

তুমি কেমন আছ লিখিবে। ইতি তাং ৫ এপ্রিল

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

তোমার নামে যে নালিশ হইয়াছে, বিপিনের দ্বারা এর একটা জবাব দেওয়াইব। বিপিন এক্ষণে এখানে নাই। ডায়মণ্ডহারবারে আছে। আসিতে লিখিয়াছি।

হ্যাণ্ডনোট জাল বটে। দেনা তোমার পিতার বটে, তোমার নহে। কিন্তু দেনা যথার্থ। তোমার পিতৃসম্পত্তির উপর ডিক্রি হইলেও আদায় হইবে। কেন না, তোমার পিতার পরিত্যক্ত কিছু জমি তুমি দখল কর। রাম ফক্কড় তাহা জানে। এমত স্থলে জবাব দিয়া টাকা নষ্ট করা তাদৃশ বিধেয় বোধ হয় না। তুমি জবাব দিতে লিখিয়াছ। এজন্য বিপিনের উপর ভার দিব। কিন্তু ব্রাহ্মণের যথার্থ পাওনা। আমি তাহার বিরোধী হইতে ইচ্ছুক নহি। আর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জেলে দিবার তদ্বির জন্য যাহা লিখিয়াছ, আমা হইতে তাহা হইবে না। তাহা হইলে রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজনাথকে ইতিপূর্বে জেলে দিতাম।...

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির বিপিন হলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্ণচন্দ্র ঐ সময় ডায়মণ্ডহারবারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাই বিপিন তখন পিতার কাছে গিয়েছিলেন।

চিঠির রাম ফক্কড় হলেন—রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন ও প্রতিবেশী নৈহাটী নিবাসী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী লিখে গেছেন—'কাঁটালপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন। লোকে তাঁহার কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিল রাম ফক্কড়। নৈহাটী ও কাঁটালপাড়া গ্রামে সকল বাড়িতেই তাঁহার অবারিত দ্বার ছিল। তিনি সব বাড়িতেই যাইতেন, সকলের সঙ্গেই ফক্কুড়ি করিতেন এবং ফক্কুড়িই তাঁহার জীবিকা ছিল।' —বঙ্কিম প্রসঙ্গ।

রাম ফক্কড় জাল হ্যাণ্ডনোট করায়, তাকে জেলে দেবার জন্য তদ্বির করতে জ্যোতিশ বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখলে, তার জবাবে তিনি বলেছিলেন—আমা হইতে তাহা হইবে না। তাহা হইলে রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজনাথকে ইতিপূর্বে জেলে দিতাম।

সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠিতে এই রামকৃষ্ণ ও ব্রজনাথের কথা দেখেছি। সেখানে তিনি লিখেছিলেন—যেস্থানে রামকৃষ্ণ ও ব্রজনাথের মত লোক আমার পিতাকে জালসাজ বলে, যে দেশে বসন্ত ও চণ্ডী ভট্টাচার্যের মত লোকের সঙ্গে দলাদলি···সে দেশের সঙ্গে আমি আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, কাঁটালপাড়া গ্রামে তখন দলাদলি ছিল প্রচণ্ড। মনে হয়, এই দলাদলির কারণেই রামকৃষ্ণ ও ব্রজনাথ প্রসন্নকে দিয়ে ঐ তেরশ টাকার দাবী জানিয়ে মামলা রুজু করিয়েছিলেন। এবং এই নিয়েই তাঁরা তখন বলেছিলেন—যাদব চাটুয্যে জাল সেজে ঐ তেরশ টাকার কথা মরার আগে ছেলেদের কাছে বলে যান নি। সম্ভবত গ্রামের এই দুই মোড়লের প্ররোচনায় প্রসন্ন মামলায় নেমেছিলেন বলেই, মামলায় জেতা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন নি।

যাই হোক, যে কোন কারণেই হোক, রামকৃষ্ণ ও ব্রজনাথকে তাঁদের অন্যায়ের জন্য জেলে দেবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁদের জেলে দেননি এবং রাম ফক্কড় নিজের প্রকৃত পাওনা আদায়ের জন্য জাল হ্যাণ্ডনোট করা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর বিরুদ্ধেও কিছু বলতে চাননি, এতে একদিকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষমা ও মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, অপর দিকে তেমনি তাঁর ন্যায়াদর্শেরও পরিচয় মেলে।

চরিত্রের কয়েকটি দিক

সঞ্জীবচন্দ্র প্রধানত অমিতব্যয়িতা ও আড়ম্বর প্রিয়তার জন্য মাঝে মাঝে ঋণ করে থাকলেও এবং সেই ঋণের জন্য কখন কখন বেশ বিপদে পড়লেও, তিনি কিন্তু বরাবরই কথাবার্তায় অত্যন্ত সুরসিক ও রহস্য-প্রিয় মানুষ ছিলেন। এই রসিকতা করতে গিয়েই তিনি তাঁর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিটি হারিয়ে ছিলেন। তবুও তিনি কথাবার্তায় রসিকতা ও রহস্য ছাড়েন নি।

সঞ্জীবচন্দ্র যে রসিক, পরিহাস-প্রিয় ও গল্পপ্রিয় আলাপী মানুষ ছিলেন, তার পরিচয় পাই, তাঁর সমসাময়িক অনেকের লেখা থেকে। এখানে এ সম্পর্কে কয়েক জনের লেখা উদ্ধৃত করছি—

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—সঞ্জীবচন্দ্র কথোপকথনে অতিশয় সুরসিক ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি চলে যাওয়ার অনেক বছর পরের ঘটনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র তখন কলকাতায় 'ভবানী-চরণ দত্ত স্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে, কিন্তু বেশী কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সঙ্কোচে কথা সরিত না। এক একদিন দেখিতাম, সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড় খুশী হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত।'

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—'একদিন বঙ্কিমবাবুর বাড়ি গিয়া দেখি তাঁহার নিকট হেমবাবু, চন্দ্রনাথবাবু এবং সঞ্জীববাবু বসিয়া আছেন। আমি আসিবার আগে ইঁহাদের ভারি একটা তর্ক চলিতেছিল। তর্কের বিষয় ইউনিভারসিটিতে মেয়েদের বি, এ, উপাধি লাভ উপলক্ষে হেমবাবুর অভিনন্দন কবিতাটি। হেমবাবু ইংরাজিতে বলিতেছিলেন—তোমাদের কোনও উৎসাহ নাই, জীবন নাই।

সঞ্জীববাবু বলিলেন—ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তুমি সকলের ছোট।

হেমবাবু সঞ্জীববাবুর বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন। দুজনে একটু রহস্য চলিল।'—বঙ্কিম প্রসঙ্গ

শ্রীশবাবু আরও লিখেছেন—'সরস্বতী পূজার দিন কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া সন্ধ্যার পর বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। তখন কলুটোলায় সেন মহাশয়দের বাড়ির কাছে তাঁহার বাসা। উপরের বৈঠকখানায় পীড়িত শ্যামাচরণবাবু শয্যাগত, ··ঘরে একপার্শ্বে সঞ্জীববাবু ও রুগ্নশয্যার কাছে বঙ্কিমবাবু।

রাজকুমারবাবু এবং ঔপন্যাসিক দামোদরবাবু বসিয়াছিলেন। শেষোক্ত কিছুদিন পূর্বে শ্যামাচরণবাবুর বৈবাহিক হইয়াছিলেন। অতএব উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া নূতন বৈবাহিকের সঙ্গে রহস্যে রহস্যে আমাদিগকেও আমোদিত করিতেছিলেন। সঞ্জীববাবুর তামাসার মাত্রা কিছু বেশী বেশী, বঙ্কিমবাবুর ততটা নহে। তিনি বরঞ্চ বার বার বলিতে লাগিলেন—'ছেলেমানুষের সঙ্গে ও সব কেন? রাখালের বয়সী বা কিছু বড় বই ত নয়।' কিন্তু সঞ্জীববাবু তবু ছাড়েন না।'

এখানে উল্লেখিত শ্যামাচরণবাবু হলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের বড়দা। দামোদরবাবু হলেন, দামোদর মুখোপাধ্যায়। শ্যামাচরণবাবুর পুত্র শচীশচন্দ্রের সঙ্গে দামোদরবাবুর কন্যার বিয়ে হয়েছিল। আর রাজকুমার (পাল?) সঞ্জীবচন্দ্রদের বিশেষ পরিচিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কথা বলতে গিয়ে তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

'যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিতা হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে? যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু (মিত্র) কে এই প্রশ্ন করেন, তখন সেইস্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম।

সঞ্জীবচন্দ্র বড় ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিলেন—'যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে মেয়েটা চোর হইবে, বনে জঙ্গলে ভাল দ্রব্যাদি খাইতে পাইত না, সমাজে আসিয়া ভাল খাদ্য দ্রব্যাদি দেখিয়া বড় লোভী হইবে। দরিদ্র ঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের ঘরের চুরি করিয়া খাইবে, অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পরিবে।' পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে; সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।'

এখানে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মধ্যমাগ্রজ এই সঞ্জীবচন্দ্রকেই তাঁর কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের এইরূপ ব্যঙ্গ ও রহস্য-প্রিয়তার আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

সঞ্জীবচন্দ্র একজন ভাল শিল্প-রসিকও ছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের একটা লেখা উদ্ধৃত করছি। শ্রীশবাবু লিখেছেন—

'সঞ্জীববাবুর সঙ্গে একদিন আমার গ্রীক লাওকোয়েনের কথা হইতেছিল। তিনি বুঝাইতে ছিলেন, গ্রীক শিল্পী সেই প্রস্তর মূর্তিতে কি সুন্দর কাব্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বলদৃপ্ত লাওকোয়েন সর্পবেষ্টিত এবং আসন্নমৃত্যু হইয়াও বামে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্র দুইটিকে যত্নে রক্ষা করিতেছেন। সেই অবস্থায় দৃঢ় ওষ্ঠে অধর চাপিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি তাঁহার দুর্ভাগ্য বিধাতা দেবতাদের জানাইতেছেন। অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয় জানিয়াও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সঞ্জীববাবু বলিলেন—এইখানে শারীরিক বলে ধর্মবল মিশিয়াছে।'

শ্রীশবাবুর লেখা থেকেই সঞ্জীবচন্দ্রের চরিত্রের আর একটা দিকের উল্লেখ করছি। শ্রীশবাবু লিখেছেন—

'আমার গৃহিণী এক অদ্ভুত রকমের হিষ্টিরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন।...

সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—অলকট সাহেব আসিয়া কি করিল?

আমি তাঁহার ও মিসেস গর্ডনের কার্য বর্ণনা করিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন—বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় mesmerize করিতে জানেন। সেদিন তিনি (বঙ্কিমবাবু) ডাক্তারী কোনও পুস্তকে পড়িতে ছিলেন, ফোড়ার উপর mesmerizc করার মত অঙ্গুলি চালনা করিলে সোয়াস্তি বোধ হয়, তবে আঙ্গুলে কর্পূর মাখাইতে হয়।

সঞ্জীববাবু বলিলেন, তাঁর নিজেরও কিছু কিছু mesmerie power আছে। তিনি উহার দ্বারা নিজের স্ত্রীর ফোড়া আরোগ্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু ফোড়া স্পর্শ করিতে হয় নাই।'

এবার সঞ্জীবচন্দ্রের চরিত্রের আরও দু একটা দিকের কথা বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'সঞ্জীবচন্দ্র চিরকাল সমান উদার, প্রীতিপরবশ। প্রাচীন বয়সেও আশ্রিত অনুগত ব্যক্তি কুস্বভাবাপন্ন হইলেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না।'

সঞ্জীবচন্দ্রের এই উদার স্বভাবের নমুনা হিসাবে একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

আগের প্রবন্ধ 'অন্য এক মামলা'য় দেখেছি, বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ ভট্টাচার্যের উপর কিরূপ ক্রুদ্ধ ছিলেন। অথচ এই রামকৃষ্ণ ও ব্রজনাথই সঞ্জীবচন্দ্রের আশ্রয় ও আনুগত্য নিলে, সঞ্জীবচন্দ্র এঁদের প্রতি সমান উদার ও প্রীতিপরবশ হয়েছিলেন।

ব্রজনাথ ও রামকৃষ্ণের সঙ্গে যে সঞ্জীবচন্দ্রের সদ্ভাব ছিল, তার প্রমাণ হচ্ছে জ্যোতিশকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের এই চিঠি দুটি—

প্রাণাধিকেষু,

তোমার পত্র পাইয়া বড়বাবুকে শুনাইয়া ছিলাম। তিনি রামকৃষ্ণ দাদার বাটী সম্বন্ধে যে পত্র যদুবাবুকে লিখিয়া আমার নিকট উমাচরণ মাং এই মাত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

ব্রজনাথ এখান হইতে যাইবার দুই ঘণ্টা পরে আমার বড় জ্বর হইয়াছিল। সমস্ত রাত্র বড় কষ্ট গিয়াছে। অদ্য অন্ন আহার করিয়াছি। বোধ হয় সোমবার বাটী যাইব।...১২ মার্চ

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রাণাধিকেষু,

এখানে রামকৃষ্ণ দাদা মরিয়াছেন। তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহাকে ঝাঁটা

মারিতে আসিয়াছিল। সেই দুঃখে তিনি গলায় ছুরি দিতে যান। আমি তাঁহাকে নিরস্ত করি। কিন্তু তাঁহার এতটা ঘৃণা ও যন্ত্রণা হইয়াছিল যে সাত দিনের মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করেন।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই রামকৃষ্ণ ও ব্রজনাথের প্রতি সদ্ভাব সহ উদারতা দেখানো, এটা সঞ্জীবচন্দ্রের চরিত্রের একটা বড় গুণ স্বীকার করতেই হবে।

জ্যোতিশকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের আর একটি চিঠি—

প্রাণাধিকেষু,

শচীশচন্দ্রকে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০ টাকা দিলে ভাল হয়। কিন্তু আমার অতি মন্দ অবস্থা, কোথা হইতে দিব! যদি কোথায় পাও ৫ টাকা কর্জ করিয়া দিবা, আমার হাতে একটিও পয়সা নাই।

বঙ্গদর্শনের তাগিদ দেওয়া শেষ হইল কিনা লিখিবা। উমেশ দুই দিনের ছুটি চাহিয়াছিল। তাহা দিতে বিলম্ব করিবা না। উমেশ পরিশ্রমী, তাহাকে যত্ন দেখাইবা।

তোমার উমাচরণ দাদার বড় কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমি কি করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাকে কোনরূপ যে সাহায্য করিতে পারি, এমন উপায় দেখিতেছি না।

আমার জ্বর ত্যাগ হইয়াছে, কিন্তু শরীরে স্ফূর্তি হয় নাই। এই জন্য বঙ্গদর্শনের কিছু লিখিতে পারিতেছি না। কি করি! যে গ্যালি পাঠাইয়াছ, তাহা পড়িয়া দেখিলাম। লেখক অতি বালকের ন্যায় লিখিয়াছে। সংশোধন অনেক আবশ্যক। অদ্য পারিলাম না। রাত্রে চেষ্টা করিব। ইতি ১৬ আগষ্ট

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই চিঠিটি থেকেও সঞ্জীবচন্দ্রের চরিত্রের দরদী প্রভৃতি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা' প্রবন্ধে লিখেছেন—

আমাদের খুল্ল পিতামহ এক শত আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি আমার পিতামহের মধ্যম ভ্রাতা। তাঁহাকে আমরা মেজ ঠাকুরদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা শুনিতাম, তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসের অন্তর্গত। উহা প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসান কালের কথা। ইনি গল্প করিতে ভালবাসিতেন ও গল্প করিতে জানিতেন। আধুনিক কোনও কোনও বিদেশী গল্প-লেখকেরা যেমন নায়ককে মিষ্টার ও নায়িকাকে মিস্ লিখিয়া থাকেন, এই বর্ষীয়ান তেমনই তাঁহার নায়ককে মির্জা ও নায়িকাকে বিবি বলিতেন। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুনিয়া ছিলেন। যদিও ঐ ঘটনা আকবর শাহা বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল, তথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজ ঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম, জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজঠাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন এবং মান্দারণের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়া ছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে, উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। রাজপুতকুল-তিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়া ছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়া ছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল।

সরকারী কার্যোপলক্ষে সঞ্জীবচন্দ্র কিছুকাল জাহানাবাদে ছিলেন। তিনিও ঐ ঘটনাটি সেখানে শুনিয়া আমাদের নিকট গল্প করিয়া ছিলেন। তখন বোধ হয়, দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইয়াছিল।'

হুগলী জেলার আরামবাগ শহরের আগে নাম ছিল জাহানাবাদ।

সঞ্জীবচন্দ্র সরকারী কার্য উপলক্ষে কিছুকাল জাহানাবাদে ছিলেন—পূর্ণবাবু এ কথা লিখলেও, সঞ্জীবচন্দ্র কি কাজ নিয়ে জাহানাবাদে গিয়ে ছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতেও কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, সঞ্জীবচন্দ্র কিছুদিন জাহানাবাদে ছিলেন।

আর একটা কথা। সঞ্জীবচন্দ্র কোন্ সময়ে জাহানাবাদে ছিলেন, সে সম্বন্ধেও পূর্ণবাবু কোন কথা বলেন নি। তবে তিনি যে বলেছেন—তখন বোধ হয় 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়েছিল—এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চের পরে জাহানাবাদে গিয়েছিলেন। কারণ, আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী বই হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮৬৫র মার্চে।

পূর্ণবাবু 'বোধ হয়' বলে স্মৃতি থেকে বলতে গিয়ে সময়টা ভুল বলেছেন। কেন না, সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের পরে আরও অনেক দিন ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের জাহানাবাদে থাকার কথায় 'নবজীবন' ও 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'পিতা-পুত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'৬০।৬১ (১৮৬০।৬১) সালে পিতা (রায় বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকার) যখন জাহানাবাদে মুন্সেফ, বঙ্কিমবাবুর মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র তখন জাহানাবাদে সাব রেজিষ্ট্রার হইয়া গেলেন।'

সঞ্জীবচন্দ্র কোথায় কোথায় সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে সে কথা স্পষ্ট করে বলে গেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র জাহানাবাদের সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নি। তাছাড়া সঞ্জীবচন্দ্র তো সাব রেজিষ্ট্রার হয়েছিলেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি হারিয়ে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব ১৮৬০।৬১ তে তাঁর সাব রেজিষ্ট্রার হওয়ার কোন কথাই আসতে পারে না।

আগে দেখিয়েছি, সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পেয়েছিলেন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাওয়ার আগে সঞ্জীবচন্দ্র যে সরকারি চাকরি করেছিলেন, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—



বঙ্কিমচন্দ্র

'তখন উইল্‌সন সাহেব নূতন ইন্‌কাম ট্যাক্স বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় জেলায় আসেসর নিযুক্ত হইতেছিল। পিতাঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রকে আড়াই শত টাকা বেতনে একটি আসেসরিতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র এই যে লিখেছেন—সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় আসেসর নিযুক্ত হয়েছিলেন—এই আসেসরের কাজেই সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬১।৬২ খ্রীষ্টাব্দে জাহানাবাদে ছিলেন।

পূর্ণবাবু ও অক্ষয়বাবুর কথা নাকচ করে দিয়ে, এই কথাটা এত জোর দিয়ে আমি যে স্পষ্ট করে বলছি, তার কারণ, কাঁটালপাড়ার 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় এ সম্পর্কে একটা ছোট কাগজ পেয়েছি। ঐ কাগজে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর স্বল্পকাল স্থায়ী আসেসর জীবনের কাজ সম্বন্ধে তাঁর উপরওয়ালা হুগলীর কালেকটর সাহেবের মন্তব্যগুলির নকল রেখে গেছেন। সেই মন্তব্যগুলি এই—

Extracts from the remarks made by the Collector Mr. A. V. Palmer of Hooghly on the revised abstract of the increase of the Income Tax establishment and in the annual Business statement for 1861/62,—

I strongly recommend that the native assessor Baboo Sunjib chunder Chatterjee now entertained be continued on his present salary or if that is impossible that he may be allowed 200Rs pr menseum.

Baboo Sunjib chunder Chatterjee assessor have acquitted himself creditably.

Sd. A. V. Palmer
Collector

Extract from the Diary of the Collector Mr. A. V. Palmer into his annual tour into the interior of the District in February 1862.—

I visited the assessor's office at Jehanabad. Found he had not very much work to do, but sufficient to occupy him. His office was clear, neat and orderly.

Sd. A. V. Palmer
Collector

এই কাগজটি পাওয়ায় কয়েকটা বিষয়ে বেশ পরিষ্কার আলো পাওয়া গেল। যেমন—(১) এই লেখাটা না পেলে, অনেকে, অনেকেই বা বলি কেন, হয়ত সকলেই অক্ষয়বাবুর কথাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে ভাবতেন, সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬০।৬১ খ্রীষ্টাব্দে জাহানাবাদের সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন। আর এই সূত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় ভুল রয়েছে বলেও মনে করতেন। কিন্তু এখন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাই যে নির্ভুল তা দেখা গেল। (২) পূর্ণবাবুর লেখা পড়েও আবার কেউ কেউ অন্য সিদ্ধান্ত করতে পারতেন। তাঁদের সে সিদ্ধান্তেরও আর অবকাশ রইল না।

দুর্গেশনন্দিনীর রচনা কাল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) শচীশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী লিখতে আরম্ভ করেন এবং পর বৎসর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে রচনা শেষ করেন।

বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্মী কালীনাথ দত্তর লেখা থেকে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে এসে দুর্গেশনন্দিনী রচনা শেষ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে বদলি হয়ে এসে ছিলেন ১৮৬৪র মার্চে।

শচীশবাবুর এবং কালীনাথবাবুর লেখায় দুর্গেশনন্দিনীর রচনা কাল নিয়ে সামান্য তারতম্য থাকলেও, উভয়েরই লেখা থেকে তবে এটা দেখা গেল যে, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৩ তে দুর্গেশনন্দিনী লিখে ছিলেনই।

আমরা জেনেছি, সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৬২তে জাহানাবাদে ছিলেন। তাই পূর্ণবাবুর কথা অনুযায়ী এখন বলা যেতে পারে, সঞ্জীবচন্দ্র ঐ সময় কোন একদিন জাহানাবাদ থেকে বাড়ি এসে পূর্ণচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গড়মান্দারণের গল্প বলেছিলেন। আরও বলা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮।১৯ বছর বয়সে তাঁর মেজজ্যেঠামশায়ের কাছে প্রথম গড়মান্দারণের কাহিনী শুনলেও ৬।৭ বছর পরে সে কাহিনীর অনেকটাই ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। এবার

আবার সঞ্জীবচন্দ্রের মুখে গড়মান্দারণের গল্প শুনে অল্প দিন পরেই দুর্গেশনন্দিনী লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রকে দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনীর উপাদান সরবরাহের ব্যাপারে সঞ্জীবচন্দ্রের অবদান বা কৃতিত্ব যে অনেকখানি তা স্বীকার করতেই হবে।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও গড়মান্দারণ নিয়ে একটা দীর্ঘ দিনের প্রচলিত ভুলও সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। যেমন—আরামবাগের আদালত গৃহে আজও একটা শ্বেতপ্রস্তর ফলকে লেখা রয়েছে—

MANDARAN FORT IS THE SCENE OF THE STORY
'DURGESH NANDINI'
BY
BANKIM CHANDRA CHATTERJI
WHO WAS SUB-DIVISIONAL OFFICER OF
JAHANABAD
(ARAMBAGH) ABOUT 1892

বলা হয়, বঙ্কিমচন্দ্র জাহানাবাদে (আরামবাগে) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকা কালে এই আদালত গৃহে বসেই বিচার করতেন।

আরামবাগের ইতিকথা গ্রন্থেও লেখা হয়েছে—বঙ্কিমচন্দ্র যখন আরামবাগের মহকুমা শাসক ছিলেন, তখন তিনি পদাধিকার বলে একাধিক বার আরামবাগ পৌর সভার সভাপতি হয়েছিলেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Hooghly District Gazetteer গ্রন্থেও লেখা রয়েছে—

This fort is the secne of the story 'Durgesh Nandini' by the celebrated Bengali novelist Bankim chandra Chatterjee, who was Sub-Divisional officer of Jahanabad about 20 years ago.

এগুলি সবই ভুল। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি জীবনের ইতিহাস দেখলে জানা যায়, তিনি কোনদিনই জাহানাবাদে যান নি। আর তিনি চাকরি থেকে অবসরই তো নেন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে। অবসর নেওয়ার আগে তিনি আলিপুরের মহকুমা শাসক ছিলেন ৩ বৎসর ৫ মাস।

সঞ্জীবচন্দ্রের অজ্ঞাত রচনা

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে বলেছেন—তিনি যখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন, তখন তাঁর অনুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র 'ভ্রমর' নামে একটি ছোট পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রই ছিলেন 'ভ্রমরে'র সত্বাধিকারী ও সম্পাদক। এটি ছিল একটি মাসিক পত্রিকা।

'ভ্রমর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮১ সালের বৈশাখে। একটানা ১২৮২ সালের আষাঢ় মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১২৮৫ সালে সঞ্জীবচন্দ্র ঐ পত্রিকা চালাবার আবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ সময় মাত্র ভাদ্র ও আশ্বিন এই দু সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে, একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

'ভ্রমর' সম্পাদনার সময়কার কথায় বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন—'এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন। আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ সচরাচর করিতেন না।'

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন, ভ্রমরে সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' উপন্যাস দুটিও প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র 'দামিনী'কে উপন্যাস বললেও, এটি ঠিক উপন্যাস নয়। এটি আসলে একটি বড় গল্প।

বঙ্গদর্শনের ন্যায় ভ্রমরেও তখন অধিকাংশ লেখার সঙ্গেই লেখকের নাম থাকত না। এখানে ভ্রমরে প্রকাশিত 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী'র কথা যে বললাম, এ দুটি লেখার সঙ্গেও সঞ্জীবচন্দ্রের নাম ছিল না। ভ্রমরের এইরূপ নামহীন আরও কয়েকটি রচনাও অবশ্য সঞ্জীবচন্দ্রের জীবিতকালে বা তাঁর মৃত্যুর অল্প দিন পরে তাঁর নামে গ্রন্থভুক্ত হয়। যেমন—'কণ্ঠমালা' ও '[illegible]'।

ভ্রমরের অধিকাংশ রচনাই সঞ্জীবচন্দ্রের, বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা বললেও, লেখার সঙ্গে নাম থাকায় বাকি রচনাগুলির মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা কোন্-গুলি, তা স্পষ্ট করে বলা মুস্কিল। এখন ঐগুলির মধ্যে কোন রচনাকে

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে নির্বাচন করা যায় কিনা দেখা যাক্। তার আগে মোট ১৭ সংখ্যা ভ্রমরের কোন্ সংখ্যায় কি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটা তালিকা দিচ্ছি—

ভ্রমর—(মাসিক পত্র)

বৈশাখ, ১২৮১—ভ্রমর, রামেশ্বরের অদৃষ্ট, নিদ্রা, জলে ফুল (কবিতা), স্ত্রীজাতি বন্দনা। (কোন লেখার সঙ্গেই লেখকের নাম নেই।) পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩০

জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১—দামিনী (১ম হতে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) জলজ-সুন্দরী (কবিতা-শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ), নূতন জীবের সৃষ্টি, ভারত ভাণ্ডারি। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩২

আষাঢ়, ১২৮১—বৃষ্টি, কণ্ঠমালা (১ম-৫ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত, শেষে ক্রমশঃ), জলে আলো (কবিতা—কবিতাটির শেষে নাম আছে—শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ।) পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৪

শ্রাবণ, ১২৮১—কণ্ঠমালা (৬ষ্ঠ-৯ম পরিচ্ছেদ, শেষে ক্রমশঃ) একঘরে, ভারত ভাণ্ডারি। পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৪

ভাদ্র, ১২৮১—কণ্ঠমালা (১০-১৩শ পরিচ্ছেদ, শেষে ক্রমশঃ) অনন্তা। পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৪

আশ্বিন, ১২৮১—কণ্ঠমালা (১৪শ-১৬শ পরিচ্ছেদ), দুর্গপূজা, প্রভাতে যামিনী (কবিতা)। আগের মত কোন লেখাতেই লেখকের নাম নেই। পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৪

কার্তিক, ১২৮১—বঙ্গে দেব পূজা (লেখার শেষে আছে শুধু শ্রীঃ), কণ্ঠমালা (১৭ম-১৯শ পরিচ্ছেদ)। পৃঃ সংখ্যা—২৪

অগ্রহায়ণ, ১২৮১—বঙ্গে দেবপূজা (প্রতিবাদ), লেখার শেষে আছে—বঃ, স্বপন (কবিতা—শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), কণ্ঠমালা (২০শ-২২শ পরিচ্ছেদ)। পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৪

পৌষ, ১২৮১—বঙ্গে দেবপূজা (প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর), সংকার, কণ্ঠমালা (২৩শ-২৪শ পরিচ্ছেদ)। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩০

মাঘ, ১২৮১—খাদ্যাখাদ্য, কণ্ঠমালা (২৫শ—২৭শ পরিচ্ছেদ)। পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৪

ফাল্গুন, ১২৮১—কণ্ঠমালা (২৮শ-৩০শ পরিচ্ছেদ), বাহুবল, সংস্কার, (শেষে ক্রমশঃ)। পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৪

চৈত্র, ১২৮১—সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর আপস, চন্দ্রলোক (লেখার শেষে শ্রীবঃ), কণ্ঠমালা (৩১শ-৩২ পরিচ্ছেদ), বাঙ্গালার শূর বংশ। পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৪

বৈশাখ, ১২৮২—ভ্রমরের আত্মকথা, বঙ্গে পাঠক সংখ্যা, কণ্ঠমালা (৩৩শ-৩৫শ পরিঃ) নক্ষত্রের প্রতি (কবিতা—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), যাত্রা। পৃষ্ঠা সং—২৪

জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২—কীর্তন, কণ্ঠমালা (৩৬শ-৩৭শ পরিঃ) কাতরা ময়ূরী (কবিতা—শ্রীরাজকৃষ্ণ মিশ্র)। পৃষ্ঠা সং—২৪

আষাঢ়,১২৮২—আমি, কীর্তন, আর্যজাতির চিত্রপট (লেখক হিসাবে নাম আছে—শ্রীলালমোহন শর্মা)। শরৎশশী (কবিতা—লেখক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ)। পৃষ্ঠা সং—২৪

ভাদ্র, ১২৮৫—ভ্রমর (কবিতা), বাল্যবিবাহ, ভূতের সংসার, নবাব পিঁপড়ে। পৃষ্ঠা সং—২৪

আশ্বিন, ১২৮৫—অকাতরে বিবাহ, হৃদয় উচ্ছ্বাস (কবিতা—লেখক শ্রীঈশানচন্দ্র দত্ত), বিধবা, আনারবল্লী।—পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪।

এই রচনাগুলির মধ্যে ভ্রমরের প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনাটি অর্থাৎ মুখবন্ধে সম্পাদকের কথা ধরণের 'ভ্রমর' লেখাটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। ঠিক এমনি, ভ্রমর এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর, ১২৮২ সালের বৈশাখে প্রথমেই 'ভ্রমরের আত্মকথা' নামে যে রচনাটি প্রকাশিত হয়, সেটিও সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলেই আমি মনে করি। সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ রচনা দুটি এখানে পর পর উদ্ধৃত করছি—

ভ্রমর

আমরা, এক সুচতুর শিল্পকরকে ভ্রমরের একটি চিত্র ক্ষোদিত করিতে অনুরোধ করিলে তিনি স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি আমাদিগকে চিত্রের একটি আদর্শ দেখাইলেন। দেখিলাম যে, এক পদ্ম, পদ্মপত্র সহিত শোভিত, তাহার উপর বসিয়া এক মৌমাছি! আমরা শিল্পকরকে বলিলাম, 'এ যে মৌমাছি?' তিনি বলিলেন, 'আজ্ঞে না, এই ভ্রমর।' আমরা সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে আসিলাম। আমরাও বোধ হয় শিল্পকরের

অনুকারী। আমরা বলিয়াছিলাম, ভ্রমর প্রকাশ করিব—হয়ত, আমাদেরও ভ্রমর মৌমাছি হইয়াছে। যদি তাহা হইয়া থাকে, ভরসা করি পাঠক সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে যাইবেন।

বালিকারা উপকথা বলিয়া থাকে, এক রাজার দুয়া সুয়া দুই রাণী। দুয়া রাণী রাজসংসর্গে বঞ্চিতা—প্রণয় সুখের সাধ মিটাইবার জন্য আপন পর্ণকুটীরে কুলকাঁটা স্থাপন করিয়া, তাহাতে আপন অঞ্চল বাঁধাইয়া বলিতেছিল, 'ছি রাজা! ছাড়।' আমরা এই কুরূপ মৌমাছিকে বঙ্গোদ্যানে ছাড়িয়া দিয়া, সাধ মিটাইবার জন্য বলিতেছি—'ভ্রমর, একবার গুণ গুণ কর! এই কুসুমকিরীটি বৈশাখে নানা ফুলের পরিমল গুরু মন্দ সমীরণে আরোহণ করিয়া, ঘরে ঘরে গুণ গুণ করিয়া আইস। যেখানে দেখিবে বঙ্গশোভা কামিনীকুসুম অধরে মধু, নয়নে বিষ লইয়া ফুটিয়া আছেন, সেইখানে গিয়া গুণ গুণ করিয়া তাঁহাদের গুণ বলিয়া আইস। যেখানে দেখিবে, বঙ্গদেশের মহিরুহগণ, বিষয় রৌদ্রে তপ্ত হইয়া, ফলভরে অবনত হইয়া, বিমনা হইয়া আছেন, সেইখানে গিয়া তাঁহাদের ছায়ায় উড়িয়া গুণ গুণ করিয়া, তাঁহাদের গুণ গাহিয়া আসিবে। আর যখন দেখিবে যে, বঙ্গসমাজের কেতকী, ঘন প্রাবৃট মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে সাতপুরু চিকণ কাপড়ের ঘোমটা দিয়া, অথচ গ্রীবা উন্নত করিয়া সেই ঘোমটা ঠেলিয়া ঈষৎ কটাক্ষ ক্ষেপণ করিতে করিতে কণ্টকময় জঙ্গলরূপ ধর্মসমাজে বসিয়া কাহার ধ্যান করিতেছেন, তখন ভ্রমর! তুমি তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিও না। দূর হইতে দুখানি পাখা জড় করিয়া নমস্কার করিয়া সে কতকী সমাজ পরিত্যাগ করিও; নহিলে তোমার ঐ ঢল ঢল ঘনরুচি রঞ্জন কৃষ্ণকান্তি তাঁহার প্রচুর পরাগ স্পর্শে ধূসরিত হইবে। তাঁহার কাঁটায় তোমার ঐ সূক্ষ্ম পত্রময় পক্ষদ্বয় ছিন্ন ভিন্ন হইবে, এবং হয়ত ভ্রমর! তুমি তাঁহার তীব্রগন্ধে একেবারে অন্ধীভূত হইবে। তুমি সেখানে যাইও না। তুমি বঙ্গীয় সম্বাদ পত্রিকারূপিনী মধুমক্ষিকার মত, কোথায় মধু, কোথায় মধু করিয়া নিয়ত অন্বেষণ করিয়া বেড়াইও না। যে মধু সঞ্চয়ের প্রয়াস করে, সে মধুর অন্বেষণে রত রহুক; তুমি মধুকর, মধুকর মধুকরে মধু সঞ্চয় করে না; তুমি বঙ্গের মধুকর, ফুলে ফুলে ভ্রমিবে, তাহাতেই তুমি ভ্রমর, আর নিয়ত গুণ গুণ করিবে, সেইটেই তোমার গুণপনা। যে মধুমক্ষিকা সেই মধুচক্র করুক, তুমি কোন চক্রে থাকিও না, সঞ্চয়ী লোকেই চক্রে থাকে।

ভ্রমরের আত্মকথা

ভ্রমরের বয়ঃক্রম এক বৎসর পরিপূর্ণ হইল। এই অল্পকাল মধ্যে ভ্রমর যেরূপ আদরিত হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যাশা করি নাই। ভ্রমর অতি নম্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, জন্মবার্তা কোন সংবাদপত্রে পাঠান হয় নাই, কুলা বাজাইতে কাহাকেও ডাকা যায় নাই; অথচ বাঙ্গালার পদ্ম মাত্রেই ভ্রমরের বার্তা পাইয়াছেন। এক্ষণে যেখানে পদ্ম সেইখানেই ভ্রমর। যে গৃহে ভ্রমর যায় না, আমরা শুনিয়াছি সে গৃহে পদ্ম নাই, কেবল শিমুল শর্মারা বাস করেন।

অল্পকাল মধ্যে ভ্রমর চট্টগ্রাম হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহাতেই বোধ হইবে ভ্রমর নিতান্ত দুর্বল নহে।

ভ্রমরের গ্রাহক অনেক বাড়িয়াছে, নিত্য বাড়িতেছে; কিন্তু ভ্রমরের কলেবর বাড়িল না কেন, এই কথা অনেক মঙ্গলাকাঙ্খী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমরা প্রত্যুত্তরে বলি, বয়স বাড়িলে কলেবর বাড়িবে।

অনেক সূক্ষ্মদর্শী বলিয়াছেন যে, ভ্রমর দুই একটি বড় কথা ছোট করিয়া বলিতে পারিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন ছোট কথা বড় করিয়া বলিতে পারে নাই। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ভ্রমর বিশেষ আহ্লাদিত; ছোটকথা বড় করা আমাদের আধুনিক প্রথা—অপ্রতুলতার ফল। শূন্য পাত্রের শব্দ অধিক।

ভ্রমরের ত্রুটি অনেক। কিন্তু সেই সকল ত্রুটি সত্বেও যদি ভ্রমর কখন এক মুহূর্তের নিমিত্ত পাঠকদিগকে সুখী করিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে ভ্রমর আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিবে; পাঠকদিগের সুখসাধন করা ভ্রমরের প্রধান অভিলাষ।

সুখ সাধনের সঙ্গে হিতসাধন করা ভ্রমরের আর একটি অভিলাষ। পুরা-কালিক পুরোহিতের ন্যায় ভ্রমর গ্রাহকদিগের হিতসাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। হিতসাধন করিতে না পারে হিতাকাঙ্খী চিরকাল থাকিবে।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'পালামৌ' কাহিনীতে এক জায়গায় লিখেছেন—

'...একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় টিটাগড়ের বাগান 'লসিংটন লজ' হইতে গজেন্দ্র-গমনে আমি আসিতে ছিলাম—তখন রেলওয়ে ছিল না,

সুতরাং এখনকার মত বেগে পথ চলা বাঙ্গালীর মধ্যে বড় ফেসন হয় নাই। আসিতে আসিতে পশ্চাতে একটা অল্প টক্ টক্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখি, গবর্ণর জেনারেল কাউন্‌সলের অমুক মেম্বারের কুলকন্যা একা আসিতেছেন। আমি তখন বালক, ষোড়শ বৎসরের অধিক আমার বয়স নহে। সুতরাং বয়সের মত স্থির করিলাম, স্ত্রীলোকের নিকট পিছাইয়া পড়া হইবে না। অতএব যথাসাধ্য চলিতে লাগিলাম। হয়ত যুবতীও তাহা বুঝিলেন। আর একটু অধিক বয়স হইলে এদিকে তাঁহার মন যাইত না। তিনি নিজে অল্প বয়স্কা; আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মাত্র বয়োজ্যেষ্ঠা। সুতরাং এই উপলক্ষে বাইচ খেলার আমোদ তাঁহার মনে আসা সম্ভব। সেইজন্য একটু যেন তিনি জোরে বাহিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমে মেঘের মত আমাকে ছাড়াইয়া গেলেন; যেন সেই সঙ্গে একটু 'দুয়ো' দিয়ে গেলেন,—অবশ্য তাহা মনে মনে, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি ছিল, তাহাই বলিতেছি। আমি লজ্জিত হইয়া নিকটস্থ বটমূলে বসিয়া সুন্দরীদের উপর রাগ করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলাম। যাহারা এত জোরে পথ চলে, তাহারা আবার কোমলাঙ্গী? খোসামুদেরা বলে, তাহাদের অলকদাম সরাইবার নিমিত্ত বায়ু ধীরে ধীরে বহে—কলাগাছে ঝড়, আর সিমুল গাছে সমীরণ?'

এই 'পালামৌ'-য়েই আর এক জায়গায় লিখেছেন—

'পালামৌ-র প্রধান আওলাত মৌয়া গাছ। সাধু ভাষায় বুঝি ইহাকে মধুক্রম বলিতে হয়। সাধুদের তৃপ্তির নিমিত্ত সকল কথাই সাধু ভাষায় লেখা উচিত। আমারও তাহা একান্ত যত্ন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বড় গোলে পড়িতে হয়, অন্যকেও গোলে ফেলিতে হয়, এইজন্য এক একবার ইতস্ততঃ করি। সাধুসঙ্গ আমার অল্প, এই জন্য তাঁহাদের ভাষায় আমার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে নাই। যাঁহাদের সাধুসঙ্গ যথেষ্ট অথবা যাঁহারা অভিধান পড়িয়া নিজে সাধু হইয়াছেন, তাঁহারাও একটু একটু গোলে পড়েন। এই যে, এই মাত্র মধুক্রম লিখিত হইল, অনেক সাধু ইহার অর্থে অশোকবৃক্ষ বুঝিবেন। অনেক সাধু জীবন্তীবৃক্ষ বুঝিবেন। আবার, যে সকল সাধুর গৃহে অভিধান নাই, তাঁহারা হয়ত কিছুই বুঝিবেন না। সাধুদের গৃহিনীরা নাকি সাধুভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁহারা বলেন, সাধুভাষা অতি অসম্পন্ন, এই ভাষায় গালি চলে না,

ঝগড়া চলে না, মনের অনেক কথা বলা হয় না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বলুন, সাধুভাষা গোল্লায় যাক।'

এখানে এই উদ্ধৃতি দুটিতে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় ভাষার যে সরলতা এবং যে অল্প ব্যঙ্গ বা কৌতুক, বিশেষ করে স্ত্রীজাতি নিয়ে—লক্ষ্য করা গেল, তাতে আমার ধারণা হয়েছে, 'ভ্রমরে' প্রকাশিত 'স্ত্রীজাতি বন্দনা' রচনাটি হয়ত সঞ্জীবচন্দ্রেরই লেখা।

এই পত্রিকায় 'ভূতের সংসার' নামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এতেও লেখকের নাম নেই। এটিও মূলতঃ ঐ 'স্ত্রীজাতি' নিয়েই লেখা। এখানে ঐ 'স্ত্রীজাতি বন্দনা'র সঙ্গে 'ভূতের সংসার'ও উদ্ধৃত করছি।

ঐ পত্রিকায় তখন কি ধরণের লেখা প্রকাশিত হ'ত, অন্তত তারও কিছুটা নমুনা হিসাবে, ঐ লেখা দুটি এখানে উদ্ধৃত করছি। অবশ্য এই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন ধরণের রচনার মধ্যে এটা এক ধরণের অর্থাৎ ঐ 'স্ত্রীজাতি' নিয়ে লেখার নমুনা মাত্র। যাই হোক, লেখা দুটি এই—

স্ত্রীজাতি বন্দনা

হে দেবি। এ বঙ্গভূমে তুমিই একা জাগ্রত; অতএব তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি সর্বব্যাপিনী! কেন না সকল ঘরে আছ। তুমি অন্নপূর্ণা! কেন না তুমি আপনার উদর অন্নে পূর্ণ করিয়া থাক। তুমি অভয়া, কেন না তুমি পতির বাবাকেও ভয় কর না।

তুমি দিগম্বরী। যে অবধি শান্তিপুরে ধূতি উঠিয়াছে।

তুমি রক্ষাকালী। কেন না পতির পরমায়ু তুমি বাম করে রক্ষা করিতেছ।

তুমি মহামায়া। কেন না জ্ঞানী কি অজ্ঞানী তুমি সকলকে জাগাইয়াছ।

তুমি পুরুষের চক্ষু, তুমিই কর্ণ, তুমিই জ্ঞান। তাহারা আপন চক্ষে যাহা দেখে, তাহা মিথ্যা; আপন কর্ণে যাহা শুনে তাহা বৃথা।

এ সংসারে তুমিই কর্ণধার! কেন না তুমি সকলের কর্ণ ধরিয়া চালাইতেছ।

তোমার নিমিত্ত সকলে মোট বহিতেছে; তোমারই নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেব ভিক্ষার ঝুলি বহিয়াছেন।

হে দেবি! তুমি স্পষ্ট করিয়া বল তোমার বীজমন্ত্র ওঁকার না অলঙ্কার?

হে সুরুচি! তুমি স্বরূপ বল, মৎস্যের 'নেজা' ভালবাস কি প্রতিবাসীর 'মুড়া' ভালবাস?

হে দেবি! তুমি মনে করিলে সকলের মুণ্ডু ঘুরাইতে পার—কথায়। পৃথিবী ভাসাইয়া দিতে পার—রোদনে! পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাইতে পার—কলহে।

ভূতের সংসার

প্রায় শতাধিক বৎসর হইল, এক মহারণ্যে ভৈরব নামে এক ভয়ঙ্কর ভূত বহুকালাবধি একাকী বাস করিত। কিন্তু একাকী বাস করা ভূতেরও অসাধ্য। অতএব ভৈরব সঙ্গী অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা করিল। বনের মধ্যে আর ভূত ছিল না; এ-গাছ ও-গাছ করিয়া অনেক বেড়াইল, কোথাও সঙ্গী পাইল না। শেষ গ্রামাভিমুখে চলিল। মনুষ্য মধ্যে অনেক ভূত আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভৈরব যে সেই ভরসাতেই গ্রামাভিমুখে যাইতে ছিল এমত নহে। তবে বনে ভূত নাই, গ্রামে থাকিতে পারে, এই মনে করিয়া যাইতে ছিল। নিকটবর্তী গ্রামে আসিয়া ভৈরব ভাবিল, সঙ্গী অপেক্ষা সঙ্গিনী আরও সুখের। বিবাহের কৌশলে মনুষ্যেরা সুন্দরী সঙ্গিনীর সঙ্গে কত সুখে কালাতিপাত করিতেছে। অতএব বিবাহ করাই স্থির।

কতক দূর যাইতে যাইতে ভৈরব আবার মনে করিল, প্রেতিনী বিবাহ না করিয়া মনুষ্য-কন্যা বিবাহ করা আরও ভাল। ইহারা পাকপটু, বিশেষতঃ স্বামীকে না দিয়া আপনারা খায় না।

এই ভাবিয়া ভূত বরদেখা দিবার জন্য সন্ধ্যার সময় এক গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইল। এই সময় গৃহস্থের এক যুবতী কন্যা রন্ধনশালা হইতে দীপ-হস্তে শয়নঘরে যাইতে ছিল। দীপালোক গৌরাঙ্গীর গণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, অধর প্রান্তে ঈষৎ হাসিও ছিল, তদুপলক্ষে দুই একটি দন্তাগ্র মুক্তার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। ভূত দেখিল, দন্তগুলি ভাল নহে, বড় ক্ষুদ্র, বর্ণও বড় গৌর, তথাপি ইহাকে লইয়া গৃহকার্য চলিতে পারে। অতএব ইতস্তত না করিয়া ভৈরব বরদেখা দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল। যুবতী

তাহাকে দেখিবা মাত্র চীৎকার করিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছা গেল। ভূত কিছু অপ্রতিভ হইল, কিন্তু নিরাশ হইল না। ভাবিল, আমার রূপ দেখিয়া যুবতী মোহিত হইয়া থাকিবে। ভূতের মধ্যে ভৈরবের রূপ কিছু প্রশংসার ছিল। ভৈরব তাহা নিজে জানিত। অতএব ভাবিল, যুবতী নিশ্চয়ই মোহিত হইয়াছে। কিন্তু যখন আত্মীয়েরা আসিয়া সকলে চীৎকার করিতে লাগিল, আর যুবতী উঠিয়া বিবাহের কোন কথা উত্থাপন করিল না, তখন ভৈরব হতাশ হইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় ভাবিতে লাগিল, প্রথমেই ব্যাঘাত, এ বড় ভাল লক্ষণ নহে। তথাপি কাপুরুষের ন্যায় উদ্যম ভঙ্গ করা হইবে না। অন্যত্র চেষ্টা দেখা যাউক। এই ভাবিয়া ভূত আর এক গৃহস্থের কানাচে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাকশালাতে স্ত্রীকণ্ঠ শুনিয়া ভৈরব সেই ঘরের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, যে কণ্ঠ শুনা গেল, তাহা স্ত্রীকণ্ঠ নিশ্চয়; কিন্তু বোধ হয় সুন্দরীর নহে, কেন না স্বর সানুনাসিক নহে। তথাপি একবার দেখি—এই ভাবিয়া ভূত গবাক্ষে উঁকি মারিতে গেল। এই সময় গৃহস্থকন্যা তপ্ত ফেন ফেলিতে উঠিয়াছিল। ভৈরবের আগমন বার্তা না জানিয়া গবাক্ষে ফেন ঢালিয়া দিল। তপ্ত ফেন ভৈরবের মুখে চোখে পড়িল। ভৈরব বিকট চীৎকার করিয়া পলাইল। পরে জ্বালা থামিলে বিবেচনা করিল যে, মানবীরা প্রেমিকা নহে। তপ্ত ফেন দিয়া তাহারা প্রেম সম্ভাষণ করে। আমি বিবাহ করিব, এই মাত্র ইচ্ছা করিয়া ছিলাম, তাহাতেই আমাকে জ্বলিতে হইল; না জানি বিবাহ করিলে কি জ্বালাতন হইতে হইত। অতএব মানবী বিবাহ করা হইবে না। স্বজাতি কন্যা বিবাহ ভাল। শেষ অনেক চেষ্টা করিতে করিতে ভৈরবের অদৃষ্টে এক প্রেতিনী জুটিল।

বিবাহের রাত্রে অস্থি, মাংস, ক্লেদ ও অন্যান্য উপকরণ ভৈরব অনেক সংগ্রহ করিয়া ছিল। প্রেতিনী তাহা সমুদয় একা উদরস্থ করিল। ক্ষুধার্থি ভৈরব কোন আপত্তি না করিয়া খালি পেটে বাসরসজ্জা করিয়া প্রেতিনীর সঙ্গে গাছে বসিয়া পরমসুখে পা দুলাইতে লাগিল। এক এক বার প্রিয়ার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নিধুবাবুর টপ্পা গাইতে লাগিল। সুখের আর সীমা রহিল না। প্রেমালাপের কথা আর কি বলিব, এত প্রেমালাপ বাঙ্গলার কোন নাটকেও নাই, কোন খাপ্‌রেলের ঘরেও নাই। শেষ রাত্রি প্রভাত হইল।

ক্লান্ত হইয়া দিবসে দুই জনে নিদ্রা গেল। পরে সন্ধ্যা হইলে দুই জনে

আহার অন্বেষণে চলিল। ভৈরব যাহা পায়, তাহাই প্রেতিনী লইয়া আহার করে, ক্ষুধার্ত ভৈরব স্ত্রীকে আহার করাইয়া চরিতার্থ হইতে লাগিল। কিন্তু ভৈরবের উদর জ্বলিতে ছিল, শান্ত করিবার জন্য একবার সভয়ে ভৈরব এক খণ্ড অস্থি আপন মুখে ফেলিয়া দিল। প্রেতিনী তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ভৈরবের মুখে মুখ দিয়া সাদরে অস্থি লইল। আহ্লাদে ভৈরব গলিয়া গেল। এইরূপে দুই তিন দিন গেল। ভৈরব অনাহারে, কিন্তু প্রেমালাপে কাটাইল। শেষ আর তাহার দিন কাটে না। অগত্যা ভৈরব পলাইতে মনস্থ করিল। কিন্তু পলান ভাল হয় না, তাহা প্রেমিকের কার্য নহে। অথচ প্রাণ ধারণও হয় না। শীর্ণ ভৈরব কিংকর্তব্য ভাবিতেছে, এমত সময় প্রণয়িনী আদর করিয়া বলিল—আমার শঙ্খ পরিতে সাধ হইয়াছে।

ভৈরব বিষম সঙ্কটে পড়িল। দিব, দিব—বলিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রিয়া তাহাতে ভুলিল না, রীতিমত মান করিল, কিন্তু সে মান আহার সম্বন্ধে নহে। মানভরে দুই একবার চড় চাপড় দিল। ভৈরব ভাবিল, এই পলাইবার সময়। পলাইতে গিয়া ভৈরব ধরা পড়িল। তখন রীতিমত প্রহার আরম্ভ হইল। ভৈরবের প্রাণ যায়, রক্ষা নাই। মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল। কত গাছ ভাঙ্গিল, ঘর ভাঙ্গিল, পাড়ার লোক জাগিল, ছেলে কাঁদিল। তথাপি প্রেতিনী ছুটিতেছে আর মারিতেছে। শেষ এক শ্মশানে দগ্ধ কাষ্ঠাগ্রে অল্প ক্লেদ লাগিয়া রহিয়াছে দেখিয়া প্রেতিনী তাহা খুঁটিতে গেল। ভূত সেই সাবকাশে পলাইল।

বহুদূরে গিয়া এক বটবৃক্ষ মূলে শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত ভৈরব বসিল। অন্ধকারে তথায় আর একজন শয়ন করিয়া আছে দেখিয়া আবার পলাইবার উপক্রম করিতে ছিল, এমত সময় অর্ধনিদ্রিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—কে তুমি?

ভৈরব অস্ফুট স্বরে বলিল—ব্রহ্মচারী।

অপরিচিত ব্যক্তি উঠিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, আমায় দয়া করুন, আমি বড় দুঃখী। কিসে অর্থ উপার্জন হয়, আমায় বলিয়া দিন। আমি অর্থের নিমিত্ত পরিবারের দ্বারা গৃহ-বহিষ্কৃত হইয়াছি। আমার স্ত্রী বড় মুখরা।

ভৈরব বলিল—আমারও সেই দশা। আমিও স্ত্রীর নিমিত্ত পলাইয়া আসিয়াছি।—এই বলিয়া ভৈরব আপনার সমুদয় পরিচয় দিয়া বলিল—আমার

পরামর্শ শুন। নিকটবর্তী গ্রামে আমি যাহাদিগকে পাইব, তুমি ভিন্ন আর কোন রোজা আসিলে আমি তাহাকে ত্যাগ করিব না তোমার যথেষ্ট অর্থ উপার্জন হইবে। সেই অর্থের তুমি অর্ধেক ও আমি অর্ধেক লইব। আমি সেই অর্ধেক লইয়া মানবী বিবাহ করিব। অর্থ থাকিলে মানবীরা যত্ন করে, আমি তাহা ভাল জানিয়াছি।

অপরিচিত ব্যক্তি এই কথায় সম্মত হইল। পর দিবস হইতে উভয়ে সখ্যভাবে কার্যারম্ভ করিল। ধনবান মাত্রেরই ঘরে স্ত্রীলোকদের ভূতে পাইতে লাগিল। কোন ওঝা ভাল করিতে পারে না, হাহাকার পড়িয়া গেল। শেষ ভূতের সখা ওঝা হইয়া আসিল। নূতন ওঝা যাহার চিকিৎসা করে সেই নিস্তার পায়, নতুবা আর কাহারও অব্যাহতি নাই। ওঝার পসার বাড়িল, সেই সঙ্গে তাহার দরও বাড়িল, অর্থ যথেষ্ট উপার্জন হইতে লাগিল। যতই অর্থ বাড়িতে লাগিল, ওঝার ততই লোভও বাড়িতে লাগিল। শেষ মধ্যে মধ্যে ভৈরবকে টাকার ভাগ ফাঁকি দিতে লাগিল। ভৈরব তাহা জানিতে পারিয়া ওঝাকে একদিন বলিল,—অদ্য হইতে তোমার উপার্জনের শেষ হইল। তুমি আর ঝাড়াইতে যাইও না। গেলেও কিছু করিতে পারিবে না।

সেই দিনেই ওঝা সম্বাদ পাইল যে, নিকটস্থ কোন বিশেষ ধনাঢ্যের কন্যাকে ভূতে পাইয়াছে। ধনী ওঝাকে লইতে আসিলেন। কিন্তু যাওয়া বৃথা মনে করিয়া ওঝা অসঙ্গত পারিতোষিক চাহিল। ধনী তাহাই দিতে স্বীকৃত হওয়ায় ওঝা বড় সঙ্কটে পড়িল। অগত্যা লোভ পরবশ হইয়া ওঝা চলিল। রোগী ওঝাকে দেখিবামাত্রই চিৎকার করিয়া গালি দিয়া উঠিল—জুয়াচোর, মিথ্যাবাদী, অধর্মী—প্রভৃতি কত কথাই বলিল। দর্শকেরা ইহার কিছুই মর্মগ্রহণ করিতে পারিল না। ওঝা তখন সকলকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া একাকী বসিয়া ভূতকে অনেক মিনতি করিতে লাগিল। ভূত তাহা কিছুই শুনিল না। ওঝা নিরুপায় হইয়া ক্ষণেক বসিয়া রহিল। শেষে মাথা নাড়িয়া দাঁড়াইল। ভূত জিজ্ঞাসা করিল—কোথা চলিলে?

ওঝা বলিল—বড় যাই নাই, এখনই আসিতেছি। তোমার প্রেতিনী আসিয়াছে, তাহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।

ভূত শিহরিয়া বলিল—রক্ষা কর, তুমি আমার বন্ধু। রক্ষা কর, আমায় রক্ষা কর। আমার সন্ধান দিও না। আমি এখনই পলাইতেছি। তোমার পায়ে ধরি, আমার কোন কথা কাহারেও বলিও না, এই আমি চলিলাম।

ভূত পলাইল। আর সে অঞ্চলে দেখা দিল না পত্নী হউক আর প্রেতিনীই হউক, শাসন উভয়েরই সমান।

এবার আর কোনরূপ অনুমান নয়। সঞ্জীবচন্দ্রের নাম সহই প্রকাশিত তাঁর একটি অজ্ঞাত রচনার কথা এখন বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ঘরজামাই' করে মেয়ে-জামাইকে নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে এই রাখালচন্দ্রকে সম্পাদক করে 'প্রচার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। প্রচারে অনেকের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রও লিখতেন। সেই সময় প্রচারে সঞ্জীবচন্দ্রের 'পরকাল' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের শেষে লেখক হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্রের নামও যথারীতি ছাপা হয়েছিল। তবুও এ পর্যন্ত বিভিন্ন সম্পাদক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সঞ্জীবচন্দ্রের যত বার রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির কোনটিতেই এই রচনাটি স্থান পায় নি। সঞ্জীবচন্দ্রের সেই 'পরকাল' প্রবন্ধটি এখন এখানে উদ্ধৃত করছি—

পরকাল

পরকালের কথা সকলেরই পক্ষে আবশ্যক। সকলেই এ বিষয়ে একটা না একটা স্থির করিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধা শাকওয়ালী, মাছওয়ালী যাহাকেই ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর—সে অভ্রান্ত ভাবে উত্তর দিবে যে মৃত্যুর পর বৈতরণী নদী পার হইয়া যমের বাটী যাইতে হয়। তথায় বিচার হইয়া গেলে দণ্ড লইতে হয়—অথবা স্বর্গে যাইতে হয়। এ বিশ্বাস পৌরাণিক। দার্শনিক মত স্বতন্ত্র। তাহা সত্য কি মিথ্যা দার্শনিকেরাই জানিতেন। পরলোকের কথা যিনি যাহাই বলুন, সমুদয় অনুভব মূলক। তবে যে আমরা এ বিষয় কিছু বলিতে সাহস করি, তাহা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু যাঁহারা বাল্য-সংস্কার ছাড়িয়া নিজে নিজে বিচার করিয়া পরকাল সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস দৃঢ় করিতে চাহেন, তাঁহাদের বলি—আমাদের কথা সম্বন্ধে যুক্তি ও প্রমাণ গ্রহণ করুন। প্রমাণ আমাদের নিকট লইতে হইবে না। তাঁহারা নিজের প্রমাণ নিজে অনুসন্ধান করুন। তারপর বুঝিবেন, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে।

মাতৃগর্ভে আমাদের দেহ গঠিত হয়, তখন আমাদের মন বুদ্ধি এ সকল কিছুই হয় না, কেবল মাত্র দেহটি হয়। মাতৃগর্ভের কার্য দেহগঠন, তাহা সমাধা হইলে, দেহ বহিষ্কৃত বা ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার পর দেহের মধ্যে মনুষ্যত্ব সঞ্চার হইতে থাকে। দেহ দ্বিতীয় গর্ভ। তথায় সেই মনুষ্যত্ব যে দেহে বা যে অবস্থায় যতটুকু সম্ভব তাহা প্রাপ্ত হইয়া বহিষ্কৃত হয়—সেই দ্বিতীয় জন্মকে লোকে বলে মৃত্যু। মৃত ব্যক্তিই দ্বিজ। প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভ হইতে—দ্বিতীয় জন্ম দেহ হইতে।

যাঁহারা বলেন, মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না, সকলই ফুরায়—তাঁহারা এ দ্বিজত্ব স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে পান না বলিয়া তাঁহাদের এই ভ্রান্তি। মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে না পাওয়া যাক—তাহাদের কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। সকলে সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, এইজন্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অনেক ঘটনা তাঁহারা দৈবাৎ ঘটিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হন—কিন্তু ঘটনাগুলি বাছিয়া, বুঝিয়া দেখিতে পারিলে—তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, দেহমুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ঘটিয়াছে।

মৃত্যুর পর মনুষ্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তৎপূর্বে মনুষ্য কেবল গঠিত হইতে থাকে মাত্র। আমরা বলিয়াছি—মাতৃগর্ভে দেহ মাত্র হয়, ভূমিষ্ঠ হইবার পর দেহের ভিতর মনুষ্য গঠিত হইতে থাকে। তখন একটি দুইটি করিয়া ক্রমে বৃত্তিগুলির উদ্ভাবন আরম্ভ হয়। প্রথমের অধিকাংশ বৃত্তিগুলি দেহরক্ষার্থ, দেহ গেলে সেগুলি আর থাকে না—যথা রাগাদি। কতকগুলি সদ্বৃত্তি দেহ সম্বন্ধে নহে, সেগুলি মৃত্যুর পর থাকিয়া যায়। সেইগুলি লইয়াই মানুষ মানুষ। তাহা না জন্মিলে মনুষ্য অসম্পূর্ণ হয়—নষ্ট হইয়া যায়—মৃত্যুর পর আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না। যেমন, মাতৃগর্ভে দেহ গঠন হইতে হইতে কোন অভাব বা অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত গর্ভস্রাবে দেহ নষ্ট হইয়া যায়। এ সংসারে সে দেহের আর অস্তিত্ব থাকে না। সেইরূপ, ভূমিষ্ঠ দেহে নানা বৃত্তির স্থানে যদি কেবল দৈহিক বৃত্তিই উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে দেহ নাশের সঙ্গে সে বৃত্তিগুলি যায়, পরকালে আর সে মৃত ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে না। এই জন্য শিশু ও বালক প্রভৃতির পরকাল নাই। তাহাদের দৈহিক বৃত্তি মাত্র হইয়াছিল—দেহের সঙ্গে সেগুলি গেল, বাকি কিছুই থাকিল না। সেইরূপ আবার যে সকল বৃদ্ধের কেবল কাম ক্রোধাদি দৈহিক বৃত্তিমাত্র জন্মিয়াছে, আর কোন সদ্বৃত্তি বিকাশিত বা অঙ্কুরিত হয় নাই, তাহাদেরও সেই দশা, তাহাদেরও পরকাল নাই।

সকল দেশে ধর্মবেত্তারা সদ্বৃত্তির আলোচনার যে অনুরোধ করিয়া থাকেন, সদ্বৃত্তি থাকিলেই পরকাল ভাল হয় যে বলেন, তাহার হেতু এই। ধর্মোপদেষ্টার উপদেশ এইরূপে ব্যাখ্যা করিলে একটা কথা মনে হয় যে, সদ্বৃত্তিই আমাদের দীর্ঘায়ুর মূল। সদ্বৃত্তি না থাকিলে দেহ নাশের সঙ্গে আমরা নষ্ট হই, সেই দেহনাশই আমাদের যথার্থ মৃত্যু। আর সদ্বৃত্তি থাকিলে আমরা দীর্ঘায়ু হই, দেশনাশের পরেও জীবিত থাকি।—(প্রচার, মাঘ ১২৯২)।

এই প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা 'প্রচার'-সম্পাদক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠিও পাওয়া গেছে। সেই চিঠিটি এই—

শ্রীচরণেষু,

বড়বাবু ভাল আছেন। আপনি উপরে উঠিতে পারেন কি? আজিও রাত্রে বেদনা অধিক বোধ হয় কি?

আপনার লিখিত 'পরকাল' দৈনিক প্রভৃতি কাগজে উদ্ধৃত করিয়াছে। অনেকের মুখে উহার কথা শুনিয়াছি। সকলেই পড়িয়া খুশী হইয়াছে; কিন্তু বড় ছোট বলিয়া আক্ষেপও করিয়াছে। আমি বলিয়াছি ও সম্বন্ধে আরও লিখিবেন। সম্প্রতি উহার এক প্রতিবাদ পাইয়াছি। আপনি দৃষ্টি করিবেন বলিয়া পাঠাইলাম।

আশা করি, যদি সুবিধা হয় জ্যোতিশ ভায়ার দ্বারা লিখাইয়া প্রবন্ধটি শেষ করিয়া পাঠাইবেন। ১লা চৈত্র ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা প্রচার বাহির হইবে।

আমি যে পরীক্ষা দিয়াছিলাম, উহাতে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। কি করিব? এখানকার সমস্ত মঙ্গল।

সেবক শ্রীরাখালচন্দ্র

চিঠির বড়বাবু হলেন সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণবাবু। শ্যামাচরণবাবু গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় তাঁর চিকিৎসার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে কলকাতায় নিজের বাসায় আনিয়ে ছিলেন। এই সময় কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাসা ছিল ২নং ভবানীচরণ দত্ত লেনে। বঙ্কিমচন্দ্র কর্মস্থলে থাকলেও এখানে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জ্যেষ্ঠ জামাতা থাকতেন। এই ঠিকানা থেকেই 'প্রচার' প্রকাশিত হ'ত।

সঞ্জীবচন্দ্র অসুস্থতার জন্য এই প্রবন্ধ আর শেষ করেন নি।

'পরকাল' প্রবন্ধটির ন্যায় 'প্রচারে' প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্রের আরও অনেকগুলি রচনা আবিষ্কার করেছি। আর সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' থেকেও লেখার সঙ্গে লেখকের নাম না থাকলেও, নানা সূত্রে তাঁর কয়েকটি অজ্ঞাত রচনা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি।

এছাড়া ভ্রমরের ও বঙ্গদর্শনের কিছু প্রবন্ধকে নানা যুক্তি ও তথ্য বলে সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা বলে অনুমান করেছি।

আবিষ্কৃত ঐ সঞ্জীব-রচনাগুলি সবই এবং অনুমিত রচনাগুলির কয়েকটি আবিষ্কারের সূত্র, অনুমানের স্বপক্ষে যুক্তি, প্রসঙ্গ-কথা ইত্যাদি সহ এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' দিয়েছি।

সঞ্জীবচন্দ্রের একটি রচনার হদিস্ পেয়েও সেটি উদ্ধার করতে পারলাম না। সঞ্জীবচন্দ্রের সেই রচনাটি হ'ল—আইন প্রকাশিকা।

সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখে তাঁর 'দিনলিপি'তে লিখে গেছেন—

--On the suggestion of Kapali Prosanna drew out a notification for আইন প্রকাশিকা। This day I saw its proof.

কপালীপ্রসন্ন বা কপালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্রের বড়দা শ্যামাচরণের জ্যেষ্ঠ জামাতা। ইনি কর্মজীবনে ঐ সময় সাব জজ ছিলেন।

ডায়েরির ঐ লেখায় দেখা যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'আইন প্রকাশিকা'য় কপালীপ্রসন্নর কথায় আইনের আর একটি বিষয় যুক্ত করেছিলেন।

ডায়েরির লেখা পড়ে মনে হয়, 'আইন প্রকাশিকা' ছোট একটা প্রবন্ধ ছিল না। এটা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা একটা পুস্তক বা পুস্তিকাই ছিল।

ডায়েরির ঐ ১৮৮১র এপ্রিল থেকে 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকা খুঁজে দেখেছি, কোথাও আইন প্রকাশিকা নামে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। তাই আইন প্রকাশিকা একটি বই-ই ছিল বলে আমার ধারণা। আর সঞ্জীবচন্দ্র যখন লিখেছেন, তিনি প্রুফ দেখেছিলেন, তখন এই বই ছেপে প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অনেক খোঁজ করেও এই 'আইন প্রকাশিকা' বইয়ের কোথাও কোন হদিসই পাচ্ছি না।

সঞ্জীবচন্দ্র বাংলা দেশের প্রজাদের সুখ-সুবিধার কথা নিয়ে যেমন Bengal Ryots—their rights and liabilities নামে ইংরাজিতে একটা বিখ্যাত বই লিখেছিলেন, তেমনি বাংলাতেও মনে হয়, এই বইটা লিখেছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় আমরা দেখি, তিনি সহজ সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্যকে পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই 'আইন প্রকাশিকা' বইটি পেলেও দেখা যেত, তিনি হয়তো আইনের জটিল কথাগুলিকে সহজ করে লিখে গেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র বি এল পাস না করলেও, তিনি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শেষ পরীক্ষার ফি জমা দিয়েছিলেন তার রসিদটি দেখেছি। জন-হিতৈষী সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর এই আইনের অধীত বিদ্যাকেই লোকের প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রকাশিকায় লিখে দেশবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে লিখেছেন—সঞ্জীবচন্দ্র কৈশোরে 'শশধর' পত্রিকায় দু একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

এই শশধর পত্রিকা কোথাও না পাওয়ায়, সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ লেখাগুলিরও কোন হদিস করা গেল না। 'শশধর' বা 'সংবাদ শশধর' একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। এই কাগজ প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হ'ত। ১২৫৯ সালের ২৪শে আষাঢ় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি অল্প দিন চলেছিল। কারণ, ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' এই কাগজ সম্বন্ধে একটি সংবাদ ছিল এইরূপ—'গত বৎসর কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে। 'শশধর নামে শ্রীরামপুরে যে এক বারোইয়ারী পত্র হয়, সেই শশধর একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইলেন।'

সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবিতকালে এবং মৃত্যুরও কিছুকাল পরে তাঁর যে সব রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিলাম—

১।	Bengal Ryots—their rights and liablities (ইংরাজি প্রবন্ধ পুস্তক)—	১৮৬৪	খ্রীষ্টাব্দে	প্রকাশিত
২।	যাত্রা সমালোচনা (প্রবন্ধ)—	১৮৭৫	"	"
৩।	রামেশ্বরের অদৃষ্ট (বড় গল্প)--	১৮৭৭	"	"
৪।	কণ্ঠমালা (উপন্যাস)—	১৮৭৭	"	"
৫।	সংকার (প্রবন্ধ)—	১৮৮১	"	"
৬।	বাল্য-বিবাহ (প্রবন্ধ)—	১৮৮২	"	"
৭।	জাল প্রতাপচাঁদ (ঐতিহাসিক কাহিনী)—	১৮৮৩	"	"
৮।	মাধবীলতা (উপন্যাস)—	১৮৮৫	"	"
৯।	দামিনী (গল্প), পালামৌ (ভ্রমণ কাহিনী)—	১৮৯৩	"	"

এবার এই বইগুলি সম্বন্ধে কিছু বলছি—

Bengal Ryots বইটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে বিস্তৃতভাবে বলে গেছেন।

বইটি বিক্রি হ'ত 8 Tank-Square এর D' Rozario & Co, নামক একটি পুস্তক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে। এই ট্যাঙ্ক স্কয়ারেরই পরে নাম হয় ডালহৌসী স্কয়ার (বর্তমান নাম বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ)।

যাত্রা সমালোচনা—

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' ১২৭৯ সালের পৌষ সংখ্যায় এবং ১২৮০ সালের কার্তিক সংখ্যায় 'যাত্রা' নামে সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধটির শেষে 'ক্রমশঃ' না থাকলেও দ্বিতীয় প্রবন্ধটির শেষে 'ক্রমশঃ' ছিল। আর এই দুটার কোনটার সঙ্গেই লেখকের নাম ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে, এমন কি সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনেও 'যাত্রা' নামে আর কোন পৃথক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি। তবে সঞ্জীবচন্দ্রের 'ভ্রমর' পত্রিকায় ১২৮২ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'যাত্রা' নামে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধের সঙ্গেও লেখকের নাম ছিল না।

এই তিনটি 'যাত্রা' প্রবন্ধের কোনটার সঙ্গেই লেখকের নাম না থাকলেও, এই তিনটি প্রবন্ধই সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা। তার কারণ, সঞ্জীবচন্দ্রের জীবিত-কালেই 'যাত্রা সমালোচনা' নামে যে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি এই তিনটি প্রবন্ধেরই একত্র সংকলন।

'যাত্রা সমালোচনা' বইটিতেও সঞ্জীবচন্দ্রের নাম ছিল না, লেখকের নামের বদলে ছিল—কাঁটালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এই হারাণচন্দ্র ছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রেসের তখনকার ম্যানেজার।

'যাত্রা' সঞ্জীবচন্দ্রের একটি সুন্দর রচনা। আমাদের দেশের সেকালের যাত্রা অভিনয়ের সমালোচনা করে সঞ্জীবচন্দ্রের আগে বোধ করি আর কেউই এমনভাবে প্রবন্ধ লেখেন নি।

সেকালের যাত্রার নানা ত্রুটি বিচ্যুতি, কুরুচি ও নোংরামিগুলোকে তিনি তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে দেশবাসীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র দেশের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য যে কিরূপ চিন্তা করতেন, তার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর অন্যান্য অনেক প্রবন্ধের ন্যায় এই 'যাত্রা' প্রবন্ধটিও একটি।

তাছাড়া ভাব, ভাষা, তথ্য, বক্তব্য, ব্যঙ্গ, সরসতা, উপমা, উদাহরণ উপ-দেশ প্রভৃতি সব দিক থেকেই এটি একটি নিটোল রচনা। এখানে ঐ 'যাত্রা' প্রবন্ধ থেকে সামান্য একটু উদ্ধৃত করছি—

'...জন সাধারণ আদি রসপ্রিয় হইলেও, সর্বদেশে সর্বকালে কবিগণ তাহার সহিত কৌশলক্রমে করুণ রস মিশ্রিত করিয়া কাব্যাদির মনোহারিত্ব বিধান করেন। যে কৌশলের দ্বারা উহা সম্পন্ন হয়, সচরাচর তাহাকে বিরহ বা বিচ্ছেদ বলে।

বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে বিচ্ছেদ অতি অল্প। সুন্দরের আসিতে যেটুকু বিলম্ব হয়, সেইটুকু বিদ্যার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা। বিলম্ব দেখিলে বিদ্যা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া থাকেন; নাচিয়া তদ্বিষয়ক দুই একটি গীত গাহিয়া থাকেন; অথবা অধীরা

হইলে হীরা মালিনীর সহিত ঠাট্টা রহস্য করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। বিদ্যার বিচ্ছেদ এইরূপ।...

সামান্য বিচ্ছেদ সম্বন্ধে এইরূপ। আবার যখন যাবজ্জীবনের মত বিচ্ছেদ সম্ভাবনা হইয়াছিল, অর্থাৎ যখন মস্তক ছেদ করিবার নিমিত্ত সুন্দরকে মশানে লইয়া চলিল, বিদ্যা তখন উঠিয়া কঙ্কাল দোলাইয়া নয়ন ঠারিয়া নাচিতে নাচিতে আড় খেমটায় শোক করিতে থাকে। নৃত্য দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীতে রসের স্রোত বহিতে থাকে, অমনি বাহবার ঘটা পড়িয়া যায়। রসিক শ্রোতা-দিগের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। বিদ্যার কঙ্কাল কেমন দুলিতেছে।... কেমন নয়ন, হৃদয় ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাচাইতেছে, ইহা দেখিয়া দুর্ভাগা সুন্দরের বিষাদ শ্রোতারা একেবারে ভুলিয়া যায়।

এক্ষণকার রুচির এই এক পরিচয়।'

এখানে 'কঙ্কাল' যে, কেঁকাল বা কোমর; তা নিশ্চয়ই পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পেরেছেন।

সেকালে আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে বহুল অভিনীত 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার সামান্য একটা দৃশ্যের সমালোচনা করেই সঞ্জীবচন্দ্র এই কথাগুলি লিখেছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'যাত্রা' বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি থেকে (যা ১২৮০ সালের কার্তিক সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল) আর কিছুটা তুলে দেখাচ্ছি।

'এক্ষণকার যাত্রার নৃত্যই প্রবল, সকলেই নৃত্য করে। কি মেহতর, কি ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা সকলেই নৃত্য করে। কৃষ্ণ নৃত্য করেন, রাধা নৃত্য করেন, রাবণ নৃত্য করেন, সীতা নৃত্য করেন, কৈকেয়ী নৃত্য করেন, বোধ হয় বৃদ্ধ রাজা দশরথও নৃত্য করিতেন, কিন্তু তিনি প্রায় সকল যাত্রার দলে 'বিহালাওয়ালা', নৃত্য করিতে গেলে বিহালা বন্ধ হয়, নতুবা তাহার ত্রুটি ছিল না।...

যে কোন সমাজেই হউক, নৃত্য বলিলে পদদ্বয়ের সঞ্চালন জনিত দেহের মনোহর আন্দোলন বুঝায়; কিন্তু বঙ্গসমাজে কেবল দেহের মধ্য ভাগের সঞ্চালন জনিত দেহের যে ঘৃণিত আন্দোলন তাহাকেই নৃত্য বলে। কি লজ্জা-কর নৃত্য! বাঙ্গালী সভ্য হইয়াছে, এইজন্য এই নৃত্য আপনি দেখে, কন্যাকে মাতাকে দেখায়, বালক-বালিকাকে দেখায়, আবার বাহবা দেয়।...

'খেমটা নাচ'! চমৎকার কথা! গ্রাম্য বাবুদিগের পক্ষে মৃত সঞ্জীবনী

মন্ত্র। বার ইয়ারীর পাণ্ডাদিগের জীবন সর্বস্ব। যে পাণ্ডা নরক হইতে নিজ গ্রামে নর্তকী আনিলেন, তিনি গ্রামের ভগীরথ জন্মিয়াছেন। এই গ্রাম্য ভগীরথদিগের জন্ম সার্থক। তাঁহাদের অনুকম্পায় গ্রামের অনেকেই চরিতার্থ হইলেন। চরিতার্থ হউন, কিন্তু অনেক ছেলেও ডুবিল।'

দেশ ও সমাজ-হিতৈষী সঞ্জীবচন্দ্রের তীব্র অথচ সরস রচনার এটা আর একটা নমুনা।

এবার একটা অন্য কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা বিভাগের প্রধান ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় সঞ্জীবচন্দ্রের এই 'যাত্রা' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'যাত্রা' ও 'বৃত্রসংহার' এর সমালোচনা দুটি সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্য-বিশ্লেষণাত্মক বিচার বুদ্ধির প্রমাণ বহন করেছে। যাত্রা নিয়ে আলোচনার সূত্র-লাভ করেন, একখানি ইংরাজি গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে। ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যাত্রার উপরে (প্রধানতঃ কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাগুলির সমালোচনা) গবেষণা করে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ, ডি, উপাধি লাভ করেন। তাঁর উক্ত গবেষণা ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে The yatras or the popular dramas of Bengal নামে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। সেটি সমালোচনার জন্য বঙ্গদর্শনে প্রেরিত হলে সঞ্জীবচন্দ্র সমালোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণযাত্রা (কালীয় দমন) ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সম্বন্ধে বেশ তথ্য বহুল আলোচনা করেন। আলোচনাটি তথ্য সমৃদ্ধ হলেও নীরস নয়।'

অসিতবাবুর এই লেখার 'বৃত্রসংহারের সমালোচনা' অর্থাৎ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' কাব্যের সমালোচনার কথা পরে আলোচনা করব। তিনি যাত্রা সম্বন্ধে যা বলেছেন, সেই নিয়েই এখন কয়েকটা কথা বলছি—

অসিতবাবু যে বলেছেন, ১৮৮২তে প্রকাশিত ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রা-সংক্রান্ত বই বঙ্গদর্শনে সমালোচনার জন্য পাঠানো হলে সেই বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র তথ্য বহুল আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন বা আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু কই? তিন কিস্তিতে প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্রের দীর্ঘ যাত্রা প্রবন্ধের কোথাও ডঃ নিশিকান্ত বা তাঁর বইয়ের নামগন্ধও নেই।

সঞ্জীবচন্দ্রের এই যাত্রা প্রবন্ধ যে কারও কোন বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা নয়, যাত্রা প্রবন্ধটি যে কেউ পড়লেই, তা স্বীকার করবেন।

আসলে, মুলে একটা যোগ থাকলেও বিভিন্ন সময়ে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ তিনটি 'যাত্রা' প্রবন্ধই প্রত্যেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ রচনা। পরে এগুলিকে 'যাত্রা সমালোচনা' নামে একত্র করা হয়।

নিশিকান্তবাবুর যাত্রা সংক্রান্ত বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৮৮।৮৯ সালে। অতএব দেখা যাচ্ছে, এই বই বেরোবার অনেক বছর আগেই বঙ্গদর্শনে ও ভ্রমরে সঞ্জীবচন্দ্রের 'যাত্রা' প্রকাশিত হয়েছিল। এমন কি, বঙ্গদর্শন ও ভ্রমরের লেখা নিয়ে গঠিত সঞ্জীবচন্দ্রের 'যাত্রা সমালোচনা' বইটিও প্রকাশিত হয়েছিল, নিশিকান্তবাবুর বই বেরোবার ৭ বছর আগেই ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮৮২তে নিশিকান্তবাবুর বই প্রকাশিত হলে তখন বঙ্গদর্শনে সমালোচনার জন্য এই বই পাঠানো হয়েছিল সত্য। সে সমালোচনা ১২৮৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'যাত্রার ইতিবৃত্ত' নামে প্রকাশিত হয়। তবে সে সমালোচনা, নানা দিক দিয়ে বিচার করলে সঞ্জীবচন্দ্রের নয় বলেই মনে হয়।

রামেশ্বরের অদৃষ্ট—

রামেশ্বরের অদৃষ্ট একটি বড় গল্প। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের সম্পাদিত 'ভ্রমর'এর প্রথম সংখ্যায় অর্থাৎ ১২৮১ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

রামেশ্বর ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক। পিতার শ্রাদ্ধ করে সে সর্বস্বান্ত হয়। ফলে স্ত্রী পার্বতী, একমাত্র শিশুপুত্র আনন্দদুলাল এবং তার নিজের আর অন্ন জোটে না। শেষে রামেশ্বর উপার্জনের আশায় গ্রাম ছেড়ে স্ত্রী, পুত্র নিয়ে দূরে অন্য এক গ্রামে যায়। সেখানে গিয়ে জাত ভাঁড়িয়ে রামেশ্বর যে মজুর খেটে খাবে তাও পেল না। এমন কি তার স্ত্রী একটা দাসীবৃত্তির কাজও পেল না।

রামেশ্বর একদিন ঐ গ্রামের নায়েবের কাছে গিয়ে একটা পেয়াদাগিরির চাকরি প্রার্থনা করে। নায়েব চাকরি দিল না, তবে বল্ল—একজনের একটা সামান্য পানপাত্র চুরির অপরাধ স্বীকার করে যদি কিছুদিনের জন্য জেলে যেতে পার, তাহলে এখন কিছু টাকা পাবে এবং জেল থেকে ফিরলে চাকরি পাবে।

রামেশ্বর অবশেষে তাই স্বীকার করল। সে পুলিশের হাতে ধরা দিতে যাবার সময় পার্বতী খুব কান্নাকাটি করল। রামেশ্বরও স্ত্রীর কান্নায় খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে।

রামেশ্বর যে অন্যের চুরির অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিয়ে জেলে যাচ্ছে, এটা দারোগা নায়েবের কাছেই জেনেছিল। স্ত্রীর প্রতি রামেশ্বরের অনুরাগ জেনে সেই রাত্রেই দারোগা নায়েবকে বললে—রামেশ্বর হয়ত পালিয়ে আসবে, আর না এলেও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে নিজে চোর বলে স্বীকার করবে না।

শেষে দারোগা বললে—রামেশ্বরের ঘর থেকে পানপাত্র বার করে ওকে চোর দাঁড় করাতেই হবে। তাই আপনি আজই রাত্রে গোপনে ওর বাড়িতে গিয়ে একটা পানপাত্র পুতে রেখে আসুন।

এই কথায় নায়েব অনেক রাত্রে ভাল মানুষ সেজে রামেশ্বরের স্ত্রীকে মা সম্বোধন করে, রামেশ্বরের সংবাদ এনেছি বলে, পার্বতীর ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং বন্ধ ঘরে পার্বতীর সঙ্গে কথা কইতে লাগল।

এদিকে গভীর রাত্রে রামেশ্বর কোন উপায়ে পুলিশের কবল থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরে এল। এসে দেখল—নায়েব তার স্ত্রীর ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং বন্ধ ঘরে দুজনে কথাবার্তা বলছে।

এই দেখে রামেশ্বর নায়েবকে কু-লোক ভেবে এবং নিজের স্ত্রীরও চরিত্রের উপর সন্দেহ করে বাড়ি থেকে ফিরে এল। এসে পুনরায় পুলিশের হাতে ধরা দিল।

রামেশ্বর জেলে গেল। জেলের মেয়াদ ফুরোলে রামেশ্বর জেল থেকে ছাড়া পেয়েও আর বাড়ি গেল না। সে ডাকাতের দলে মিশে তাদের দলের সর্দার হ'ল।

এইভাবে অনেক বছর কেটে গেল।

শেষে পরে একদিনের এক ঘটনায় রামেশ্বরের সঙ্গে তার পুত্রের পরিচয় হয়। তারপর স্ত্রী পার্বতীর সঙ্গেও রামেশ্বরের মিলন হ'ল। আর পার্বতীর চরিত্রের উপর রামেশ্বরের যে সন্দেহ ছিল, তাও মিথ্যা বলে জানতে পারল।

'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' একটা সাদামাটা গল্প। তবুও এই গল্পে কয়েকটা ঘটনা বেশ একটু করে অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। যেমন—পার্বতী কারও বাড়িতে দাসীবৃত্তির চাকরি না পেতে পারে; তাই বলে রামেশ্বর একটা মুটে মজুরেরও

কাজ পেল না, একি সম্ভব ? তবে এই গল্পের কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনা বেশ সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত হয়েছে। যেমন—প্রথম পরিচ্ছেদে শিশু আনন্দদুলালের আধ আধ কথা, ভাবভঙ্গী ও কাজ এবং সেই সঙ্গে পার্বতীরও পুত্রের প্রতি স্নেহমাখা কথাগুলি বেশ সুন্দর হয়েছে।

কণ্ঠমালা—

'কণ্ঠমালা' সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসটি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের সম্পাদিত 'ভ্রমর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৮১ সালের আষাঢ় থেকে ১২৮২র জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ভ্রমরের এই ১২ সংখ্যায় 'কণ্ঠমালা' ৩৭ পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়। এতেও বই সম্পূর্ণ হয় নি। পরে সঞ্জীবচন্দ্র এই লেখাকে বই করার সময় বাকি আর ৬টা পরিচ্ছেদ লিখে যোগ করে দেন।

'কণ্ঠমালা' বই করার সময় সঞ্জীবচন্দ্র ভ্রমরে প্রকাশিত কণ্ঠমালার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন করেছিলেন। ভ্রমরে প্রকাশিত কণ্ঠমালার ৩৭ পরিচ্ছেদকে তিনি বইয়ে ৩১ পরিচ্ছেদে দাঁড় করিয়েছিলেন।

কণ্ঠমালা উপন্যাসের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

বিনোদের স্ত্রী কোন প্রতিবেশী এক শিশুর একটি হার চুরি করেছিল। বিনোদ এর কিছুই জানতো না। কিন্তু পুলিশ যখন বিনোদের বাড়ি খানাতল্লাসী করতে এসে হার বার করল, তখন বিনোদ স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য, নিজে চুরি করেছে বলে কবুল করল। এর ফলে বিনোদের জেল হ'ল।

জেলে গিয়ে শম্ভু ডাকাত নামে এক কয়েদীর সঙ্গে বিনোদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। শম্ভু আসলে ডাকাত নয়। সে একজন পরহিতব্রতী। তার প্রকৃত নাম মহারাজ মহেশচন্দ্র। পরহিতব্রতের জন্য মহেশচন্দ্রের একটা দল ছিল। এবং দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেবার জন্য তার একটা ভূ-গর্ভস্থ কারাগারও ছিল।

মহারাজ মহেশচন্দ্র কি করে শম্ভু ডাকাত হ'ল এর একটা ইতিহাস আছে। মহেশচন্দ্রের রাণী পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে মহেশচন্দ্রেরই ভৃত্য রামদাসের দ্বারা নিহত হয়। রাণীকে হত্যা করার আগে রামদাস এক ডাকাত দল নিয়ে রাণীর সমস্ত অলঙ্কার চুরি করেছিল। রাণী মৃত্যুকালে তাঁর সঙ্গের শিশু কন্যা শৈলকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে দিয়ে যান। সেই শৈলই পরে বিনোদের স্ত্রী হয়।

মহারাজ মহেশচন্দ্র স্ত্রী ও কন্যাকে হারিয়ে রাজকার্য ছেড়ে সন্ন্যাস নেন এবং এক মন্দিরে বাস করতে থাকেন।

রামদাস পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এই সময়ে রামদাস একদিন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে মহেশচন্দ্রের মন্দিরে যায়। গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে সন্ন্যাসীকে বলে—আমায় রক্ষা করুন। আর এও বলে যে, আমি সকলের কাছে আমার নাম বলেছি—শম্ভু।

রামদাস মহেশচন্দ্রকে চিনতে না পারলেও, মহেশচন্দ্র রামদাসকে চিনতে পারেন। চিনেও রামদাসের কাছে নিজের পরিচয় না দিয়ে, তাকে নিজের সন্ন্যাসীর পোষাক দেন এবং নিজে শম্ভু ডাকাত বলে পরিচয় দিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দেন।

বিনোদ, শম্ভু ডাকাত বা মহারাজ মহেশচন্দ্রের এ ইতিহাস কিছুই জানতো না। বিনোদ জেলে গিয়ে স্ত্রীর কথা কেবলই ভাবৃত। ভেবে ভেবে শেষে অসুখে পড়ে যায়। তার শারীরিক অবস্থা দেখে তার জেলের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই জেল কর্তৃপক্ষ তাকে মুক্তি দেয়।

রুগ্ন দেহে বিনোদ কোনরকমে একদিন অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরে উঠানে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে থাকে। ডাকতে ডাকতেই হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়ে যায়।

বিনোদের অবর্তমানে তার স্ত্রী শৈল বিলাস নামে তাদের এক প্রতিবেশীর সঙ্গে অবৈধভাবে জীবন যাপন করত।

বিনোদের ডাকে শৈল এবং বিলাস উভয়েই বাইরে এল। শৈল বিনোদকে মৃত ভেবে উঠানের এক কোণে মৃতদেহ সমাধিস্থ করবার জন্য বিলাসকে গর্ত খুঁড়তে বলল।

বিনোদ মূর্ছিত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেও, একটু পরেই সে আবার জ্ঞান ফিরে পায়। কিন্তু শরীরে বল ও বাক্‌শক্তি না থাকায় বিনোদ অসহায়ভাবে শৈলর কাণ্ড দেখতে লাগল।

ঠিক এই সময়ে শম্ভু ডাকাত কোথা থেকে এসে, শৈলকে নিয়ে গিয়ে তার শাস্তির জন্য তাকে ভূ-গর্ভস্থ কারাগারে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। আর বিনোদকেও নিয়ে গিয়ে নিজের লোকদের তার চিকিৎসার নির্দেশ দিল।

শৈল শম্ভুর কারাগারে গিয়ে পাগলী হয়ে যায়। কারাগার থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটে।

এদিকে বিনোদ সুস্থ হলে শম্ভু ডাকাতের বা মহারাজ মহেশচন্দ্রের পালিতা কন্যা মাধবীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

মহেশচন্দ্রের এই পালিতা কন্যা গ্রহণেরও একটা ইতিহাস আছে। সঞ্জীব-চন্দ্র 'কণ্ঠমালা'র ভূমিকায় বলেছেন—তাঁর এ বই তাঁর 'মাধবীলতা'র পরিশিষ্ট অর্থাৎ মাধবীলতার কাহিনীর পরের ঘটনা। মাধবীলতা উপন্যাসে মাধবীর শৈশব জীবনের কথা আছে, কণ্ঠমালায় আছে তার পরের কাহিনী।

মাধবীলতা উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, মহারাজ মহেশচন্দ্র শিশু মাধবীকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন। বইয়ে উল্লেখ না থাকলেও মহারাজ মাধবীকে নিয়ে আসার সময় তার পরিচারিকা মাতঙ্গিনীকেও সঙ্গে এনে ছিলেন।

এই হ'ল সংক্ষেপে কণ্ঠমালা উপন্যাসের কাহিনী।

কণ্ঠমালায় শম্ভু ও মোহান্তের কথাবার্তার মধ্যে এক জায়গায় আছে—শম্ভু দীনদুঃখীর বিয়ের জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। পরে ঐ টাকা অনাথ গৃহে দিয়ে সেখানে বাৎসরিক পাঁচ লক্ষর জায়গায় ছ লক্ষ টাকা করেন।

দানের এত জাঁক-জমকের উল্লেখ থাকলেও এক ঐ বিনোদের বাবতে যৎ সামান্য কিছু ব্যয় ছাড়া বইয়ে কোথাও কোন অনাথের সাহায্যের বা দীন-দুঃখীর বিয়ের আভাষই নেই।

রামদাস মাধবীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। মাধবী রাজী না হওয়ায় রামদাস তার বুকে শূল বসিয়েছিল এবং একটু রক্তও বার করেছিল। এরজন্য রামদাস কারারুদ্ধ হয়। কারাগারে মৃতা রাণীর কুকুরে খাওয়া শবদেহের নকল করে পুত্তলিকার সাহায্যে রামদাসকে ভয় দেখানো হ'ত। এ থেকেই বোঝা যায়, রামদাস কর্তৃক রাণী হত্যার সমস্ত কাহিনী মহারাজ মহেশচন্দ্রও জানতেন।

তাছাড়া রামদাস তো স্বয়ং মহারাজকেই কারারুদ্ধ করে হত্যার ব্যবস্থা করেছিল। মাতঙ্গিনীর বুদ্ধি এবং তৎপরতার ফলে মহারাজ রক্ষা পান।

মহারাজ দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেবার জন্য ভূ-গর্ভস্থ কারাগারে তাদের আটক রাখতেন। অথচ রামদাসের অত সব গুরুতর অপরাধের জন্য তার কিছুই করেন নি। এক তো রামদাসকে ডাকাত জেনেও তাকে সাধু সাজিয়ে

নিজে জেলে গেলেন। তার উপর রামদাসের চক্রান্ত থেকে নিজে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে সন্ন্যাসীদের বললেন—রামদাসের সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ করা ভাল হয় না। কি জানি, রাগান্ধ হইয়া যদি তোমরা কোন অকর্তব্য কার্য করিয়া থাক।

রামদাসের প্রতি মহারাজের এই সব উদারতা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

সঞ্জীবচন্দ্র 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিলেন—বাঙ্গলার কোন এক শ্রেষ্ঠ লেখক বলেছিলেন, কণ্ঠমালায় যদি শত দোষও থাকে, তবুও বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের গুণে সে সকল দোষের মার্জনা হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বর্ণনা সত্যই সুন্দর ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বইয়ে অবশ্য এইরূপ আরও অনেক সুন্দর বর্ণনা রয়েছে।

যাই হোক, কণ্ঠমালায় অনেক ঘটনা অস্বাভাবিক এবং রূপকথার ন্যায় মনে হলেও এ বই পড়তে আজও ভাল লাগে এবং গল্পের স্রোতে পাঠক-পাঠিকার মনকে আটকে রাখে।

কণ্ঠমালা উপন্যাসের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের এক জায়গায় আছে—বিনোদ নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া পুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টে নর্তকীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

এখানে এই নর্তকী হ'ল মাধবী। সঞ্জীবচন্দ্র যখন 'ভ্রমরে' ধারাবাহিক-ভাবে কণ্ঠমালা লেখেন, তখন তিনি মাধবীকে নর্তকী ও গায়িকা এই উভয়রূপেই দেখালেও সেখানে তাকে কেবল 'নর্তকী' 'নর্তকী'ই বলে গেছেন! পরে তিনি ভ্রমরে প্রকাশিত কণ্ঠমালাকে বই করার সময় মাধবীর নর্তকী পরিচয় না দিয়ে তাকে কেবল গায়িকাই করে যান। ভ্রমরের নর্তকী শব্দগুলো বদলে বইয়ে 'যুবতী' ও 'গায়িকা' করেন। যেমন—এখানে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের যে উদ্ধৃতিটি নিয়ে আলোচনা করছি, সেই জায়গাটা ভ্রমরে ছিল—

'একথা নর্তকী গায়িতে গায়িতে ভুলিয়া গেল। উন্মত্ত হইয়া গায়িতে লাগিল। বিনোদ নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া পুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টে নর্তকীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। গীত শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ গীত তুমি কোথায় পাইলে? —নর্তকী কেবল অঙ্গুলি দ্বারা পট দেখাইয়া দিল।'

সঞ্জীবচন্দ্র বই করার সময় এখানে এই উদ্ধৃতির প্রথম ও শেষের নর্তকী শব্দ দুটিকে যথাক্রমে যুবতী ও গায়িকা করলেও মাঝের নর্তকী শব্দটাকে

যুবতী বা গায়িকা করতে ভুলে যান। তার ফলে সেই ভুলটা আজও চলে আসছে। বইয়ে এটা একটা ভুলই। কারণ, বইয়ে মাধবীকে কোথাও নর্তকী হিসাবে দেখানো হয়নি, কেবল গায়িকাই বলা হয়েছে।

'কণ্ঠমালা'র কয়েকটি জায়গায় বর্ণনা ও কথোপকথন বেশ সুন্দর। যেমন—চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদে এক জায়গায় আছে—

'একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাতঙ্গিনী এবং মাধবী উভয়ে বাইশ-পৈঠার ঘাটে বসিয়া নিম্নস্বরে কথাবার্তা কহিতেছিল। সর্বত্র ছায়া পড়িয়াছে, নদীর জল নিঃশব্দে চলিতেছে, বায়ু অন্যমনস্কে বহিতেছে, নিকটে আর কেহ নাই, তথাপি উভয়ে চুপি চুপি কথা কহিতেছিল।...

মাধবী। আমি আর এখানে অধিকদিন থাকিতে পারি না।...হয়ত অনেক দিন আসিয়াছি ব'লে বুঝি এস্থান আর ভাল লাগে না।

মাত। এই সামান্য কথা বলিবার জন্য এত চুপি চুপি কথা কহিতেছ কেন? তোমার এ কথা যদি কেহ শুনে, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি?

মাধ। কোন ক্ষতির ভয়ে কথার স্বর নীচু করি নাই। চারিদিকের সুরের সঙ্গে আমার সুর মিলাইয়া কথা কহিতেছি। দেখিতেছ না, সর্বত্র ছায়া পড়িয়াছে, ছায়ার সুর অতি মৃদু, প্রায় শব্দহীন। জড়জঙ্গম সকলেই এই ছায়ার সঙ্গে সুর মিলাইতেছে। ঐ দেখ, নদীর জল নিঃশব্দে চলিতেছে, বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছে, বক সাবধানে পদ নিক্ষেপ করিতেছে। মাছ-রাঙ্গা পালক মুড়ি দিয়া শুষ্ক ডালে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। পৃথিবীর গোলমাল একেবারে থামিয়া গিয়াছে। আমিও তাই চুপি চুপি কথা কহিতেছি। এখন বুঝিলে?

মাত। তা বুঝিলাম। তুমি নিজে গায়িকা, সুতরাং গাছপালার, নদ-নদীর সুর ভাল চিনিতে পার।'

সঞ্জীবচন্দ্র এই কথোপকথন দিয়ে এখানে প্রকৃতি-প্রেমিক ও কবি হিসাবে দেখা দিয়েছেন।

জাল প্রতাপচাঁদ—

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থটি বহু পরিশ্রমে সংবাদপত্রাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রচনা করেন। এমন কি তিনি কৌশলে বর্ধমান রাজবাড়ির

প্রবীণ কর্মচারীদের কাছ থেকেও এই গ্রন্থের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেন।

কৌশলে বললাম এইজন্য যে, তিনি যখন বর্ধমান রাজবাড়ির ঐ সব কর্মচারীদের কাছে কোন কথা জানতে চান, তখন তিনি তাঁদের কাছে তাঁর উদ্দেশ্যর কথা বলেন নি। সঞ্জীবচন্দ্র অনেকদিন বর্ধমানের স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন। সেই সময় রাজবাড়ির ঐ সব কর্মচারীদের সঙ্গে রেজিস্ট্রি অফিসে বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের সূত্রেই সঞ্জীবচন্দ্র তাঁদের কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নিয়েছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র মুখে শোনা ছাড়াও, পাকা দলিলের সাক্ষ্য প্রমাণের ন্যায় চিঠির মারফত লিখিত ভাবেও আদায় করেছিলেন।

রাজবাড়ির কর্মচারীরা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে পাঠাবার সময় বার বার জিজ্ঞাসা করতেন, আপনি কি বর্ধমান রাজবাড়ির কোন ইতিহাস লিখবেন? যদি তা হয় তাহলে জানাবেন।

বর্ধমান রাজবাড়ির ঐ কর্মচারীদের এই সব চিঠির কয়েকটি আজও কাঁটালপাড়ায় 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসাবে এগুলি দেখেছি। এখন সাধারণের গোচরে আনার জন্য এগুলি এখানে এই প্রবন্ধে দিচ্ছি। তার আগে চিঠিগুলি বোঝার জন্য সঞ্জীবচন্দ্রের 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থের কাহিনীটি সংক্ষেপে বলছি—

বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের একমাত্র পুত্রের নাম ছিল—প্রতাপচাঁদ।

মহারাজ তেজচন্দ্রের সাত রাণী ছিলেন। এক রাণী নান্‌কী দেবীর গর্ভে এই প্রতাপচাঁদের জন্ম হয়।

কমলকুমারী নামে তেজচন্দ্রের আর এক রাণী ছিলেন। এই রাণী কমলকুমারীর ভাই-এর নাম ছিল পরাণচাঁদ। পরাণচাঁদ বর্ধমানেই বাস করতেন এবং অতিশয় চতুর লোক ছিলেন। তিনি মহারাজ তেজচন্দ্রকে হাত করবার জন্য তাঁকে 'বিয়ে পাগল' দেখে নিজের এক সুন্দরী কন্যা মহারাজকে সম্প্রদান করেছিলেন। পরাণচাঁদের ঐ কন্যাই রাণী বসন্তকুমারী।

পরাণচাঁদের এই কাণ্ড দেখে তখন বর্ধমানের অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। কেন না, পরাণচাঁদ আগে ছিলেন মহারাজের শ্যালক, এখন আবার হলেন শ্বশুর।

মহারাজ পরাণচাঁদের কন্যাকে অতি বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করেছিলেন। মহারাজের পুত্র প্রতাপচাঁদ তখন যুবা এবং মহারাজ অপটু বলে প্রতাপচাঁদই রাজকার্য দেখাশুনা করতেন। প্রতাপচাঁদ এই সময় তাঁর পিতার কাছ থেকে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দানপত্র করে নিজের নামে লিখিয়েও নিয়েছিলেন।

প্রতাপচাঁদের বয়স যখন খুবই অল্প, সেই সময় তাঁর মা মারা যান। প্রতাপচাঁদ তখন তাঁর পিতামহী বিষণকুমারীর কাছে প্রতিপালিত হন। পিতামহীর আদরে প্রতাপচাঁদের লেখাপড়া আদৌ হল না। তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। যৌবনে তাঁর সেই দুরন্তপনা আরও অনেক গুণ বেড়ে গেল। তিনি অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিলেন এবং কাকেও গ্রাহ্য করতেন না। একবার এক সাহেবের স্ত্রীকে বার করেও নিয়ে গিয়েছিলেন।

মহারাজ তেজচন্দ্র পুত্রের এইরূপ কাণ্ড দেখে তাঁকে দেখতে পারতেন না। এমন কি কিছুদিন পুত্রের সঙ্গে বাক্যালাপও বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

প্রতাপচাঁদের বিমাতা রাণী কমলকুমারী এবং কমলকুমারীর ভাই পরাণচাঁদ তো প্রতাপচাঁদকে একেবারেই দেখতে পারতেন না। কমলকুমারী বিষ খাইয়ে প্রতাপচাঁদকে মেরে ফেলবারও কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রতাপচাঁদ তাঁর ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত বন্ধু ও স্তাবকদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করে এইভাবে এক উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন। তারপর হঠাৎ একদিন তাঁর মানসিক পরিবর্তন দেখা গেল। সেদিন থেকে তাঁর মুখে কেউ আর হাসি দেখল না। তিনি বন্ধু ও স্তাবকদের সঙ্গে মেলামেশাও ছেড়ে দিলেন। একমাত্র শ্যামচাঁদ নামে তাঁর এক পারিষদের সঙ্গেই যা দু-একটা কথা বলতেন। আর চিনারি নামে এক ইউরোপীয় চিত্রকরের সঙ্গে মাত্র সাক্ষাৎ করতেন। এই চিত্রকর তখন প্রতাপচাঁদের একখানি প্রমাণ তৈলচিত্র আঁকছিলেন।

প্রতাপচাঁদের দুই স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গেও এই সময় প্রাণ খুলে কথা বলতেন না। সব সময়েই কি যেন ভাবছেন, এইভাবে থাকতেন। এই সময় প্রতাপচাঁদ একদিন কাকেও কিছু না বলে নিরুদ্দেশও হয়েছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ মহারাজ, পুত্র নিরুদ্দেশ হওয়ায় দিকে দিকে লোক পাঠিয়ে, অনেক সন্ধানের পর শেষে রাজমহল থেকে প্রতাপচাঁদকে ফিরিয়ে আনেন।

প্রতাপচাঁদ ফিরে এসেও আগের মতই বিমর্ষ হয়ে থাকতেন। এই সময়েই একদিন রাষ্ট্র হল যে, প্রতাপচাঁদের অসুখ করেছে। চিকিৎসকরা এসে

চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুই হল না। তখন প্রতাপচাঁদ একদিন বাড়ির লোকজনদের বললেন—আমার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা কর।

চিকিৎসকরা বললেন—রোগ তো তেমন মারাত্মক নয়, তবে শুধু শুধু গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা কেন?

প্রতাপচাঁদ গঙ্গাযাত্রার জেদ করতে লাগলেন। শেষে এক কবিরাজ প্রতাপচাঁদের গঙ্গাযাত্রার আদেশ দিলেন। তখন গঙ্গাযাত্রার উদ্দেশ্যে প্রতাপ-চাঁদকে কালনায় নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর সঙ্গে তাঁর বৃদ্ধ পিতাও কালনায় গেলেন। প্রতাপচাঁদের দুই স্ত্রী কিন্তু গেলেন না, সম্ভবত প্রতাপচাঁদ তাঁদের যেতে নিষেধ করেছিলেন।

কালনায় পৌঁছে প্রতাপচাঁদ সেখানে তাঁদের নিজেদের রাজবাড়িতে কিছু-দিন রইলেন। শেষে একদিন রাত্রি দেড় প্রহরের সময় পাল্কীতে করে প্রতাপ-চাঁদকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হল এবং কানাত দিয়ে ঘাট ঘিরে তাঁকে অন্তর্জলি করা হল। ঐ সময় সেখানে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই কানাতের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

পরে রাত্রি দুই প্রহরের সময় একটি কাঠের বাক্সেস্থিত শব দাহ করা হয়। এরপর রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় মহারাজ তেজচন্দ্র কালনা থেকে বর্ধমানের দিকে রওনা হন।

প্রতাপচাঁদ দানসূত্রে তাঁর পিতার সমস্ত সম্পত্তি পেয়েছিলেন। তাই প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর দুই স্ত্রীই উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু মহারাজ তেজচন্দ্র বর্ধমানে ফিরে এসেই প্রতাপচাঁদের দুই স্ত্রীর যে সব ধনরত্ন ছিল, সে সব তো নিলেনই, এমন কি তাঁদের উপরোক্ত বিষয়-সম্পত্তি থেকেও হটিয়ে দিলেন। এই নিয়ে মহারাজ তেজচন্দ্রের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের দুই স্ত্রীর মোকদ্দমাও হয়েছিল। এই মোকদ্দমায় বিচারে শেষে ঠিক হয়েছিল যে, বিষয়-সম্পত্তি মহারাজ তেজচন্দ্রের তত্ত্বাবধানেই থাকবে, তবে প্রতাপচাঁদের পত্নীরা মাসহারা পাবেন।

এদিকে কিন্তু প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর দু-একদিন পরেই রাষ্ট্র হল যে, প্রতাপ-চাঁদের মৃত্যু হয় নি। তিনি মৃত্যুর ছল করে পালিয়েছেন।

মহারাজ তেজচন্দ্র এ কথা শুনলেন। শুনে তিনি, হ্যাঁ, না, কিছুই বললেন না।

কিছুদিন কেটে গেল। এবার মহারাজ তেজচন্দ্রের পোষ্যপুত্র নেওয়ার

কথা উঠল। এই সুযোগে মহারাজের শ্যালক এবং পরমসুচতুর পরাণচাঁদ নিজের কনিষ্ঠ পুত্রটিকে মহারাজের পোষ্যপুত্র করে দিলেন। পরাণচাঁদের পুত্রটি রাজপুত্র হলে, তখন তার পূর্ব নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখা হল—মহাতাবচাঁদ।

এর কয়েক বছর পরে মহারাজ তেজচন্দ্রের মৃত্যু হল। তখন নাবালক মহারাজ মহাতাবচাঁদের পক্ষ হয়ে তাঁর পূর্ব পিতা পরাণচাঁদই রাজ্য দেখাশুনা করতে লাগলেন।

এই সময় প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর ঠিক পনের বছর পর একদিন এক সন্ন্যাসী বর্ধমান রাজবাড়ির বাইরের দ্বারে দেখা দিলেন। সেদিন ঐ সন্ন্যাসীকে দেখেই রাজবাড়ির কোন কোন কর্মচারী এবং আশপাশের অন্য আরও অনেকে তাঁকে প্রতাপচাঁদ বলে চিনতে পারল।

পরাণচাঁদ লোকমুখে এই সংবাদ শুনেই, তখনই একদল লাঠিয়াল পাঠিয়ে ঐ সন্ন্যাসীকে একেবারে দামোদর পার করে দিয়ে আসবার হুকুম দিলেন। লাঠিয়ালরা পরাণচাঁদের আদেশে সন্ন্যাসীকে দামোদর পার করে দিয়ে এল।

সন্ন্যাসী দামোদর পার হয়ে সিধা বিষ্ণুপুরের রাজার কাছে গেলেন। বিষ্ণুপুরের তৎকালীন রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ সন্ন্যাসীকে প্রতাপচাঁদ বলে চিনতে পারলেন। তখন তিনি সন্ন্যাসীকে আদর যত্ন করে নিজের বাড়িতে কিছুদিন রাখলেন।

ঐ সময় রাজা ক্ষেত্রমোহন একদিন সন্ন্যাসীকে পরামর্শ দিয়ে বললেন—আপনি একবার বাঁকুড়ায় গিয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করুন এবং আপনার সমস্ত বিষয় তাঁকে খুলে বলুন। ম্যাজিস্ট্রেট অভয় দিলে আপনি পুলিশের সাহায্য নিয়ে আবার বর্ধমানে যান। তখন আর পরাণবাবুর লাঠিয়ালরা কিছুই করতে পারবে না। আর পরাণবাবু যদি আপনাকে বিষয় না দেন, তখন তো কোর্ট আছেই।

এই পরামর্শ অনুযায়ী সন্ন্যাসী একদিন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বাঁকুড়ায় গেলেন।

এই সময়টার কয়েকদিন আগেই বাঁকুড়ার পার্শ্ববর্তী বীরভূম জেলায় সেখানকার আদিবাসীরা একটা হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছিল। সেই হাঙ্গামা থামাবার জন্য মিলিটারী ফৌজ পর্যন্ত ডাকতে হয়েছিল। ঐ হাঙ্গামায় শাসন-কর্তৃপক্ষের এমনি ভয় হয়েছিল যে, হাঙ্গামা মিটে যাবার অনেক দিন পর

পর্যন্তও তাঁরা কোথাও পাঁচ দশজন লোক একত্র জমায়েত হয়েছে দেখলেই আশঙ্কা করতেন, ঐ লোকেরা আবার না একটা গোলমাল করে বসে। এইজন্য শাসন-কর্তৃপক্ষ ঐ অঞ্চলে লোক জমায়েতের উপর কড়া নজর রাখতেন।

এদিকে সন্ন্যাসী বাঁকুড়ায় এসে গবর্ণমেণ্টের সারকিট হাউসের কাছে একটা গাছতলায় প্রথমে আশ্রয় নিলেন। সন্ন্যাসী যে বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচাঁদ, একথা বিষ্ণুপুর থেকেই প্রচারিত হয়েছিল। তাই সারা পথ দলে দলে লোকে তাঁকে দেখেছে। বাঁকুড়ায় এলে তো কথাই রইল না। অসংখ্য লোক তাঁকে দেখতে এল।

বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট একত্র এতলোক দেখে অন্য কিছু না ভেবে, আবার একটা হাঙ্গামা হতে পারে, শুধু এই ভেবেই সন্ন্যাসীকে গ্রেফতার করলেন।

সন্ন্যাসী আট মাস হাজতে থাকলেন। আট মাস পরে বিচারের জন্য সন্ন্যাসীকে হুগলীতে পাঠানো হল।

প্রতাপচাঁদ ফিরে এসেছেন, একথা যাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি, প্রতাপচাঁদ বাঁকুড়ায় অ্যারেষ্ট হলে তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন ইংরাজ উকিলকে বাঁকুড়ায় পাঠিয়েছিলেন। আবার হুগলিতে সন্ন্যাসীর বিচার আরম্ভ হলে একজন ইংরাজ ব্যারিস্টারকেও তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জজসাহেব ঐ ব্যারিস্টারকে কোন কথা বলতে না দিয়ে, এক তরফাই বিচার করেছিলেন। রায়ে তিনি বলেছিলেন—সন্ন্যাসী প্রতাপচাঁদ নয়। আমি সাক্ষ্য প্রমাণে জেনেছি, ওর আসল নাম আলোক শা। ঐ ব্যক্তি এখন নিজেকে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বলে প্রচার করে লোক জমায়েত করেছিল এবং রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করতে উদ্যত হয়েছিল। এই অপরাধের জন্য ওর ছ'মাসের জেল হল।

ছ মাস পরে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ন্যাসী জেল থেকে মুক্তি পেলেন।

যাঁরা সন্ন্যাসীকে প্রতাপচাঁদ বলে বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁরা এবার সন্ন্যাসীকে জেল ফটক থেকে নিয়ে বাজনাবাদ্য করে নগর প্রদক্ষিণ করিয়ে শেষে এক জাহাজে করে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। কলকাতায় এসে সন্ন্যাসী ধনী রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাড়িতে ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

কয়েক মাস পরে হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে সন্ন্যাসী প্রতাপচাঁদ কলকাতার সম্পত্তির জন্য সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা রুজু করলেন।

সন্ন্যাসীর উকিলেরা তাঁকে বললেন—আপনি যে প্রকৃতই প্রতাপচাঁদ, এই কথাটা বর্ধমানের কিছু সংখ্যক লোককে দিয়ে সুপ্রীম কোর্টে সাক্ষ্য দেওয়ানো দরকার। তাই আপনি নিজে যদি একবার বর্ধমানে যেতে পারেন তো বড় ভাল হয়।

এই পরামর্শ অনুযায়ী সন্ন্যাসী একদিন তাঁর হিতৈষীদের অনেককে নিয়ে কয়েকটা নৌকায় করে কলকাতা থেকে বর্ধমান রওনা হলেন। যাত্রাপথে সন্ন্যাসী কিছুক্ষণের জন্যও তাঁর নৌকা থেকে কোথাও নামলে, অমনি হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখতে আসতো। এইভাবে বে-আইনীভাবে লোক জমায়েত করার অপরাধে সন্ন্যাসী তাঁর বর্ধমান যাত্রাপথেই গ্রেফতার হলেন। আর শুধু সন্ন্যাসীই নয়, তাঁর সঙ্গীরা এবং যাঁরা তাঁকে দেখতে এসে জমায়েত হয়েছিল, এরূপ আরও ২৯৪৩ জনকে গ্রেফতার করা হল। কেবল সন্ন্যাসীকে হুগলীতে পাঠিয়ে, বাকি সকলকে সাময়িক ভাবে বর্ধমানের হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যথাসময়ে সন্ন্যাসীর বিচার আরম্ভ হল। লোক জমায়েত করে শান্তি-ভঙ্গের উদ্যোগ ছাড়া, সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট প্রধান অভিযোগ আনল যে, সন্ন্যাসী তাঁর আসল নাম গোপন করে অসৎ অভিপ্রায়ে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ নাম ব্যবহার করেছে।

বিচারের সময় উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দীর পূর্বে, চিনারি সাহেবকে দিয়ে প্রতাপচাঁদ তাঁর নিজের যে চিত্রখানি (প্রতাপচাঁদ তখন চিনারী সাহেবকে বলেছিলেন—আমি যতটা লম্বা, ঠিক সেইরূপ লম্বা যেন ছবিখানি হয়। দৈর্ঘ্যের যেন একচুলও প্রভেদ না হয়) আঁকিয়েছিলেন, সেই ছবিটিকে বর্ধমান থেকে আনিয়ে আদালতের একটি ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনেক সাহেব, যেমন গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী এইচ টি প্রিন্সেপ, বোর্ডের মেম্বার জেমস প্যাটেল, প্রভৃতি অনেকেই সাক্ষ্য দিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন।—সন্ন্যাসী যে প্রতাপচাঁদ নন, একথা এঁরা সকলেই বললেন।

সন্ন্যাসী যে প্রতাপচাঁদ নন, আসল প্রতাপচাঁদের যে প্রকৃতই মৃত্যু হয়েছিল এবং তাঁর মৃতদেহ দাহ করেছিল, এমন ১৫ জন বর্ধমান রাজবাড়ির লোক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিল।

সন্ন্যাসীর পক্ষেও অনেক ইংরাজ সাহেব, মেম, এমন কি চন্দননগর ফরাস-

ডাক্তার কয়েকজন ফরাসীও সাক্ষ্য দিলেন। এঁরা সকলেই বললেন—সন্ন্যাসীই প্রকৃত বর্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ।

সন্ন্যাসীর পক্ষে অনেক সাক্ষী আবার হাজিরও হল না; যেমন প্রতাপ-চাঁদের রাণীরা। সন্ন্যাসী তাঁদের সাক্ষ্য মেনেছিলেন। কিন্তু তাঁরা আদালতে এসে সাক্ষ্য দিতে রাজী হলেন না। তখন বিচারক বলেছিলেন. প্রতাপচাঁদের স্ত্রীরা চুঁচুড়ার রাজবাটীতে এলে কমিশান দিয়ে তাঁদের জবানবন্দী নেওয়াবেন। কিন্তু তাঁরা তাতেও রাজী হলেন না। প্রতাপচাঁদের স্ত্রীরা সমন পেয়েও যে সাক্ষ্য দিতে চাননি, সে সম্বন্ধে তাঁরা নাকি বলেছিলেন, আসামীকে তাঁরা তাঁদের স্বামী বলে চিনতে পারলেও সেকথা তাঁরা মুখে আনতে পারবেন না। কারণ, লোকে বলবে, বৈধব্য ঘোচাবার জন্যই ওরা মিথ্যা কথা বলছে, জজও হয়ত তাদের কথা বিশ্বাস করবে। তখন তারা স্বামী তো পাবেই না, উপরন্তু কলঙ্কের পসরা মাথায় নেবে।

যাই হোক, স্বয়ং আসামী তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন—আমার বিমাতা কমলকুমারী আমার পরম শত্রু ছিলেন। তিনি আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন। কমলকুমারীর ভাই পরাণ-চাঁদও সর্বদাই আমার সর্বনাশের চেষ্টা করতেন।

আমি সেই থেকেই অধঃপাতে গেলাম। ক্রমে অধিক পরিমাণে মদ খেতে লাগলাম। শেষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হলাম। তখন কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে স্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি জিজ্ঞাসা করায় ব্যবস্থা দিলেন—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল। তাতে ব্যর্থ হলে চতুর্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস। সেই সঙ্গে একথাও বলে দিলেন যে, এরূপভাবে অজ্ঞাতবাস করবে যেন সকলেই জানে তুমি মরেছ।--অজ্ঞাতবাসের উদ্দেশ্যে একবার আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিলাম, কিন্তু আমার পিতা আমাকে ধরে আনেন।

পরে আমি ঠিক করি—আমি মরেছি, এই কথাটা এবার সকলকে জানাব। তাই আমি পীড়ার ভান করে কালনায় যাই। সেখানে অন্তর্জলির ছল করে এক বজরায় চড়ে সরে পড়ি। আমাকে অন্তর্জলি করা হলে, অন্তর্জলির পর রাজবাড়ির অধিকাংশ লোক যখন শীতে কাতর হয়ে তাঁবুর ভিতর গিয়ে আশ্রয় নিল, কেবল দু চার জন মাত্র আমার কাছে থাকল, সেই সময় আমি তাদের শপথ করিয়ে জলে সরে পড়ি। নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে আমি বজরায় গিয়ে উঠি। তারপর সেই বজরায় আমি প্রথমে মুর্শিদাবাদে যাই, সেখানে

কয়েকদিন থাকি। তারপর থেকে এক দীর্ঘ সময় ধরে আমি সন্ন্যাসী সেজে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশে ভারতের বিভিন্ন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই।

আমি যদি বাস্তবিকই মরতাম, তাহলে কি আমার ত্যক্ত সম্পত্তির কোন বন্দোবস্ত করে যেতাম না! আর এক কথা, আমি যাবার সময় আমার একখানি প্রমাণ ছবি রেখে গেসলাম, সে ছবি এখানে আনানো হয়েছে। লোকে বয়সে কেউ মোটা, কেউ রোগা হয়, কিন্তু মাথায় কেউ ছোট হয় না বা বড় হয় না। সেই ছবির সঙ্গে আমায় মেপে দেখা হয়েছে। তাতে ছবির সঙ্গে আমার লম্বার মাপে এক চুলও কম বেশি হয় নি।

উভয় পক্ষের জবানবন্দী শুনে নিজামত আদালতের জজেরা রায় দিলেন—মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার জন্য আসামীর এক হাজার টাকা জরিমানা করা গেল, অনাদায়ে ছ মাস কারাবাস।

যাঁরা এতদিন সন্ন্যাসীর স্বপক্ষে ছিলেন, এবার তাঁরা একে একে সরে দাঁড়াতে লাগলেন। অবশ্য কেউ কেউ পূর্বের মত এখনও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে চলতে লাগলেন। এঁদেব মধ্যে কলকাতার কলুটোলাব গোবিন্দ প্রামাণিক ছিলেন অন্যতম। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইনিই প্রকৃত প্রতাপচাঁদ। তাই তিনি এই প্রতাপচাঁদের জন্য তাঁব সর্বস্ব ব্যয় করেছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে এই প্রতাপচাঁদের শেষ জীবন সম্বন্ধে লিখেছেন—'কলুটোলা হইতে জালরাজা শ্যামপুকুরে গিয়া থাকিলেন। কিছুদিন পরে লাহোরের লড়াই উপস্থিত হইল। এই সময় জালরাজার প্রতি গবর্ণমেণ্টের আবার দৃষ্টি পড়িল। গতিক বুঝিয়া তিনি কোম্পানীর রাজ্য হইতে পলাইয়া প্রথমে চন্দননগরে ফরাসিস্ আশ্রয়ে কয়েক বৎসর থাকিলেন। তাহার পর শ্রীরামপুরে যান। শ্রীরামপুরে তখন কোম্পানীর রাজ্য হয় নাই। সেখানে প্রায় ছয় সাত বৎসর ছিলেন। এই সময় শ্রীরামপুরে আমাদের যাতায়াত ছিল। শুনিতাম, তিনি তথায় ঠাকুর সাজিয়া দিন যাপন করিতেন। নিত্য সন্ধ্যার সময় বেশ্যারা আসিয়া এক এক পঞ্চপ্রদীপ আর ঘণ্টা লইয়া সকলে একত্রে তাঁহার আরতি করিত। তিনি অনেক লোককে মন্ত্র-শিষ্য করিয়াছিলেন। মৃত্যুর আট মাস পূর্বে তিনি কলিকাতার উত্তরে বরাহনগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার··· অর্থেরও কিছু অনটন হইয়া থাকিবে। তিনি ১৮৫২ সালে কি ১৮৫৩ সালের প্রথমে ময়রাডাঙ্গা পল্লীতে··· দেহত্যাগ করেন।'

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর এই 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থ রচনার জন্য সংবাদপত্রাদি ছাড়া বর্ধমানের রাজবাড়ির প্রবীণ কর্মচারীদের কাছ থেকেও পত্রাকারে যে সব লিখিত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, এখন সেই চিঠিগুলি এখানে উদ্ধৃত করছি—

(১)

Burdwan

(from Rajbattee)

My dear Sunjeeb Babu,

নানকিবিবি—প্রতাপচন্দ্রের মাতা

পরাণবাবুর পিতা নিজ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছিলেন। তেজচন্দ্র বাহাদুর তাহাকে দেখিয়া বিবাহ করেন অর্থাৎ তেজচন্দ্র বাহাদুর পরাণবাবুর ভগ্নীকে, তাহার পর তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। পরাণবাবুর পিতা লাহোরে থাকিতেন ও তাঁহার অবস্থা সামান্য ছিল। পরাণবাবু ১২৫০ কিম্বা ৫১ সালে মরেন। প্রতাপচন্দ্র বড় দুষ্ট ছিলেন। সাহেবদিগকে বড় ঠেঙ্গাইতে উদ্যত থাকিতেন। ঐ নিমিত্ত তাঁহার নামে পরওয়ানা বাহির হয়, কিম্বদন্তি আছে।

আপনি এই সংবাদ লইয়া কি করিবেন লিখিবেন। যদি বর্ধমান রাজের পুরাবৃত্ত লিখিবার মানস থাকে সবিশেষ লিখিবেন। জগবন্ধু ও আমার আর এক বন্ধু এই সংবাদ দিতে ভার লইয়াছেন।

Yours

(২)

...জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার দৈনিক কার্যের বিবরণ লিখিয়া রাখিতেন। সেই বহি জালরাজার মোকদ্দমার সময়ে আদালতে দাখিল হইয়াছিল। তদবধি সেই পুস্তকের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এখানকার অনেক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বিশ্বাস যে জালরাজাই প্রকৃত প্রতাপচন্দ্র। গদাধর তেওয়ারী মহাশয়ের এই সংস্কার ছিল, শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, শ্যামচাঁদবাবু নামে একজন প্রতাপচন্দ্রের পারিষদ ছিল। সে ব্যক্তির সহিত পরাণবাবুর মনান্তর ছিল। সে পরাণবাবুকে নিরাশ করিবার অভিপ্রায়ে প্রতাপচন্দ্রের আকৃতিগত এক ব্যক্তিকে দাঁড় করাইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত

করিয়াছিল। জাল প্রতাপচন্দ রাজ্যের সমুদয়, বিশেষ অন্য অন্য কারণে সন্ধান ও রাজপুরবাসিগণের ও নগরের সমুদয় বিষয় উক্ত শ্যামচাঁদবাবুর নিকট জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ঐ শ্যামাচাঁদবাবু একজন বর্ধমান নিবাসী। তাঁহার পুত্র মদনবাবু রাম্বাবুর একজন শ্বশুর ছিলেন।

প্রকৃত প্রতাপচন্দ্রের অন্তর্ধানের বিবরণ—

যাহারা জাল প্রতাপচন্দ্র কহে, তাহারা বলে যে প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে ও তাঁহার শবদাহ করিয়াছে।

অপর দলে বলে, প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু প্রকৃত ঘটনা নহে। একদিবস তিনি তাঁহার বিমাতার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্রাহ্মণগণদ্বারা উপবিষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস জন্য নিরুদ্দেশ হন। তিনি পীড়ার ছলনা করিয়া কালনায় গঙ্গাতীরে যান ও তথায় কানাত ঘেরাইয়া তন্মধ্য হইতে গঙ্গার জলে যান ও ডুব দিয়া প্রস্থান করেন। তৎপর একটি খালি কাঠের সিন্দুক প্রতাপচন্দ্রের শব বলিয়া দগ্ধ করা হয়। তিনি ১২ বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়া পুনরায় বর্ধমানে আসেন এবং জাল প্রতাপচন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। নৈহাটী নিবাসী শ্রীতারকচন্দ্র বসুর পিতামহ রামচাঁদ বসু সন্ন্যাসী হইয়া কিছুকাল দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন। তাঁহার সহিত প্রতাপচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও প্রণয় হইয়াছিল। মোকদ্দমার সময়ে প্রতাপচন্দ্র তাঁহাকে সাক্ষ্য দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন।—বর্ধমান, ২০ জুলাই ৮২

(illegible)

Yours affly,

(৩)

১। তোতাবিবি তেজচন্দ্র বাহাদুরের বড় কন্যা ও প্রতাপচন্দ্রের ভগ্নী।

২। আনন্দকুমারী ও প্যারীকুমারী।

৩। পরাণচন্দ্রবাবু ১২৫১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মরিয়াছেন। পরাণ-বাবুর পিতার নাম কাশীনাথবাবু, তিনি জগন্নাথ দর্শন মানসে এতদ্দেশে আসেন। সেই সময় তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না। পরাণবাবুর মাতা লোকের বাড়িতে সুতা বেচিয়াছেন (অম্বিকাচরণ দাস নামে এক ব্যক্তি খুনি বৈষ্ণবীর মুখে শুনিয়াছে।) লোকে বলে পরাণবাবুও ছেলেবেলায় সুতা ও কাপড় বেচিতেন। পরাণবাবুর ভগ্নী কমলকুমারীকে দেখিয়া রাজা তেজচন্দ্র

তাহাকে বিবাহ করেন। তাহার পর হইতে ক্রমশ তাহার অবস্থা ভাল হয়। কেহ কেহ বলে যে পরাণচন্দ্র কালনায় নীলকুঠিতে চাকরি করিয়াছিলেন। কি চাকরি তাহার ঠিক নাই।

৪। বসন্তকুমারী তেজচন্দ্রের স্ত্রী, পরাণবাবুর কন্যা। তেজচন্দ্রের ৭ স্ত্রী ছিলেন।

৫। প্রতাপচন্দ্রের মাতার নাম নান্‌কি রাণী। তিনি প্রতাপচন্দ্রের আগে মরেন।

৬। প্রতাপচন্দ্র ছেলেবেলা হইতে বুদ্ধিমান ও তেজস্বী (spirited); নষ্টামি বুদ্ধি ছিল। পরাণবাবুর গোষ্টীকে দেখিতে পারিতেন না। পরাণবাবুর পাছায় কলিকা পুড়াইয়া ছেলেবেলায় দাগ দিয়াছিলেন, জালরাজার মোকদ্দমায় সে কথা প্রকাশ পায়। তাঁহার মাতা না থাকায় তেজচন্দ্র বাহাদুরের মাতা রাণী বিষণকুমারী তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তিনিও পিতামহীর বশ ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পিতা তেজচন্দ্র বাহাদুরকে রাজ্য ছাড়িতে বলায় তেজচন্দ্র তাঁহাকে রাজত্ব দেন। তিনি সেই সময় ১৮১৯ সালের ৮ আইন তাঁহার দেওয়ান মান গোবিন্দ মুন্সীর সাহায্যে প্রচলিত করান। ইহার পূর্বে বর্ধমানের রাজাদিগকে টাকা অনেক সময়ে কর্জ করিতে হইত। ৮ আইন প্রচলিত হওয়ার পর বর্ধমানে রাজবাটীতে দেয় টাকা জমে এবং প্রতাপচন্দ্র তাহার কারণ। রাজা হওয়ার পূর্ব হইতে তিনি অতিশয় পানাশক্ত ছিলেন. আর দুর্দান্ত ছিলেন। তাঁহার সহিত কয়েকজন মোগল থাকিত। তাঁহার নামে গ্রেফতারি পরয়ানা বাহির হইয়াছিল. কিন্তু কখন ধরা পড়েন নাই। তিনি সাহেব সুবাদের সঙ্গে মিশিতেন না, এমন কি কখন দেখাও করিতেন না, বরং সুবিধা পাইলে তাঁহাদের উত্তম মধ্যম দিতেন। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটকে নাকি তিনি গাড়ি হইতে নামাইয়া মারিয়া ছিলেন। বর্ধমানের একজন জজ (হো কি হেজ) সাহেব নামে তাহার মেমকে বাহির করিয়াছিল।

প্রতাপচন্দ্র দাতা ছিলেন। পূর্বে রাজবাটীতে মুঠি দিবার নিয়ম ছিল, কিন্তু ইনি সেটি উঠাইয়া দিয়া সদাব্রতের বন্দোবস্ত করিলেন।

যখন পরাণচন্দ্রবাবুর অষ্টম পুত্র জন্মায় (মহাতাবচন্দের ছেলেবেলার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ), তখন ঐ সমাচার পাইয়া প্রতাপচন্দ বলিয়াছিলেন যে, আমি শীঘ্র মরিব, আর পরাণচন্দের যে পুত্র জন্মিয়াছে সেই বর্ধমানের গদিতে বসিবে, তোমাদের যেন মনে থাকে। এই কথা তাঁহার মোসাহেবদের কাছে

বলিয়াছিলেন। তিনি মদ খাইতেন বলিয়া তেজচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। ব্রহ্মানন্দ গোঁসাই নামে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তেজচন্দ্র বাহাদুরের কাছে থাকিতেন। তিনিও প্রতাপচন্দকে দেখিতে পারিতেন না। যখন প্রতাপের পীড়া হয় তখন তিনি বর্ধমান হইতে কালনায় যান। সঙ্গে পরাণচন্দ ও গোঁসাইকে লইয়া যান। মরিবার সময় ব্রহ্মচারিকে ডাকিয়া বলেন যে, আপনি আমাকে মদ খাওয়ার জন্য ঘৃণা করিতেন। এখন বলুন, সম্মুখে কি? গোঁসাই কহিলেন—গঙ্গা।

পরে রাজা বলেন—আমি মদ খাইতাম। কিন্তু দেখুন এই গঙ্গায় আমার মৃত্যু হইতেছে।

১। ভোলানাথের পিতামহের নাম রাজবল্লভ কবিরাজ।

	উত্তর	প্রশ্ন
২।	কমলকুমারী	পরাণবাবুর ভগ্নীর নাম কি?
৩।	লক্ষ্মীনারায়ণ	মহাতাবচন্দের বাল্যকালের নাম কি?

জগবন্ধুর সাহায্যে উক্ত সংবাদগুলি পাওয়া গিয়াছে। তোতাবিবির সম্বন্ধে যাহা শেষে লিখিত হইল, তাহা ঠিক। কোন ব্যক্তির হাঁপানি ভাল হইতে দেখিয়াছেন?—শ্রীগঙ্গানারায়ণ মিত্র।

২ ও ৩ সংখ্যক চিঠির মাথায় '...' চিহ্নিত অংশ ছিন্ন।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'জাল প্রতাপচাঁদ' বইয়ে লিখেছেন—'প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর এই রটনা হইয়াছিল যে, তিনি কোন পাপিষ্ঠার কৌশলে পড়িয়া মহা পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য চতুর্দশ বৎসর অজ্ঞাত-বাস গিয়াছেন—মরেন নাই।'

এখানে উদ্ধৃত ২ সংখ্যক চিঠিটি থেকে সেই 'পাপিষ্ঠা' ও প্রতাপচাঁদের 'মহাপাপের' কথাটা জানা গেল।

২ সংখ্যক চিঠিতে প্রতাপচাঁদের ১২ বছর অজ্ঞাতবাসের কথা আছে। আর ৩ সংখ্যক চিঠিতে গোঁসাই-এর সঙ্গে পরাণচাঁদকে কালনায় নিয়ে যাওয়ার কথা আছে। সঞ্জীবচন্দ্রের বইয়ে কিন্তু আছে ১৪ বছর অজ্ঞাত বাস, আর পরাণচাঁদ নয়, মহারাজা তেজচন্দ্র কালনায় গিয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের এই 'জাল প্রতাপচাঁদ' প্রথম প্রকাশিত হয়, ১২৮৯ সালের শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা বঙ্গদর্শনে। পরে তিনি বঙ্গদর্শনের

এই রচনার অনেক অংশ পরিবর্তন ও পরিত্যাগ করে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮৯/৯০ সালে) বই আকারে প্রকাশ করেন। বঙ্গদর্শনের লেখার সঙ্গে এমন কি বইয়েও কোথাও লেখক হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্রের নাম ছিল না। লেখকের নামের জায়গায় বইয়ে কেবল ছাপা হয়েছিল—

Published by Radhanath Banerjee for the proprietor.

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'জাল প্রতাপচাঁদ' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন—'আমাদের ইতিহাস নাই। যাহা আমরা বাঙ্গালীর ইতিহাস বলিয়া পাঠ করি, তাহা ইংরেজের ইতিহাস। বঙ্গভূমে ইংরেজের কীর্তিকলাপকে বাঙ্গালীর জিনিস বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতেছি। এই ভ্রম দূর করিবার সময় এখনও হয় নাই। যখন সে সময় উপস্থিত হইবে, তখন ইতিহাসোপযোগী উপকরণের অভাব না হয়, এই প্রত্যাশায় এক এক সময়ের সামাজিক দুই চারিটা কথা লিখিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। সেই জন্য আপাতত জালরাজাকে উপলক্ষ্য করা গিয়াছে।'

বইয়ের আরম্ভে 'পূর্বকথায়' সঞ্জীবচন্দ্র এই কথা নিয়েই আবার বলেছেন—'প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল হুগলিতে জালরাজার মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। ...আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। পূর্বে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ছিল, বিচারপ্রণালী কিরূপ ছিল, আর সে সময়ে আমাদের এই বাঙ্গালীরা কিরূপ ছিলেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা জালরাজার কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি।'

সঞ্জীবচন্দ্র প্রভূত পরিশ্রমে নানা সূত্রে তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করে বেশ গুছিয়ে সুন্দরভাবে তাঁর এই 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তখনকার দিনে বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে এই জালরাজার কাহিনী প্রচলিত ছিল। ফলে সঞ্জীবচন্দ্র এই বই লিখে তখন দেশবাসীর কাছে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তবুও বলবো, এই গ্রন্থ রচনায় তিনি যে পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দিয়েছিলেন, সেই পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় তিনি যদি তাঁর সংকার, বৈজ্ঞিক-তত্ত্ব, বিবাহের ঘটকালি, পদোন্নতির পন্থা প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির ন্যায় জালরাজার বদলে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বা সামাজিক বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনা করতেন, তাহলে দেশবাসী আরও অনেক বেশী উপকৃত হ'ত।

এই জন্যই বোধ করি রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন—'জাল প্রতাপচাঁদ নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র যে ঘটনা সংস্থান, প্রমাণ

বিচার এবং লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে একটি কৌতূহলজনক আনুপূর্বক গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারও সন্দেহ থাকে না—কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হয়, ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র। এই ক্ষমতা যদি কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেন, তবে তাহা আমাদের ক্ষণিক কৌতূহল চরিতার্থ না করিয়া স্থায়ী আনন্দের বিষয় হইত। যে কারুকার্য প্রস্তরের উপর ক্ষোদিত করা উচিত, তাহা বালুকার উপর অঙ্কিত করিলে কেবল আক্ষেপের উদয় হয়।'

মনীষী ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র এবং সঞ্জীবচন্দ্র, উভয়েরই বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তারাপ্রসাদবাবু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' এবং সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'ও নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। এই তারাপ্রসাদবাবু সঞ্জীবচন্দ্রের 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থ পড়ে তখন সঞ্জীবচন্দ্রকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, সেই চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

July 8, 1883

My dear Sunjib Babu,

I have read your very interesting account of Jal Protapchand with pleasure. It contains a good deal of information which is entirely new to me. As illustrative of the judicial procedure of the age—more than a hundred people clapped into jail without rhyme or reason—the book has a peculiar value independently of its other merits.

Please send me 10 copies of the book by value payable packet post. I will sell some and distribute a copy or two gratis. The book ought to command a good sale. One of my friends here, Babu Rasik behari Biswas has written an article on my request on the second seige of Saragopa.

I don't know if he has sent you the article. If he has not I will give him a takeed. I see only one mistake in your book, Mr. Overbeck was the Dutch Governor of Chinsurah—not

the Danish Governor. Chinsurah was never a Danish settlement.

I was laid up with fever for more than a week. I am still weak.

Yours affectionately
Tara prosad Chatterjee

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্থাৎ 'সোনাক্ত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষী' অধ্যায়ে লিখেছেন—'ওবারবেক সাহেব (ডি. এ. ওবারবেক) বলিলেন—আমি এক্ষণে চুঁচুড়ায় থাকি। দিনেমারের আমলে আমি চুঁচুড়ার গবর্ণর ছিলাম। আমি এই আসামীকে চিনি না।'

এই প্রসঙ্গেই তারাপ্রসাদবাবু সঞ্জীবচন্দ্রকে লিখেছিলেন—ডেনিশ বা দিনেমার আমল না হয়ে ওটা হবে ডাচ বা ওলন্দাজ আমল।

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবিতকালে 'জাল প্রতাপচাঁদ'-এর আর দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নি। তাই তিনি এই ভুলটা সংশোধন করে যেতে পারেন নি। ফলে 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণ গুলিতেও ঐ ভুলই ছাপা হয়ে আসছে।

'সংকার' ও 'বাল্য-বিবাহ'—

এ তুটি ছিল তুটি পুস্তিকা। এই লেখা তুটি 'ভ্রমর' থেকে নিয়ে যথাক্রমে—গ্রাম্যপাঠ নং ১ সংকার ও গ্রাম্যপাঠ নং ২—বাল্য-বিবাহ—হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছিল।

'সংকার' ভ্রমরে ১২৮১ সালের পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ফাল্গুন সংখ্যার লেখার শেষে 'ক্রমশঃ' ছিল। এই 'ক্রমশঃ' দেখে বোঝা যায়, আরও লেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি।

'বাল্য-বিবাহ' ভ্রমরে ১২৮৫ সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই লেখা তুটির সঙ্গে না 'ভ্রমরে' আর না ঐ পুস্তিকায় কোথাও লেখক সঞ্জীবচন্দ্রের নাম ছিল না।

'সংকার' পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল—Printed by Radhanath Banerjee at the Bangadarsan Press, Kantalpara, for the proprietor, —মূল্য এক আনা।

আর 'বাল্য-বিবাহ' পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল—Printed and published by Radhanath Banerjee, Johnson Press, Calcutta.

রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রেসের ম্যানেজার। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'বাল্য-বিবাহ' পুস্তিকা ছাপা হয়, তখন সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রেস আর ছিল না। তাই ঐ পুস্তিকা তখন 'জনসন প্রেসে' ছাপা হয়েছিল। ঐ সময় বঙ্গদর্শন পত্রিকাও কলকাতার ঐ জনসন প্রেসেই ছাপা হ'ত।

'সংকার' পুস্তিকায় সঞ্জীবচন্দ্র দেশ-বিদেশের কাহিনী ও উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে, যা আমাদের রীতিমতই জানবার মত কথা, অতি সুন্দর ভাবে ও বেশ সুখপাঠ্য করেই তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

মেয়েদের বিয়ের বয়স নিয়ে আগেকার দিনের চিন্তাশীল মানুষদেরও চিন্তার সঙ্গে নানা কারণেই আজকের দিনের মানুষের মতের আর আদৌ মিল সম্ভব নয়। তবুও সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'বাল্য-বিবাহ' পুস্তিকায় তখনকার তুলনায় বেশ উদার ভাবেই এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আর অন্যান্য দেশের নারী-পুরুষের বিবাহের প্রসঙ্গ এনে এ কথাও অতি সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন—

'স্ত্রৈণতা অপবাদ সত্য, কিন্তু বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কোন জাতির সৌভাগ্যে এই অপবাদ ঘটে নাই। স্ত্রীরা পতিপরায়ণা, পুরুষেরা স্ত্রৈণ, বাংলার এই সংসারগ্রন্থি। এ গ্রন্থি প্রণয়মূলক। যে যাহা বলুক, আমাদের সুখ কেবল ভালবাসা হইতে। এ ভালবাসা আর কোন জাতির ভাগ্যে ঘটে না।'

মাধবীলতা—

সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠমালা' ও 'মাধবীলতা' উপন্যাস দুটির প্রকাশ কাল যথাক্রমে ১৮৭৭ ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। দেখা যাচ্ছে, 'কণ্ঠমালা' প্রকাশিত হওয়ার ৮ বছর পরে 'মাধবীলতা' প্রকাশিত হয়। মাধবীলতা পরে প্রকাশিত হলেও এর কাহিনী কিন্তু 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসের মাধবী চরিত্রটির প্রথম জীবনের বা বাল্য জীবনের ঘটনা নিয়েই। অর্থাৎ 'মাধবীলতা'য় মাধবীর জন্ম ও কৈশোর কাহিনী আছে, আর তার পরবর্তী জীবনের কাহিনী আছে 'কণ্ঠমালা'য়। এইজন্য সঞ্জীবচন্দ্র নিজেই 'কণ্ঠমালা'র দ্বিতীয় সংস্করণের সময় ভূমিকায় পরিষ্কার

বলেছেন—'কণ্ঠমালা মাধবীলতার পরিশিষ্ট।' কারণ, মাধবীলতা বই হয়ে বেরোবার এক বছর পরে অর্থাৎ ১৮৮৬তে কণ্ঠমালার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

'মাধবীলতা' উপন্যাসের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

সিংহশত গ্রামের রাজা ইন্দ্রভূপের রাণী যমজ সন্তান প্রসব করেছিলেন। এই যমজের মধ্যে একটি কন্যা, অপরটি পুত্র। সদ্যজাত কন্যাটিকে মৃত বলে রাজবাটীর দাসী ও ধাত্রী উভয়ে মিলে সকলের অজ্ঞাতে তার সৎকারের জন্য বাড়ির বাহিরে নিয়ে যায়।

ঠিক এই সময় পিতম্ নামে এক পাগল কোথা থেকে এসে ওদের কাছ থেকে ঐ জীবিত কন্যাটিকে কেড়ে নিয়ে যায়। পিতম্ এই শিশুটিকে নিয়ে এক ব্রাহ্মণীর সদ্যজাত এক মৃত শিশুকে সরিয়ে তার জায়গায় রেখে আসে।

ব্রাহ্মণী এই শিশুকেই নিজের কন্যা ভেবে লালন-পালন করতে থাকে এবং নাম রাখে পুঁটু। পুঁটু আদর যত্নে বড় হতে লাগল। ক্রমে সে বালিকায় পরিণত হ'ল।

রাজা ইন্দ্রভূপ একদিন বেড়াতে বেরিয়ে পথে বালিকা পুঁটুকে দেখে খুব আদর করলেন। পরে একদিন পুঁটুকে নিজের বাড়িতেও নিয়ে গেলেন।

ব্রাহ্মণীর প্রতিবেশীদের কেউ কেউ রাজার সঙ্গে ব্রাহ্মণীর একটা অসৎ সম্পর্ক খাড়া করে প্রচার করতে আরম্ভ করল।

শুদ্ধচরিত্রা ব্রাহ্মণী এই মিথ্যা রটনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এক রাত্রে পুঁটুকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হ'ল। পরে এক অগ্নিকাণ্ডে পুঁটু বেঁচে গেলেও, ব্রাহ্মণী মারা গেল। ঐ পুঁটুই হ'ল মাধবীলতা। পুঁটুকে অগ্নিকাণ্ড থেকে উদ্ধার করেছিল পিতম্ পাগল। সেই থেকে বালিকা পুঁটু পিতমের কাছেই থাকে।

মাধবীলতা উপন্যাসের মধ্যেকার অপর কাহিনীটি হ'ল এই—রাজা ইন্দ্রভূপের ভগ্নী জ্যোৎস্নাবতীর স্বামী ছিলেন রাজকুমার বিজয়রাজ।

বিজয়রাজ একবার এক ডাকাত দল ধরতে গিয়ে সেই দলের একজনকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হঠাৎ হত্যা করে বসেন। এই হত্যাকাণ্ডের অনুতাপে বিজয়রাজের কিছুটা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং একদিন তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

বেশ কিছুকাল পরে বিজয়রাজ ফিরে এলে রাজবাড়ির দেওয়ান ষড়যন্ত্র

করে তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দিল না, উল্টে প্রচার করল বিজয়রাজ অনেক আগেই মারা গেছেন।

বিজয়রাজ নিরুদ্দেশ হলে জ্যোৎস্নাবতী সিংহশত গ্রামে তার দাদার বাড়িতে এসে থাকত।

বিজয়রাজ পাগল সেজে সিংহশত গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। লোকে তাঁকে পিতম পাগল বলত। লোকে তাঁকে পাগল বললেও, তিনি পাগল ছিলেন না। অনেক সময় অনেক ভাল কথাও বলতেন।

ইন্দ্রভূপের সদ্যজাত কন্যাকে বাড়ির দাসী ও ধাত্রী যখন গোপনে বাড়ির বাইরে নিয়ে যায়, তখন এই পিতম পাগলই শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তাই তিনি পুঁটুর সমস্ত কাহিনীই জানতেন।

এদিকে ইন্দ্রভূপের স্ত্রী একদিন জ্যোৎস্নাবতীকে অকারণ তিরস্কার করলে, জ্যোৎস্নাবতী একজন দাসীকে সঙ্গে নিয়ে ভাইয়ের বাড়ি ছেড়ে চলে আসে এবং অন্য জায়গায় বাস করতে থাকে পরে জ্যোৎস্নাবতীর এই দাসী মাতঙ্গিনীর সাহায্যেই একদিন ঘটনাচক্রে জ্যোৎস্নাবতীর সঙ্গে তার স্বামী পিতম পাগল বা বিজয়রাজের মিলন হয়। কিন্তু তারা আর রাজপুরীতে না গিয়ে ভিক্ষুকের বেশেই পথে বেরিয়ে পড়ে।

চূড়াধন নামে রাজা ইন্দ্রভূপের একজন জ্ঞাতি ভাইপো ছিল। সে ছিল খল ও অতি বড় শয়তান। ইন্দ্রভূপের দেওয়ান চূড়াধনের শয়তানীর কথা জানতো এবং রাজাকে সাবধানও করে দিত। কিন্তু চতুর চূড়াধন রাণীকে হাত করে দেওয়ানের পদচ্যুতি ঘটায়, এমন কি রাজা ইন্দ্রভূপও রাজ্য ছেড়ে চলে যান। তখন চূড়াধনই রাণীর বিশ্বাসপাত্র হয়ে রাজকার্য চালাতে থাকে।

'মাধবীলতা'র রাজকুমার বিজয়রাজের নিরুদ্দেশ হওয়া, রাজ্যের দেওয়ান কর্তৃক মিথ্যা করে বিজয়রাজকে মৃত বলে ঘোষণা করা, পরে বিজয়রাজের প্রত্যাবর্তন, কিন্তু দেওয়ানের চক্রান্তে রাজপুরীতে বিজয়রাজের স্থান না হওয়া, শেষে রাজার পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা—এ সবই সঞ্জীবচন্দ্রের বিখ্যাত বই 'জাল প্রতাপচাঁদে'র কাহিনীর কথা স্মরণ করায়। কারণ, বর্ধমান রাজকুমার প্রতাপ-চাঁদের জীবনেও এই রকম অবস্থাই ঘটেছিল।

জাল প্রতাপচাঁদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। এর আগে এটি ধারাবাহিক ভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু জাল প্রতাপচাঁদ

লেখার অনেক আগে ১২৮৫-র কার্তিক মাস (১৮৭৮ খ্রীঃ) থেকে সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক ভাবে 'মাধবীলতা' লিখতে শুরু করেন। তিনি হয়ত তখন 'জাল প্রতাপচাঁদ' লেখার কথা চিন্তা করেন নি। তাই তাঁর প্রথম জীবনে বিস্তৃত ভাবে শোনা জাল প্রতাপচাঁদের কিছু কাহিনী 'মাধবীলতা'য় দিয়ে ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ১২৮৫ সালের কার্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, ১২৮৭ সালের আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ, এবং ১২৮৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'মাধবীলতা' প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১২৮৬ সালে বঙ্গদর্শন বন্ধ ছিল।

১২৮৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় লিখেও সঞ্জীবচন্দ্র মাধবীলতা শেষ করতে পারেন নি। মাধবীলতা এইরূপ অসমাপ্ত অবস্থাতেই বঙ্গদর্শনের পাতায় পড়ে থাকে। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের বার বার তাগিদে, শেষে তাও তিন চার বছর পরে সঞ্জীবচন্দ্র মাধবীলতার বাকি অংশটা লিখে বই আকারে প্রকাশ করেন। বই করার সময় আগের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত মাধবীলতার কিছু কিছু পরিবর্তনও করেন।

কণ্ঠমালার ন্যায় মাধবীলতাতেও কিছু কিছু ঘটনা বা কাহিনী অবাস্তব ও রূপকথার ন্যায় মনে হলেও এ বই আজও পড়তে ভাল লাগে এবং বইয়ের কাহিনী পাঠক-পাঠিকাদের মনকে আকৃষ্ট করে রাখে।

গল্প উপন্যাসের দক্ষ লেখকরা অনেক সময় মূল কাহিনীর কোন একটা ঘটনা নিয়ে, তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই প্রসঙ্গত গল্প বাদে নিজের কিছু কিছু বক্তব্যও বলে থাকেন। 'মাধবীলতা'র মাঝে মাঝে কোন কোন প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের এইরূপ নিজস্ব বক্তব্য অনেক আছে। যেমন—(১) তখনকার বঙ্গ-যুবতীরা এক্ষণকার ন্যায় খর্বকেশা হন নাই, তখন সিঁন্দুরে বিষ মিশে নাই, চিনেমানের যুবতীর ন্যায় চুল টানিয়া বাঁধা ফ্যাশান হয় নাই ; কাজেই তখন এক্ষণকার মত কেবল টাক-ঢাকিতে ঘোমটার প্রয়োজন হইত না।

(২) উভয়ের হস্তে গুপ্তি, কটিদেশে ক্ষুদ্র ভোজালি, ওষ্ঠে রোম। শেষ পরিচয়টি সর্বাপেক্ষা ভয়ানক। তৎকালে বাঙ্গালী গুম্ফ বা শ্মশ্রু রাখিত না। বাঙ্গালী তখন নম্র, শান্ত, ধর্মভীত। তখন গোঁপ রাখিলে বিপরীত বুঝাইত। যে গোঁপ রাখিল, সে প্রকাশ্যরূপে জানাইল যে, আমি রাজা মানি না, সমাজ মানি না। এই জন্য এক সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজারা গোঁপ দেখিলেই কঠিন

দণ্ড দিতেন। অনেক দিন পর্যন্ত গোঁপ সাহসের পরিচায়ক ছিল। এইজন্য প্রথমে লাঠিয়ালেরা গোঁপ রাখিত। পরে গৃহরক্ষকেরা রাখে। তাহার পর সাহসিক যুবকরা সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে। এখন সকলেই রাখে। গোঁপ আর সাহসব্যঞ্জক নহে।

রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন—তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত।

সঞ্জীবচন্দ্র এই যে বৈঠকী গল্প বলায়, একরূপ রাজার মত ছিলেন, তাঁর সেই-রূপ বলা এক একটা মজার গল্প 'মাধবীলতা'য়ও এসে গেছে। যেমন—

'পিতম্ এক বৃদ্ধ দ্বারপালের দিকে চাহিয়া বলিল,—এক বড় আজব ঘটনা-ক্রমে আমি এই সিদ্ধি পাইয়াছি। কয়েক দিন হইল, আমি কৈলাসপর্বতের নিকটে গিয়াছিলাম। তখন সূর্যদেব হেলিয়া পড়িয়াছেন। দূর হইতে কৈলাস দেখিতে লাগিলাম; একদিকে রুদ্রাক্ষ বন। মেঘের কোলে সেই রুদ্রাক্ষ বনের কত বাহার! আমি তাহা দেখিতেছি, এমত সময় মহামায়া জগজ্জননী গণ-পতিকে গদিতে লইয়া এক আশ্চর্য সিংহের উপর আসওয়ার হয়ে বন হইতে বাহির হইলেন। সে সিংহের যে দেমাক, তাহা আর কি বলিব! তাহাতে আসওয়ার হয়ে ছোকরা গণপতি কতই খুশী, মা'র গদি হইতে হেলিয়া পড়িয়া সিংহের জটা ধরিয়া টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। সিংহ ভয় দেখাইবার নিমিত্ত হুঙ্কার ছাড়িল। কৈলাস পর্বত অমনি কাঁপিয়া উঠিল। গণপতি আহ্লাদে নাচিয়া উঠিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা ছুঁড়িতে লাগিলেন, সকল অলঙ্কার বাজিয়া উঠিল। গনেশ-জননী সন্তানের শুঁড় ধরিয়া মুখ চুম্বন করিলেন।

এদিকে কার্তিকেয় মা'র সঙ্গে সিংহে চড়িতে পান নাই বলিয়া ধুলায় গড়া-গড়ি দিতে ছিলেন। ভৃঙ্গী সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, উঠিতে পারিল না। আর একজন গিয়া মহাদেবকে ডাকিয়া আনিল।

পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া কার্তিকেয় আরও গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মহাদেব পুরঃ চক্ষুতে চাহিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—আইস বৎস, আমরা দুইজনে বৃষবাহনে যাই। বৃষ কেমন মণিমাণিক্যে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সিংহের ত কোন অলঙ্কার নাই।—এই বলিয়া ষাঁড়ের শৃঙ্গের গায়ে ত্রিশূল হেলাইয়া আস্তরণ ঝাড়িতে লাগিলেন। ছোকরা কার্তিকের মৃত্তিকা হইতে উঠিয়া বজ্রবেগে গিয়া বৃষকে এক ধাক্কা

মারিলেন। তাহার সকল কিঙ্কিনী ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। কিন্তু বৃষ একটুও হেলিল না, কেবল মস্তক নত করিয়া দিল। কার্তিকেয় ষাঁড়ের কপাল হইতে হীরার ধুক্‌ধুকি ছিঁড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর নন্দীর ঘরে পিতার নিত্যসেবার যে সিদ্ধির ছালা ছিল, তাহা পর্বতের নিম্নে ফেলিয়া দিলেন। তাহা হইতে আমি কতক কুড়াইয়া লইয়া এই ঝুলিতে রাখিয়া ছিলাম।—এই বলিয়া পিতম্ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।

দ্বারবানেরা জানিত, পিতম্ সিদ্ধপুরুষ। সুতরাং এরূপ ঘটনা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে বলিয়া স্বীকার করিল।'

সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণিত শিবের সংসারের এই চিত্রটি—সিংহ, বৃষ বাদে কোন এক পরিবারের মাতা পিতা ও তাদের পুত্রদের, বিশেষ করে এক জেদী ও বায়নাটে পুত্রের, একটা নিখুঁত ছবি বলে মনে হয়।

দামিনী—

সঞ্জীবচন্দ্রের 'দামিনী' গল্পটি তাঁর সম্পাদিত 'ভ্রমর' পত্রিকায় ১২৮১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রথমেই প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পের সঙ্গে লেখক হিসাবে কারও নাম ছিল না।

গল্পের সংক্ষিপ্ত সার হল—দামিনী বিবাহিতা হিন্দু যুবতী। তার স্বামীর অবর্তমানে সে একদিন এক মুসলমান কর্তৃক অপহৃতা হয়। কিন্তু অপহৃতা হওয়ার অল্প পরেই সে তার সতীত্ব ধর্ম বজায় রেখেই কোন উপায়ে শ্বশুরালয়ে ফিরে আসে। ফিরে এলেও সে তার সংশাশুড়ী, শ্বশুর ও প্রতিবেশীদের কাছে পরিত্যক্তা হল।

সঞ্জীবচন্দ্র নারী-দরদী হিসাবে হিন্দু সমাজের এই ত্রুটির দিকটাই এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

এই গল্পে হিন্দুসমাজে সংশাশুড়ীর কুটীল চরিত্র এবং প্রতিবেশীদেরও কথাবার্তা ও আচার-আচরণ সঞ্জীবচন্দ্রের তুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গল্পের শেষে দামিনীর পাগলি মা কর্তৃক দামিনীর স্বামী রমেশকে গলা টিপে হত্যা করার দৃশ্যটা অনেকটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

সমাজের ভয়ে দামিনীকে নিয়ে ঘর করা রমেশের পক্ষে আর সম্ভব নয়, এই ভেবেই হয়ত সঞ্জীবচন্দ্র রোগে দামিনীর মৃত্যু এবং ঐভাবে রমেশেরও মৃত্যু দেখিয়ে গল্প শেষ করেছেন।

পালামৌ—

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' ভ্রমণ কাহিনীটি প্রথমে তাঁর নিজের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ১২৮৭ সালের পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায়, ১২৮৮ সালের আষাঢ়, শ্রাবণ ও আশ্বিন সংখ্যায় এবং ১২৮৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখার সঙ্গে লেখক হিসাবে নাম ছিল—প্র. না. ব।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে বলেছেন, সঞ্জীবচন্দ্র প্রমথনাথ বসু এই কাল্পনিক নামের আত্মক্ষর নিয়ে প্র না ব এই ছদ্ম নামে 'পালামৌ' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। এই ছদ্মনাম নিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রকে 'পালামৌ' লিখতে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে দেখেছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর চার বছর পরে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে উদ্যোগী হয়ে 'দামিনী' ও 'পালামৌ' রচনা দুটি নিয়ে, ঐ সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের আগে পুস্তকাকারে প্রকাশিত, অথচ তখন নিঃশেষিত 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' গল্প, আর নিজের লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের একটি ছোট জীবনী দিয়ে—সর্ব সমেত এই চারটি রচনা দিয়ে 'সঞ্জীবনী সুধা' নামে একটি বই করে দেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'পালামৌ'কে সঞ্জীবনী সুধার অন্তর্ভুক্ত করার সময় পালামৌ-এর শেষ কিস্তির অর্থাৎ ৬ষ্ঠ কিস্তির লেখাটি বাদ দিয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'পালামৌ সঞ্জীবের রচিত একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ইহাতে সৌন্দর্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু পড়িতে পড়িতে প্রতি পদে মনে হয় লেখক যথোচিত যত্ন সহকারে লেখেন নাই। ইহার রচনার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে আলস্য ও অবহেলা জড়িত আছে।'

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর পালামৌ ভ্রমণের দীর্ঘকাল পরে 'পালামৌ' নামক এই ভ্রমণ বৃত্তান্তটি লেখেন। তাও এক সঙ্গে না লিখে বিভিন্ন সময়ে একটু একটু করে লিখে নিজের সম্পাদিত কাগজে প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন—পালামৌ রচনায় সঞ্জীবচন্দ্রের আলস্য ও অবহেলা জড়িত ছিল—এ কথার প্রমাণ মেলে সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ-এর রচনা ও কাগজে তার প্রকাশ কালের দিকে তাকালেই।

রবীন্দ্রনাথ আর একটা কথা বলেছেন—পালামৌ ভ্রমণ কাহিনীতে প্রসঙ্গত এমন কিছু কিছু কথা এসে গেছে, যা লেখায় রসের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে. অথচ অনায়াসেই সেগুলো বাদ দেওয়া যেত।

পালামৌ-এর প্রথম দিকের লেখায় এই প্রসঙ্গত অতিরিক্ত কথা নেই বললেই চলে। শেষের দিকের লেখাতেই এটা লক্ষ্য করা যায়। তার কারণ, সঞ্জীবচন্দ্র ঐ সময় ঋণের দায়ে মামলায় পড়ে মহাবিপন্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। ফলে তখন তাঁর মানসিক সুস্থিরতাও ছিল না।

সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর চার বছর পরে পালামৌ ভ্রমণ কাহিনীকে বঙ্গদর্শন থেকে নিয়ে বই করার সময় এই জন্যই বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্র পালামৌ-এর প্রথম পাঁচ কিস্তির লেখায় হাত না দিলেও, শেষের কিস্তির অর্থাৎ ষষ্ঠ কিস্তির লেখা যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা সম্পূর্ণই বাদ দিয়েছিলেন। এই শেষ কিস্তির লেখায় মূলত ছিল—পালামৌ-এর প্রধান আওলাত মৌয়া গাছ, মৌয়ার ফুল এবং মৌয়া ফুলের মদ নিয়েই কয়েকটা কথা।

গভীর মানসিক অস্থিরতার মধ্যে বসে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের এই পালামৌ ভ্রমণ কাহিনীতে একটু আধটু অতি কথন বা ঐ ধরণের সামান্য কোন ত্রুটি থাকলেও, সঞ্জীবচন্দ্রের এই পালামৌ আজও বাংলা সাহিত্যে একটি অনবদ্য রচনা। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—পালামৌ ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটি অকৃত্রিম সজাগ অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে, এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে লিখেছেন—'ভ্রাতৃস্নেহ-সুলভ পক্ষপাতের পরিবাদ ভয়ে তাঁহার (সঞ্জীবচন্দ্রের) গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ করিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ও আমার পরম সুহৃদ বিখ্যাত সমালোচক বাবু চন্দ্রনাথ বসু এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে ও পাঠকবর্গকে বাধিত করিয়াছেন।'

চন্দ্রনাথ বসুর সেই সমালোচনার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

'এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে হইলে প্রায় সকলেই যতদূর সম্ভব সোজা গিয়া থাকে। যেখানে না দাঁড়াইলে চলে না কেবল সেইখানে এক একবার দাঁড়ায়। কিন্তু সঞ্জীববাবু তেমন করিয়া পথে চলেন না। তিনি যাইতে যাইতে প্রায়ই দাঁড়ান, একটা গাছ দেখিবার জন্য, একটা লতা দেখিবার জন্য, একটা ফুল দেখিবার জন্য, একটা পাখী দেখিবার জন্য, একটা ঘাস দেখিবার জন্য প্রায়ই দাঁড়ান। কখন বা পথ ছাড়িয়া একটু এদিকে একটু ওদিকেও যান। এইরূপ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, এদিক ওদিক করিয়া এটি সেটি দেখিতে

দেখিতে যাইতে তিনি বড় ভালবাসেন। তাঁহার কণ্ঠমালা ও মাধবীলতাতে তাঁহাকে এইরূপে চলা-ফেরা করিতে দেখিতে পাই। এ প্রণালীর দোষ গুণ দুই আছে। কিন্তু দোষগুণে এই যে একটি প্রণালী, বোধ হয় বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহা একা সঞ্জীববাবুরই প্রণালী, আর কাহারও নয়। সঞ্জীববাবুর যথেষ্ট নিজত্ব (originality) আছে।

এ প্রণালীর দোষ কিছু আছে। যে বেশী থামিয়া থামিয়া এটি সেটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে দেখিতে যায়, সকলের তাহার সহিত যাইতে ভাল লাগে না, অনেকে তাহার সঙ্গে অধিকদূর যাইতে পারেও না। কিন্তু কণ্ঠমালা ও মাধবীলতাতে এ দোষের পরিমাণ যতই থাকুক, পালামৌতে ইহা নাই বলিলেই হয়। পালামৌও এই প্রণালীতে লিখিত, কিন্তু উপন্যাস না হইয়াও পালামৌ উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় মিষ্ট বোধ হয়। পালামৌ-এর ন্যায় ভ্রমণ কাহিনী বাঙ্গলা সাহিত্যে আর নাই··।

এ প্রণালীর অর্থ—সচরাচর লোকে যাহা দেখে না, বা যেরূপে দেখে না, তাহাই দেখা বা সেইরূপে দেখা। সচরাচর লোকে যাহা দেখে না বা যেরূপে দেখে না, সঞ্জীব তাহা দেখিতে এবং সেইরূপে দেখিতেই ভালবাসিতেন; এবং তাহা সেইরূপে দেখিবার শক্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল।···

আর এমনি করিয়া দেখাও যেমন সঞ্জীববাবুর ধাত, সঞ্জীববাবুর ভাষাও তেমনি সঞ্জীববাবুর ধাত। তাঁহার ন্যায় সরল ভাষা বাঙ্গলা সাহিত্যে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা বালকের কথার ন্যায় সহজ, সরল, মিষ্ট, কারুকার্যহীন। আর এই যে বালকের ন্যায় ভাষা, সঞ্জীব ইহাতে তাঁহার সামান্য সামান্য কথাও যেমন লিখিয়াছেন, তাঁহার বড় বড় কথাও তেমনি লিখিয়াছেন।···

কণ্ঠমালা ও মাধবীলতা যে প্রণালীতে লিখিত, দামিনী ও রামেশ্বরের অদৃষ্ট সে প্রণালীতে লিখিত নয়। শেষোক্ত দুইটিই অতি ক্ষুদ্র গল্প, অতএব কোনটিতেই কণ্ঠমালা বা মাধবীলতার প্রণালী খাটিত না। এই দুইটি ক্ষুদ্র গল্পে সঞ্জীববাবুর বেশ ত্বরিতগতি দেখা যায়, স্থানে স্থানে তাঁহার স্বাভাবিক মৃদুতার পরিবর্তে বিলক্ষণ আবেগ ও উদ্দামভাবও পরিলক্ষিত হয়।···'

সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত গান

বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের স্নেহভাজন 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার সাহিত্যসেবা এবং দেশসেবার কাজ ছাড়া নাটক অভিনয়ের ব্যাপারেও খুব উৎসাহী ছিলেন। তাঁর প্রযোজনায় ও পরিচালনায় চুঁচুড়ায় তাঁর বাড়ির আশে পাশে বহুবার বহু নাটকের অভিনয় হয়েছে। একবার দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'পিতাপুত্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

'পিতা যখন যশোহরে তখনই 'বঙ্গদর্শন' প্রচারিত হয়, 'সাধারণী' প্রকাশিত হয়। ··পিতার যশোহরে থাকার সময়ের মধ্যে আরও দুই চারটি ঘটনা হয়। তাহার মধ্যে একটির সাহিত্যের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখযোগ্য, দীনবন্ধু প্রণীত 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয়। বঙ্কিমবাবুতে আমাতে লীলাবতীর একরূপ পরিবর্তন করি।···টুকরা-টাকরা পরিবর্তন বিস্তর করা হইয়াছিল।

দীনবন্ধুবাবু প্রথমে কি কাটা হইয়াছে, না হইয়াছে, না জানিয়া বলিয়াছিলেন—এক একটি শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে। তবে বঙ্কিম ভাই, আর অক্ষয় ছেলে—ইহাদের ভালবাসি বলিয়া আমার শরীরে জ্বালা লাগে নাই।

এই অভিনয় রঙ্গে ৭।৮টি গান ছিল। দুই একটি আমার কৃত, আর অনেকগুলি সঞ্জীববাবুর রচিত। তাহার একটি উল্লেখ করা আবশ্যক, এক সময়ে এই গানটি আমি বৈদ্যনাথ, বহরমপুর, নাটোর, কলিকাতা এবং আমাদের অঞ্চলে সমানে গাহিতে শুনিয়াছি।

পিলু যৎ

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার,
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার।
যত পেলে আঁখি-জল. তত সে হ'ল প্রবল,
এখন লতা-ভরে তরু মরে, কে করে বিহিত তার?'

এরপর অক্ষয়চন্দ্র এই প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন, অভিনয় রজনীতে স্বয়ং

দীনবন্ধু, নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং নাট্যাভিনয় দেখে প্রশংসা করেছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের এই লেখা থেকে একটা কথা ভালভাবে জানা গেল যে, সঞ্জীবচন্দ্র গান রচনা করতেও পারতেন। সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত সেই গান নিয়েই এখন কিছু আলোচনা করছি—

কাঁটালপাড়ায় 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় একটি খামের মধ্যে একটি অতি ছিন্ন ও জীর্ণ ছোট্ট খাতা আছে। এতে কয়েকটা গান রয়েছে। খাতায় গানের রচয়িতার কোন নাম নেই। শুধু খামের উপরে বড় বড় করে লেখা রয়েছে—ঠাকুরদাদার লিখিত কীর্তন গানের বহি।

ঠাকুরদাদা এবং তাঁর এই নাতি, কারও নাম খাতায় না থাকলেও ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ হিসাবে আমি জানি, খামের উপরের লেখাটি সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শতঞ্জীবচন্দ্রের। শতঞ্জীববাবু তাঁর পিতামহের স্বহস্ত লিখিত এই গানের খাতাটি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন এবং পরে তিনি অনেক জিনিসের সঙ্গে এই খাতাটিও ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় দান করেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের যে লেখা আগে উদ্ধৃত করেছি, তাতে যে, 'আগে যদি জানিতাম…' গানটির কথা আছে, সেই গানটিও শতঞ্জীববাবুর প্রদত্ত ঐ খাতায় রয়েছে। তবে পাণ্ডুলিপিতে শেষ পংক্তির শেষটা—'কে করে বিহিত তার' এর জায়গায় রয়েছে 'কে করে উদ্ধার'।

দেখছি, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসেও এক জায়গায় এই গানটি ব্যবহার করেছেন। সেখানেও তিনি এই গানের শেষটা আবার পরিবর্তন করে 'কে করে প্রতিকার' লিখেছিলেন।

'কণ্ঠমালা'য় এই 'আগে যদি জানিতাম'… গানটির সঙ্গে আর একটি গান আছে। সেই গানটি এই—

প্রণয় আমার সাগর-তল, সে কি অনাদরে শুকাবার।
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি॰ না তাতয়ে সাগর মাঝার।
সখি! কত দূরে ভানু রয়. সাগর তাতে কাতর নয়।
পসারি সে অগাধ হৃদয়, তবু তারে দেয় উপহার।

এই গানটিও শতঞ্জীববাবু প্রদত্ত সঞ্জীবচন্দ্রের গানের খাতায় রয়েছে। খাতার এই পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে গানটি সামান্য একটু



অক্ষয়চন্দ্র সরকার

অন্যরকম করে লিখেছিলেন। আগেই বলেছি, খাতাটি খুবই ছিন্ন। তবুও খাতা থেকে এই গানটির যতটা উদ্ধার করতে পেরেছি, তা এখানে উদ্ধৃত করছি—

প্রণয় মোর সাগর-তল, সে কি অনাদরে শুখাবার।
বর্ষয়ে…অনল যদি, না তাতয়ে সাগর মাঝ
আমার হিয়ে সাগর সম, সে কি সহজে যায়
ভানু ধায় কত দূরে, তবু সিন্ধু মাঝে প্রা…
তেমনি নাথ মুরতি সদা বিরজিছে হৃদয়ে আমার।

পাণ্ডুলিপির এই গানের সঙ্গে 'কণ্ঠমালা'র ঐ গান মিলিয়ে দেখলে মনে হয়—পাণ্ডুলিপির গানটিই আসল গান। এই গানকে নিয়ে তিনি প্রসঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী সামান্য বদল করে কণ্ঠমালায় দিয়েছিলেন।

'কণ্ঠমালা'র এই গান দুটি ছাড়া সঞ্জীবচন্দ্রের খাতায় আর যে সব গান দেখছি, সেগুলির কোনটিই তাঁর কোনও গ্রন্থে নেই। এসব গান তিনি রচনা করেছিলেন, প্রধানত নিজের খেয়ালেই। কারণ, তিনি নিজে গান জানতেন এবং গান ভালও বাসতেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ ছিন্ন গানের খাতাটি থেকে তাঁর রচিত যে ক'টি গান উদ্ধার করতে পেরেছি, সেগুলি এখানে দিচ্ছি—

প্রবল শীতের মেঘ
না জেনে বাজের কাজ
হৃদে তারে ধরিল মণি আদরে।

উচ্চ হাসি সৌদামিনি
ফাড়িল সে হৃদিখানি
ত্যজিল তুচ্ছ করে জলধরে।

গভীর গরজি ঘন
কত কাঁদি পুনঃ পুনঃ
জানালে মরম জ্বালা সকাতরে।

*　　*　　*

অথচ জানে না তায়,
তবু ধায় না শুনে বারণ।

দেখিলে সোহাগী চাঁদে
মন যেন আরো কাঁদে
না জানি এ কিসের কারণ।

*   *   *

ফুলবালা তরু সাথে
গলাগলি করি থাকে,
বায় দোলায়ে যদি যায়।

অমনি নয়ন ঝরে
কেন কাঁদি কার তরে।
কেন এত কুসুমে জ্বালায়।

*   *   *

ধীরে ধীরে মেঘ আসি
অতি আদরে সম্ভাষি
চাঁদেরে কি যেন বলে যায়।

লাজে হাসি যে প্রেয়সী
বদন ঝাঁকিয়া
ফিরিয়া ফিরিয়া কত চায়।

*   *   *

অন্তর আঁধার যার, জনম মরণ,
কেন বিধি দিল তার মরমে চেতন।
কেন মিছে কাঁদে হৃদি, সুখের আভাষে
আঁধারে আলোক ছায়া, আঁধারি প্রকাশে

*   *   *

কাঁদিতে হইল যারে আজন্ম মরণ
আশা তারে কেন আর করে জ্বালাতন,

সুখের আভাষ পেলে
যন্ত্রণা আরও উথলে।
অভাগীর অভিমান সাথী সর্বক্ষণ।

*　　　　　*　　　　　*

আমি শ্যাম সাজিব
মুরলি বাজাব।
সকলে কাঁদাব
কাঁদিব না আর।

যাব চলি একা,
কারে দিব দেখা!
কে আছে রাধার!

পত্রাবলী

এবার সঞ্জীবচন্দ্রের কয়েকটা অপ্রকাশিত পত্র এখানে দিচ্ছি—

কাঁটালপাড়ায় 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের চারটি অপ্রকাশিত চিঠি আছে। চারটি চিঠিই ছিন্ন। তবে দুটি একটু ভাল, বাকি দুটি একেবারে শতছিন্ন। সেই চারটি চিঠিই এখানে উদ্ধৃত করছি। উদ্ধৃত করার আগে চিঠিগুলি বোঝার জন্য কয়েকটা কথা বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে সঞ্জীবচন্দ্রের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট চাকরির যে বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায়—সঞ্জীবচন্দ্র এই চাকরি পেয়ে প্রথমে কৃষ্ণনগরে যান। কৃষ্ণনগর থেকে যান পালামৌ। পালামৌ থেকে যশোহর, তারপর আলিপুর, শেষে পাবনা।

বঙ্কিমচন্দ্র এও লিখেছেন, যশোহর জায়গাটা বড় অস্বাস্থ্যকর ছিল। সেখানে সঞ্জীবচন্দ্র সপরিবারে পীড়িত হয়ে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আসেন।

সঞ্জীবচন্দ্র পাবনায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে সেখানে কিছু জমিজায়গা-সহ একটা বসত বাড়ি কেনার মনস্থ করেছিলেন। এবং পুত্র জ্যোতিশের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য তাঁকে নিজের কাছে পাবনায় নিয়ে যাবেন কিনা, সে বিষয়েও চিন্তা করেছিলেন।

এই পাবনায় থাকাকালেই সঞ্জীবচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরিতে স্থায়ী হওয়ার জন্য যে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, তাতে অকৃতকার্যতার কারণ দেখিয়ে তাঁকে এই চাকরি থেকে অপসারিত করা হয়।

এখানে পিতাকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের যে চারটি চিঠি উদ্ধৃত করছি, সেগুলি সবই পাবনা থেকে লেখা। চিঠিগুলি এই—

শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ,

কয়েক দিবস হইল এক পত্র পাইয়াছি। অদ্য আর একখানি পাইলাম। প্রত্যুত্তর লিখিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবার বিশেষ তাৎপর্য কিছুই নাই। কয়েক

দিবস সর্দি হইয়া বড় অলস করিয়াছে। পাবনা যশোহরের ন্যায় মন্দ স্থান নহে। হাওয়া ভাল। কিঞ্চিৎ সর্দির স্থান মাত্র। যে বাসা লইয়াছি ইহার ভাড়া ১৭ টাকা। ইহা ··মেরামত করিতে হইবেক। এ···৭৫ টাকা খরচ করিলে···অগত্যা তাহাই আরম্ভ করিয়াছি। এপ্রিল মাহায় পরীক্ষা দিতে যাইয়া জ্যোতিশকে আনিব। কিন্তু সে আমাকে বলিয়াছিল, গত সন রথ তাহার দেখা হয় নাই। এই সন রথ না দেখিয়া আসিবেক না। গুণো কি লক্ষ্মীর ন্যায় কোন মজবুত লোক না আসিলে জ্যোতিশকে এখানে আনিব না। অতএব গুণো···যদি কাশী যাত্রা নিতান্ত·· তবে ইত্যবসরে তাহা সম্পন্ন করিয়া আইসে। জ্যোতিশের গরু আনা হইবেক না। কেননা, আনিতে বিস্তর খরচ পড়িবেক। রাধানাথ এক্ষণে আসিবার কি প্রয়োজন? জ্যোতিশ আসিলে আত্মীয় কাহাকে আনিবার প্রয়োজন বটে, অতএব সেই সময় আনা যাইতে পারে।

ধোপা কিঞ্চিৎ দর মাহা বৃদ্ধির নিমিত্ত বলিয়াছিল। যতদিন জ্যোতিশের কাপড় কা···ততদিন আমার হি···আট আনা বেশী দর মাহা দিলে··· হইবেক।

এখানে চাউল ও মৎস্য বড় সস্তা, নতুবা সমুদয় মহার্ঘ।

এখানে ইংরাজি স্কুল আছে, কিন্তু আমার বাসা হইতে অনেক দূর। তথায় জ্যোতিশকে পড়াইতে গেলে ১৮ কি ২০ টাকা দিয়া বিহারা রাখিতে হইবেক। যদি জ্যোতিশকে আনা হয়···এক মাসের নিমিত্ত ·ককে রাখা আবশ্যক হইবে। ১লা মার্চ, রবিবার

সেবক শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র

শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ,

আমি শারীরিক ভাল আছি। ২৯শে মার্চ এখান হইতে রওনা হইব। বাসা অদ্যাপি খরিদ হয় নাই। ২০০ টাকা দর বলিয়াছে। মেটে প্রাচীর, দরমাহার বেড়া, বিস্তর আম গাছ ও বেল ও খেজুর ও জাম আছে। তৎভিন্ন একটি পুষ্করিণীও আছে। জমি আন্দাদ ১০ বিঘা, মালগুজারি ২৯ টাকা। মেরামত করিতে অন্তত পক্ষে ৮০ টাকা পড়িবেক।

কাশী যাত্রা রহিত হওয়ায় বড় আপ্যায়িত হইলাম। ইতি ২০ মার্চ।

সেবক শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র

শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ,

পূর্ব পত্রে নিবেদন...যে আগত ২৯...শনিবার বাটী যাইব।...হইল না।...পরীক্ষা দিতে...যাইবায় গোষ্ঠযাত্রা...বাটী পৌছিব, এমত স্থির করিয়াছি। নিবেদন ইতি—২৪ মার্চ ১৮৬৮

সেবক শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র

শ্রীচরণ কমলেষু,

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ,

আমি শারীরিক...বাসায় আসিয়াছি।...না করিলে ইহাতে থাকা না। মেরামত ৬০/৭০ টাকা.. না। ইহা ফাইজুন...জোর করিয়া...পালামৌ পত্র লিখিয়া...বিক্রয় করেন উত্তম, নতুবা ব্যয় করিতে...করিতে হইয়াছে এবং কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। পরিশ্রমের সীমা নেই।...

বলা বাহুল্য যে এখানে উদ্ধৃত চিঠি চারটির মধ্যেকার '   ' চিহ্নিত অংশগুলি ছিন্ন। ছিন্ন হলেও চিঠির, এমন কি শেষের চিঠি দুটিরও বিষয় বুঝতে তেমন কষ্ট হয় না।

প্রথম চিঠিতে যে রথের কথা আছে, সে রথ হ'ল সঞ্জীবচন্দ্রদের গৃহ-দেবতা রাধাবল্লভের রথ। সঞ্জীবচন্দ্ররা চার ভাই মিলে তাঁদের মায়ের নামে এই রাধবল্লভের রথ প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। সেই রথ এবং রথযাত্রা উপলক্ষে রথের ৭ দিনের মেলা আজও সঞ্জীবচন্দ্রদের কাঁটালপাড়ার বাড়ির সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় হয়ে থাকে।

তৃতীয় চিঠিতে যে গোষ্ঠযাত্রার কথা আছে, সেই গোষ্ঠ যাত্রাও রাধাবল্লভের একটি উৎসব। এই উৎসব আজও প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ তারিখে হয়।

কাঁটালপাড়ার 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় পুত্র জ্যোতিশকে লেখাও সঞ্জীবচন্দ্রের অনেক চিঠি আছে। তা থেকে কয়েকটা চিঠি আগে এই বইয়ে 'ঋণের বোঝা' অধ্যায়ে দিয়েছি। এখানে অন্য কয়েকটা চিঠি দিচ্ছি—এই চিঠিগুলিতে পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশ, তিরস্কার, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি সবই রয়েছে।

জ্যোতিশ একটু বেশি বয়সে চাকরিতে ঢুকে ছিলেন। তাঁর ছিল পুলিশ ইন্‌সপেকটরের চাকরি। তিনি চাকরি নিয়ে প্রথমে গিয়েছিলেন নদীয়া জেলার মেহেরপুর শহরে।

জ্যোতিশকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের যে চিঠিগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি প্রায় সবই হয় জ্যোতিশের চাকরি পাওয়ার অল্প দিন আগের, নয়ত চাকরি পাওয়ার পরের সময়কার। এখন জ্যোতিশকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের কিছু চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি—

প্রাণাধিকেষু,

তোমার দুই পত্র পাইয়াছি। আমার বড় জ্বর হইয়াছিল। অদ্য কাছারি আসিয়াছি। বড় ব্যস্ত। কল্য তোমার ও তোমার ঠাকুরদাদার চিঠির অনু-পূর্বিক জবাব দিব। মূল কথা আমার একেবারে ইচ্ছা নহে যে তুমি প্রথম চাকরিতে দেশের লোকের গালি খাইতে যাও। আ…র ন্যায় দুষ্কার্য আর নাই। লোকে গালি দেয়, গবরমেণ্ট গালি দেয়। তোমার ছোট কাকার সহিত এ বিষয়ে কথা কহিলে জানিতে পারিবা। তোমার ঠাকুরদাদাকে বলিবা যে ছোটবাবুর পরামর্শ লন। ইতি ১০ ডিসেম্বর।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির '…' অংশটি ছিন্ন হওয়ায়, জ্যোতিশ যে প্রথম কি চাকরি নিতে চেয়েছিলেন বা পেয়েছিলেন, তা জানা গেল না। জ্যোতিশের পুলিশ ইন্‌স-পেকটরের চাকরিটা যে নয়, সেটা ঠিক। কারণ, জ্যোতিশ এই চাকরি পেলে সঞ্জীবচন্দ্র খুশী হয়েই তখন জ্যোতিশকে চিঠি লিখেছিলেন।

জ্যোতিশ প্রথম কি চাকরি নিতে চেয়েছিলেন, আলোচ্য চিঠি থেকে সে কথা জানা না গেলেও, সঞ্জীবচন্দ্র যে গালাগালি খাওয়ার ঐ চাকরি নিতে জ্যোতিশকে নিষেধ করেছিলেন, তা থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের চরিত্রের একটা উজ্জ্বল দিকেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাণাধিকেষু,

তোমার অধ্যয়নের স্টেটমেণ্ট পাই নাই।

ডাক্তার কানাইলালবাবুর নিকট একদিন দেখা করিয়া আসিবে।

যখন কলিকাতায় গিয়া থাক, তখন সুবিধা মত রাজকৃষ্ণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বঙ্গদর্শনের কথাবার্ত্তা কহিবা। রবিবার ভিন্ন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

যদি বাবু সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ থাকে· মধ্যে গিয়া দেখা করিবে।…মত লোকের সহিত আলাপ…progress সম্ভব থ…progress সম্ভব ভ…বঙ্গদর্শনের উপর ‥তোমার গর্ভধারিণী নিত্য ঔষধ খাইতেছে কিনা লিখিবে। ঔষধ ফুরাইলে ঔষধ আনিতে ত্রুটি না হয়। ইতি ২২ ফেব্রুয়ারি—

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির '…' অংশগুলি ছিন্ন।

রাজকৃষ্ণবাবু হলেন সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইনি বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন এবং বঙ্গদর্শনে নিয়মিত লিখতেন। সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর বাড়ি ছিল কাঁটালপাড়ার অদূরে বারাকপুরের মণিরামপুরে।

জ্যোতিশ এন্‌ট্রান্স পাস করার পর দীর্ঘদিন কোন চাকরি পান নি; চাকরির জন্যই মনে হয়, সঞ্জীবচন্দ্র জ্যোতিশকে সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বলে ছিলেন।

জ্যোতিশ কর্ম্মহীন অবস্থায় বাড়িতে বসে থাকার সময় সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর উপর বঙ্গদর্শন পত্রিকা দেখাশুনার কিছুটা ভার দিয়েছিলেন। আর নিজের কর্ম্মস্থল থেকেই জ্যোতিশকে বাড়িতে বসে পড়াশুনা করবার জন্য নির্দেশ দিতেন, কি কি বই পড়বেন, তাও বলে দিতেন।

প্রাণাধিকেষু,

অদ্য তোমার এক পত্র পাইলাম। কুইনাইন পাঠাইয়াছ লিখিয়াছ, কিন্তু পত্রে কুইনাইন ছিল না। যখন কুইনাইন পাঠাইবে শিশি সদর বাটীতে আনিও না। অন্দর হইতে পুরিয়া বাঁধিয়া আনিবে। সদরে আনিলে চুরি যায়। তৎব্যতীত আবার অন্দরে পাঠাইবার নিমিত্ত লোক ডাকিতে হয়। সময়ও নষ্ট হয়।

Rollin's Ancient Historyর কত পাঠ পড়িয়াছ লিখিবে। কিরূপ কঠিন বোধ হইতেছে, তাহাও লিখিবে। তুমি প্রতি সপ্তাহে কতটা পড় তাহার

এক তালিকা সহ আমায় লিখিয়া পাঠাইবে। কদাচ অন্যথা করিও না। যে সপ্তাহে কিছুই না পড়িতে পার তাহাও আমাকে লিখিবে।…

প্রাণাধিকেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। হিসাব পাঠাও নাই। তোমার ঔষধের নিমিত্ত কদাচ তোমার ঠাকুরদাদাকে বলিবে না। সংসার খরচের যে টাকা পাঠাইব তাহা হইতে খরচ করিবে। অধিক টাকা পাঠাইতে পারিব না। মিরর আপিসে ১৬ টাকা, মেটকাফ হলে ৬ টাকা, মোট ২২ টাকা অতি অবশ্য পাঠাইতে হইবে। বাকি ৮ টাকা… ও অন্যান্য খরচে যাইবে। কাজেই ১০০ টাকার অধিক পাঠাইতে পারিব না। এবার জন্মাষ্টমীয় সময় বাটী যাইব স্থির করিয়া ছিলাম, তাহাও হইবে না।…খরচ হাতে থাকিবে না। একশত টাকা পাঠাইব…

.. সরকারী কার্য অতিশয় বাড়িয়াছে। ছুবার করিয়া কাছারি যাইতে হইতেছে। একবার…হইতে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত, আবার সাড়ে এগারটা হইতে সাড়ে ছটা পর্যন্ত। কাজেই আর আমি অন্য কিছু পড়িতে বা লিখিতে পারিতেছি না। কিন্তু বোধ হয় শীঘ্রই সাবকাশ হইতে পারে। ঘড়ির চাবি পাইয়াছি। ইতি ২৯ জুলাই ১৮৭৯।

উপরের দুটি চিঠিরই '…' অংশগুলি ছিন্ন।

সঞ্জীবচন্দ্র এই সময় যশোহরে স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন।

চিঠির 'মিরর' হ'ল ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা।

মেটকাফ হল লাইব্রেরীর-ই পরে নাম হয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী।

স্বাধীনতার পরে এই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর নাম হয়েছে ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা জাতীয় গ্রন্থাগার।

জ্যোতিশ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ নদীয়া জেলার মেহেরপুরে পুলিশ ইন্‌সপেকটরের চাকরি পান। এর কয়েক বছর আগে সঞ্জীবচন্দ্র নিজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং কাঁটালপাড়ার বাড়িতেই বসে থাকতেন। বঙ্গদর্শনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ঐ সময় সঞ্জীবচন্দ্র বাড়ি থেকে জ্যোতিশকে তাঁর চাকরির ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে যে সব চিঠি দিয়ে ছিলেন, তার কয়েকটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

প্রাণাধিকেষু,

তোমার পত্র পাইয়া চিন্তা দূর হইল। জ্বরের সংবাদ নিত্য লিখিতে ছিলে, হঠাৎ কল্য পত্র বন্ধ হওয়ায় বড়ই ভাবিত হইয়াছিলাম।

কৃষ্ণ নামক যে ব্যক্তির দ্বারা তোমার নিকট দ্রব্যাদি পাঠাইয়া ছিলাম, তাহার বাটী আলমডাঙ্গার এলাকা। পৌষ পার্বণ উপলক্ষে সে বাটী যাইতে ছিল, তাহাই উহার দ্বারা দ্রব্য পাঠাইয়াছিলাম। সে এখানে আইসে নাই, সোমবারের পূর্বে আসিবার কথাও নহে। সে এখানে আসিবে নিশ্চয়, কেননা সে এখানে খাটিয়া খায়। কাহার কাহার নিকট তাহার পাওনাও আছে। তাহাকে আমি ৯ই জানুয়ারি পাঠাই নাই, ১০ই জানুয়ারি পাঠাইয়া ছিলাম। পত্রে তারিখ লিখিতে আমার ভুল হয়, এই জন্য বারও লিখিয়া দিয়া থাকি। পত্রে মঙ্গলবার লিখিয়া ছিলাম, পঞ্জিকা দেখিলাম মঙ্গলবার ১০ই ছিল। সুতরাং সে ১১ই পৌছিয়াছে। তাহার জলপানি, পারানি সকলই দিয়াছিলাম। তবে যে সে কেন সাড়ে চারি আনা লইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় মোটটা গাড়ি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাই এই অতিরিক্ত খরচ পড়িয়াছে। সে ব্যক্তি জুয়াচোর নহে, ভাল মানুষ। তবে পাছে তাহার বাটী যাইবার ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়ে সে তোমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছে।

তেহাটা এলাকায় গিয়া যে লাস তদারক করার পরিচয় লিখিয়াছ, তাহা অতি ভয়ানক। কিন্তু তথাকার সাব ইন্‌সপেকটর লাস ময়না করিয়া পোষ্টমর্টম একজামিন জন্য পূর্বে পাঠায় নাই কেন? চারিদিন ফেলিয়া রাখায় লাস পচিয়া গিয়াছিল। পোষ্টমর্টম একজামিনেশন তা আর হইবে না। তবে এখনকার প্রথা কি, বিধি কি তাহা জানি না। তোমার ঐ পচা লাস দেখিয়া যত ঘৃণা হইয়াছিল, সকলের তত হয় না। ডাক্তারবাবুরা যাঁহারা আমাদের সঙ্গে স্যেক হ্যাণ্ড করেন, একত্রে বসেন, আহার করেন অথবা আহার করান, তাঁহারা ঐ পচা মড়া কেবল দেখেন এমন নহে, দুই হাতে ঘাঁটেন। সকলই অভ্যাসের কার্য। ডাক্তারদের নিকট শুনিয়াছি যে, মেডিকেল কলেজে নাম লেখাইয়া অনেকে প্রথম প্রথম 'ডেড হাউসে' প্রবেশ করিতে সাহস করে না। টেবিলে

লাস কতকগুলো পড়িয়া আছে দেখিয়া দ্বার হইতে পলায়ন করে। তাহার পর ক্রমে ঘরে প্রবেশ করে, মৃতকায় স্পর্শ করে, তাহার পর শৃগাল কুকুরের ন্যায় মড়া টানাটানি করে অর্থাৎ they quarrel with each other for their 'subject' which is generally a part of the body—a limp for instance, in which subject they are to be lectured on the next morning.

এখন পুলিশ স্বতন্ত্র হওয়ায় কেবল তোমাদেরই এই কষ্ট পাইতে হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগণ অব্যাহতি পাইয়াছেন। পূর্বে তোমার ন্যায় কষ্ট সাবেক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা পাইতেন। আমাদের পরম বন্ধু শ্রীনাথ ঘোষ গল্প করিতেন যে, তিনি যখন উড়িষ্যার ভদ্রকে থাকিতেন, তাঁহার মাতা শ্রীক্ষেত্র যাইবার উপলক্ষে তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। সেই সময় এক পচা লাস তাঁহার কুঠিতে চালান আসিল। পচা গন্ধে কম্‌পাউণ্ড ভরিয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা জানলায় জানলায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মাছি সেই জানলার পথ দিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। শ্রীনাথ বাহিরে গিয়া দেখেন—পচা মড়া। তাহা তাহাকে ময়না করিতে হইল। তাঁহার মাতা এই ব্যাপার জানিয়া চাকরি ছাড়িবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। কুঠিতে তুলসী দিলেন।

তুমি প্রথমেই পচা মড়া দেখিয়াছ, তাহাই তোমার এত যন্ত্রণা হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে দেখিলে এত ভয় হইত না। উহা ভয় নহে নারভাসনেস, আর অনভ্যস্ত কুদৃশ্য দর্শনজনিত ঘৃণা। কখন মন্দ জিনিস দেখ নাই, তাহাই এত যন্ত্রণা হইয়াছিল। মাঠে ঘাটে পচা গরু, পচা কুকুর দেখিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা সামান্য ক্ষণের নিমিত্ত। তাহাও দূর হইতে দেখিয়াছ। বিশেষত সে দেখা ইচ্ছাধীন। দেখিতে ইচ্ছা না হইলে না দেখিতে পার। তাহাই তাহাতে এত ঘৃণা হয় না। ইহার কথা স্বতন্ত্র। তুমি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছ, তাহাতে আমারই যন্ত্রণা হইয়াছিল। না জানি তোমারই কত যন্ত্রণা হইয়া থাকিবে। এই যন্ত্রণা পাইয়াও যে তুমি তোমার কর্তব্য কার্যের ত্রুটি কর নাই, এই আমার পরম সুখ।

ভয় পইেও না। ভয় থাকিবে না। যে স্পিরিচুয়াল ইন্‌টারফিয়ারেন্স দ্বারা তুমি চাকরি পাইয়াছ, সেই সোর্স হইতে তোমার এই সকল শিক্ষা ও অভ্যাস আরম্ভ হইয়াছে। তোমার ছোট কাকার বিদেশে যাওয়া এইরূপ ইন্‌টারফিয়ারেন্স। কাঁটালপাড়া ছাড়িয়া তিনি কখনই বিদেশে যাইতে পারিবেন না.

তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল। সর্বদাই তাঁহার রুগ্ন দেহ, বৈঠকখানায় পড়িয়া থাকিতেন। এক মুখ নিষ্টিবন্ আর কর্ণের পুঁজ বাহির করিবার জন্য হস্তে কাগজের পলিতা থাকিত। রঙ্গপুর দিনাজপুরে গিয়া লোকে কিরূপে বাঁচে ইহা সর্বদাই বলিতেন। যে স্পিরিচুয়াল ইন্টারফিয়ারেন্স দ্বারা তাঁহার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি হইল, সেই ইন্টারফিয়ারেন্স দ্বারা তাঁহাকে কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া এ পর্যন্ত থাকিতে হইয়াছে। এখন তাঁহার শরীর স্বচ্ছন্দ, যেখানে গবর্ণমেণ্ট পাঠায় সেইখানে যান, বিদেশে আর তাঁহার ভয় নাই। তোমারও সেই শিক্ষা হইতেছে। যাহাতে তোমার বিশেষ ভয়, তাহাই ঘটাইয়া তোমায় ভয় ভাঙ্গা করা হইতেছে। তুমি রাত্রিতে বৈঠকখানা হইতে অন্দরে যাইতে সর্প ভয়ে লণ্ঠন ধরিয়া যাইতে। এখন তোমায় একা অন্ধকারে জেল দেখিতে যাইতে হয়। পীড়ার সময় সামান্যতে ভয় পাইতে, আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে, এখন তোমার নিকট পীড়ার সময় কে থাকে? দুই একজন বিদেশী। এইরূপ তোমার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। তাহাই বলিতে ছিলাম ভয় পাইও না, ভয় থাকিবে না।

অ্যাডমিনিসট্রেশন রির্পোটে তোমার সুখ্যাতির কথা বিশেষ রূপ আছে দেখিয়া বড় তৃপ্তি লাভ করিলাম। তুমি সর্বদা থানা তদারক কর নাই বলিয়া একটু অখ্যাতি লিখিয়াছে। আর বোধ হয়, তুমি ঘোড়ায় যাতায়াত কর না, একথা সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু what works he performs is unusually good এই রিমার্ক সত্য সত্যই আশার অতীত। unusually good লিখিতে গেলে হয়ত তোমার পক্ষপাতী বলিয়া উপরওয়ালার সন্দেহ হইতে পারে, এই জন্য একটু নিরপেক্ষতা দেখান হইয়া থাকিবে। সে যাহাই হউক তুমি এই দুই মাস বিশেষ মনোযোগী হইয়া সকল থানাগুলি দেখিয়া বেড়াও, তাহা হইলে সকল দোষ খণ্ডিবে। অ্যাডমিনিস্‌ট্রেশন রির্পোট সম্বন্ধে বঙ্কিমকে মঙ্গলবার দিন গিয়া দেখাইব। তিনি যাহা বলেন পরে লিখিব। ইতি ১৪ জানুয়ারি, শনিবার।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রাণাধিকেষু,

চাকরি স্থান মনের মত হয় না।...তুমি সুন্দর স্থান পাইয়াছ। এরূপ লোকে পায় না। সর্প ভয় কোথায় না আছে? দুই মাস কি এক মাস পরে

সে ভয় একেবারে থাকিবে না। ব্যাঘ্র ভয় গ্রাহ্যের মধ্যেই নহে। কয়টা ভদ্রলোককে বাঘে লইয়াছে? তুমি কখন মাতৃক্রোড় ছাড় নাই, তাহাই ভয় পাইয়াছ। দুই তিন মাস পরে দেখিবে তোমার কোন ভয় থাকিবে না। তোমার ভয় তোমার Subordinateরা জানিতে না পারে, জানিলে তাহারা advantage লইবে ও তোমার prestige যাইবে।···

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রাণাধিকেষু,

···যেখানেই যাও ভয় ভূতা আছেই, তাহাতে ভয় পাইও না। যিনি অভাবনীয় কৌশলে তোমায় চাকরি দেওয়াইয়াছেন, তিনি অচিন্ত্যনীয় কৌশলে তোমায় রক্ষা করিবেন। তিনি এখন তোমার সহায়, কাজেই এখন তোমার ভাবনা করিবার কারণ নাই। তোমার বড় ভয়. এই জন্য তোমায় কোন ভয়ানক স্থানে লইয়া গিয়াছেন। সেইখানে তোমার ভয় ছাড়াইবেন। তোমার ছোট কাকার বড় ভয় ছিল। কাঁটালপাড়ার বাহিরে এক দিনের জন্য বাস করিতে তাঁহার সাহস হইত না। তাহার পর যখন উপরের লিখিত unknown mysterious agency তোমার ছোট কাকার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, তখন এক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি দিয়া তোমার ছোট কাকাকে দিনাজপুর রঙ্গপুর লইয়া গিয়া এরূপ train up করিলেন যে, আর পূর্ণ কাঁটালপাড়ার নাম করে না। যেখানে সেখানে পরিবার লইয়া থাকে।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তমেষু,

তোমার পত্র পাইলাম। কুষ্টিয়া তোমায় যাইতে হইবে বুঝিতেছি। ওজর করিলে কিছু হইবে না। লাভের মধ্যে ওজর করিলে সাহেব বিরক্ত হইবে এবং তাহার ধারণা থাকিবে লোকটা বড় ওজরি। এই জন্য ঈশ্বরবাবু তোমায় উপদেশ দিয়াছিলেন never contradict nor controvert. ছোট মহকুমা হউক, বা বড় মহকুমা হউক উভয়ের মধ্যে কেবল পরিশ্রমের প্রভেদ। নতুবা কার্যের জাতি একই প্রকার। এখন পরিশ্রম করিতে কেনই ভয় পাইবে। অতএব কুষ্টিয়া স্বচ্ছন্দে যাইবে। মেহেরপুর অতি কুস্থান আমি বিশেষ জানি। রাসবিহারীবাবু অতি···লোক, তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখিবে। তিনি কি

শিখাইলেন, না শিখাইলেন সে বিষয় কিছু মনে করিবে না। এ সকল কার্য কেহ শেখায় না। লোকে আপনি শিখে। লোকের কাছে যাহা শিখিতে হয়, তাহা কার্য প্রণালী। তাহা manual ও আইনে পাইবে। তৎব্যতীত যাহা জানা আবশ্যক তাহা experience।…

ইতি বৃহস্পতিবার ১৬ ভাদ্র,১২৯৪

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

p s তোমার সেজকাকার এক পত্র পাইয়াছি, অত্র পত্র মধ্যে পাঠাইলাম।

চিঠির 'তোমার সেজকাকা' হলেন—জ্যোতিশের সেজকাকা বঙ্কিমচন্দ্র। এই চিঠির এবং আগের চিঠি দুটির '…' অংশগুলি ছিন্ন।

প্রাণাধিকেষু,

তোমার রেজিষ্ট্রারি পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। কখন আর অন্যের ঘোড়া চড়িও না। কোন ঘোড়া লাগাম টানিলে থামে, কোন ঘোড়া লাগাম ছাড়িলে থামে, কোন ঘোড়া তোপের শব্দে ভয় পায় না, আবার কোন ঘোড়া হাততালির শব্দে ভড়কিয়া পলাইতে চায়। কোন ঘোড়া ভয়ানক দৃশ্য দেখিলে ভয় পায় না, কোন ঘোড়া পথে গোবরের তাল দেখিলে ভড়কিয়া উঠে। সুতরাং বিশেষ পরিচিত ঘোড়া না হইলে চড়িও না। যদি একান্ত ঘোড়া চড়িতে হয়, তবে নিজে একটি ঘোড়া কিনিয়া চড়িবে। কিনিতে গেলে দোষগুণ বিচার করিয়া কিনিতে হইবে। আমি তাহার চেষ্টায় থাকিলাম।

…অতি ভয়ানক নির্বোধ। আমি বহুকাল অবধি জানি। তাহার নিকট কার্যও করিয়াছি। আমায় কে ভয় করে না, কে গ্রাহ্য করে না, এই সতত তাহার অনুসন্ধান। কিরূপে অনিষ্ট করিব এই সতত ভাবনা। অনিষ্ট করিবার জন্য যদি সত্য মিথ্যা কথা রচনা করিতে হয়, সে তাহা করিবে। আবার তেমনি হাঁকা, সকলের কাছে সকল পরিচয় দিবে। অদ্য শত্রু কল্য মিত্র। অব্যবস্থিত চিত্ত। উহার অনুগ্রহও ভয়ানক। উহাকে বিশ্বাস নাই, সতর্ক থাকিবে। আমি তাহাকে গ্রাহ্য করিতাম না বলিয়া সে আমার অতিশয় অনিষ্ট করিয়া ছিল, বোধ হয় এখন তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কৈফিয়তের উত্তর সঙ্গত না হইলেও আপাততঃ কোন দোষ হইবে না। ড্রাফট কল্য পাঠাইব। যদি কোন গতিকে বিলম্ব হয়, তবে নিজে একটা জবাব দিও। কিন্তু সাবধান, ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেণ্ট যে একটা ইনসপেকশন রিপোর্ট কুষ্টিয়ায় লইয়া গিয়াছিলেন, একথা তাহাতে যেন কদাচ না থাকে।

মুর্শিদাবাদে কেন যাইতে হইবে? Co-operation meeting System কি? যদি মুর্শিদাবাদ যাইতে হয়, তবে এই পথ দিয়া গেলে সুবিধা হয় না?··· থানা শুনিয়াছি চুয়াডাঙ্গা হইতে তিন ক্রোশ। তাহা যদি হয়, তবে ঐ থানা Inspect করিয়া চুয়াডাঙ্গা হইতে নৈহাটী আসিয়া, আবার নৈহাটী হইতে হুগলী দিয়া নলহাটী স্টেশন পৌছিয়া, তথা হইতে Branch line দিয়া আজিমগঞ্জ পৌছান যায়। আজিমগঞ্জ হইতে ক্ষুদ্র গঙ্গা পার হইয়া জিয়াগঞ্জ হইতে ঘোড়ার গাড়িতে অথবা নৌকাতে মুর্শিদাবাদ অল্প সময়ে পৌছান যায়। সময় আর অর্থ দুই বিবেচনা করিতে হইবে। যদি এই পথ অপেক্ষা মেহেরপুর হইতে···গরুর গাড়ির পথ সুবিধা ও সত্বর হয়, তবে সেই পথেই যাইবে। আমি একবার অপরাহ্নে বেলা ৫টার সময় বাটীতে বাহির হইয়া হুগলির গাড়িতে উঠিয়া পর দিবস বেলা ১০টার সময় মুর্শিদাবাদ পৌছাই অর্থাৎ ১৬ কি ১৭ ঘণ্টায়। ইহার উপর মেহেরপুর হইতে নৈহাটী আসায় আর ১৬ কি ১৭ ঘণ্টা যোগ দিতে হইবে। এই ৩৪ ঘণ্টায় তুমি direct পথে পৌছিতে পারিবে? তাহা বিশেষ হিসাব করিতে হইবে, যেন আবার কৈফিয়ত না দিতে হয়। তোমার নিকট টাইম টেবল আছে, দেখিয়া হিসাব করিবে।

অপরাহ্নে প্রত্যহ একটু করিয়া মাথা ধরিত লিখিয়াছিলে, তাহা গিয়াছে কিনা লিখিবে। শরতের একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। প্রসব সময়ে শরৎ মরণাপন্ন হইয়াছিল। শচীর একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। ভাল আছে। আমার আর উদরাময় নাই। বালক-বালিকারা সকলেই ভাল আছে। ইতি ৩রা ফেব্রুয়ারি।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির '···' চিহ্নিত অংশগুলি ছিন্ন। চিঠিতে সঞ্জীবচন্দ্র জ্যোতিশকে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার জন্য হুগলী দিয়ে নলহাটী হয়ে যাওয়ার কথা যে বলেছেন, তার কারণ, তখন শিয়ালদহ থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত মাত্র ট্রেন ছিল। মুর্শিদাবাদ বা লালগোলা পর্যন্ত ট্রেন পরে হয়।

চিঠির শরৎ হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবী, আর শচী হলেন সঞ্জীবচন্দ্রের বড়দা শ্যামাচরণের পুত্র।

14 Sept '87

My dear Jyotish,

I intend to take your old mother to N. W. as soon as she gets over the curbuncle. She absolutely requires the change, at lest·such is the opinion of the doctors. So you had better come down and take your family to Meherpur......I think if you can obtain an indulgence of a casual leave for four or five days during the vacation it would be all right, as in that case you might meet your uncles. Bankim and Purna who have not seen you long since. Children are doing well.

Sunjeeb Chunder Chatterjee

প্রাণাধিকেষু,

পৈত্তিক জ্বর বলিয়া তাচ্ছিল্য করিও না। উহা হইতে সকল জ্বরই হইতে পারে। আপাতত একটু করিয়া প্রাতে চিরাতার জল খাইলে ভাল হয়; কিন্তু তাহাতে অরুচি জন্মে। বিপিনের উপাধি কুণ্ডার। ঠিকানা কলেজ স্ট্রিটে। বাটীর নম্বর আমার স্মরণ নাই। পরে জানিয়া লিখিব। কিন্তু তুমি যদি পত্র লিখিয়া লেফাফা আঁটিয়া আমায় পত্রের মধ্যে পাঠাইয়া দেও, তাহা হইলে আমি নিজে গিয়া বা আর কাহাকে পাঠাইয়া প্রেস্‌ক্রপশন লেখাইয়া বা ঔষধ লইয়া ডাকে পাঠাইয়া দিই।

রঙ্গপুরের এলাকা অধীন কাঁকনার জমিদার মহিমারঞ্জনবাবুর মেনেজারি বড়বাবু পাইয়াছেন। তিনি একজন পুরাতন বিজ্ঞ ডিপুটি কালেকটর বলিয়া মহিমারঞ্জন তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়াছিল। অদ্যাপি রওনা হযেন নাই।

এখন বদলির জন্য কদাচ দরখাস্ত করিও না। প্রথমে confirmed হও, তাহার পর দরখাস্ত করিও। তোমাদের...সাহেব ছুটির দরখাস্ত করিয়াছেন। ১৮ মাস ছুটি লইবেন। কে তাঁহার স্থানে হয় তাহার এখনও ঠিকানা হয় নাই।

করিমপুর হইয়া মুর্শিদাবাদ যাও, ক্ষতি নাই। কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় নলহাটী হইয়া এই পথে আসিলে ভাল হয়। এত দিনের পর তোমায়



জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুই ঘণ্টার জন্যও যদি তোমার গর্ভধারিণী একবার দেখিতে পান, তাহা তিনি স্বর্গ বোধ করিবেন। কিন্তু তাঁহাকে একবার দেখা দিবার জন্য যেন সরকারী কাজে কোন ত্রুটি না হয়, বা অধীন লোকেরা কিছু যেন কথা বলাবলি না করে।

গত পরশু লোক পাঠাইয়াছি। কল্য পৌছিয়া থাকিবে। ইতি ২৭ ফাল্গুন।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিপিন কুণ্ডার সেকালে কলকাতার একজন নামকরা চিকিৎসক ছিলেন। ইনি কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। চিঠির 'বড়বাবু' হলেন সঞ্জীবচন্দ্রের বড়দা শ্যামাচরণবাবু। চিঠির '...' অংশ ছিন্ন।

প্রাণাধিকেষু,

সকলে ভাল আছি। অনিল ও কিরণ উত্তম লেখাপড়া করিতেছে।

গত কল্যর পত্রে তোমার permanent হওয়ার বার্তা জানিয়া সকলে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আহ্লাদে তোমার প্রসূতি অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছেন। এতদিনে স্থির হইল, তুমি আর অন্নকষ্ট পাইবে না। তোমার uncles-দের রূঢ় কথা শুনিতে হইবে না।

তোমার ছুটির পরামর্শ পরে হইবে। এখন সকলে দুই দিন আহ্লাদ করুক। নিত্য আমার পীড়ার কথা কেন লেখ বুঝিতে পারি না। যখন যেমন থাকি, তাহা লিখিয়া থাকি। পীড়াই বা কি? বুড়া বয়সের পীড়া মাত্র; কখন থাকে, কখন যায়। ছেলেরা সকলেই ভাল আছে।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা কয়েকটি চিঠি

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা অনেকগুলি চিঠি কাঁটালপাড়ার 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় আছে। সেই চিঠিগুলির মধ্যে থেকে কয়েকটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সঞ্জীবচন্দ্রের Bengal Ryots বইটি প্রকাশিত হলে তিনি তখন এক খণ্ড বই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। সেই বই পেয়ে প্রধান বিচারপতির একান্ত সচিব সঞ্জীবচন্দ্রকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

The officiating Chief Justice begs to thank Baboo Sunjeeb Chunder Chatterjee for the copy of his book a Bengal Ryots which the Baboo has been kind enough to send him.

illegible

June 13, 1864

ভারতে ইংরাজ সিভিলিয়ান, বহু ভারতীয়-ভাষাবিদ্, বিখ্যাত গ্রিয়ারসন সাহেব তখন বিহারের বাঁকিপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। সেই সময় তিনি বিদ্যাপতির কবিতাবলীর একটি মৈথিলী সংস্করণ প্রকাশ করার মনস্থ করেন। ঐ সময়ে তাঁর নির্দেশে তাঁরই এক বাঙ্গালী সহকর্মী সঞ্জীবচন্দ্রকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

My dear Sanjibbabu,

Though not personally known to you, yet we have heard as much of each other that I make hold to write to you—Mr. Griersen—the Jt. Magist.—of this place, wishes to publish a Maithil edition of Vidiapati's poems. In your Bangadarsan of Jaista 1282 page 80 col. ii, you state that four poems were published on the occasion of the meeting of Vidiapati & Chandi Das.

You have published two of them. Have you got the others ? If so, I shall feel obliged if you kindly send me copies of them. If not in which book can they be found ? Are the two poems published by you complete ? If not, kindly send copies of the remaining portion.

I hope you will kindly excuse my giving you this trouble. I beg you to give an early reply to my letter. You are now a gentle man at large and don't care for carrying favour with Govt. officers' Heaven born service. But our case is different—kindly therefore favour me with an early reply.

I hope this will find you and family in good health and spirit.

The 6th Feb. 1885 — Yours very sincerely

Bankipore — Bimala Ch. Bhattacharyya

১২৮২ সালে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধের এক জায়গায় লেখা হয়েছিল—'বিদ্যাপতি কবি চণ্ডীদাসের সমকালবর্তী ছিলেন। উভয়ের গুণের কথা শুনিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হন। উভয়ের মিলন সম্বন্ধে চারিটি কবিতা আছে। তন্মধ্যে আমরা দুইটি উদ্ধৃত করিলাম। একটি রূপনারায়ণের, অপরটি বিদ্যাপতির রচিত।'—এই বলে কবিতা দুটি উদ্ধৃত করা হয়। 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধের সঙ্গে লেখক হিসাবে কারও নাম ছিল না। সঞ্জীবচন্দ্র অপর কবিতা দুটি পাঠিয়ে ছিলেন কিনা তা জানা যায় না।

একটা চিঠিতে দেখেছি, শ্রীঅরবিন্দর পিতা বিখ্যাত ডাঃ কে ডি ঘোষ সঞ্জীবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র মারফত সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে লেখা পাঠাচ্ছেন। পূর্ণচন্দ্র ও ডাঃ ঘোষ উভয়েই তখন রংপুরে যথাক্রমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সিভিল সার্জন ছিলেন। ডাঃ ঘোষের লেখার সঙ্গে পূর্ণবাবু মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন— (চিঠির '...' চিহ্নিত-অংশ ছিন্ন)—

My dear Brother,

The enclosed is a contribution to the Bangadarsan from the pen of our well known Dr. K. D. Ghosh. I need not say how gladly you will publish it, he has not given any heading to the article and leave it to you to do......if you think it necessary.

Dr. Ghosh wishes me to request you to use your own discretion as whether the article should find a place in our magazine.

Yours affly,
Poorna Chatterji

তখনকার দিনে বঙ্গদর্শনে অধিকাংশ লেখার সঙ্গেই লেখকের নাম থাকত না। ডাঃ ঘোষের রচনাটি বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়েছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু বঙ্গদর্শনের কোন লেখার সঙ্গেই ডাঃ কে ডি ঘোষ নামে কোন লেখকের নাম না দেখতে পাওয়ায় ডাঃ ঘোষের লেখাটি আবিষ্কার করা গেল না।

বঙ্গদর্শনে লেখা পাঠানো প্রভৃতি ব্যাপারে সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির কয়েকটা চিঠি আছে। দুটি চিঠি আছে দেখছি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এই চিঠি দুটির একটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত বিদ্বজ্জন সমাগম সভা উপলক্ষে, অপরটি ঐ ঠাকুরবাড়িতেই সারস্বত সম্মিলন সভা উপলক্ষে। বিদ্বজ্জন সমাগম সভায় সেদিন রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতি-নাট্যের প্রথম অভিনয় হয়েছিল। এবং তরুণ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা বিভিন্ন ব্যক্তির এই চিঠিগুলি থেকে জানা যায়, সঞ্জীবচন্দ্র অনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় শুধু একজন প্রতিভাশালী সাহিত্যিকই ছিলেন না, তখনকার দেশের বিদগ্ধ সমাজে একটি সম্মানজনক আসনও লাভ করেছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে কারও কারও ভুল অনুমান

এবার অপরের রচনাকে কেউ কেউ কিভাবে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে অনুমান করেছেন, এখন সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলছি—

কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন—'দ্বিতীয় পর্যায় বঙ্গদর্শনে 'রঙ্গমতী'র একটা সামান্য সমালোচনা বাহির হইল। শুনিলাম, উহা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা। বহুকাল পরে নির্বাপিত প্রায় 'বান্ধবে' প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি সমালোচনা কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।'

এই উদ্ধৃতির 'দ্বিতীয় পর্যায় বঙ্গদর্শন' হল—সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন। আর 'রঙ্গমতী' নবীনচন্দ্রের রচিত কাব্যগ্রন্থ। 'বান্ধব' ঢাকা থেকে প্রকাশিত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা, এবং প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন সেকালের একজন সাহিত্যিক।

এই প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে নবীনচন্দ্রের 'রঙ্গমতী' কাব্যের সমালোচনা করেছিলেন। নবীনচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছিলেন বলে যা লিখেছেন, তা ঠিক নয়। এর প্রমাণ হিসাবে কাঁটালপাড়ায় 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় রক্ষিত সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা এই প্রফুল্লবাবুর একটা চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি। চিঠিটি এই—

Decr. 18th 1883

My dear Sanjibbabu,

In my humble opinion, and genuine writing, whether in prose or poetry, can not be altered or abridged by any body else, except by the writer himself. Otherwise, it is to that extent lamed and maimed and nothing more. In my review of Rangamati, I do not recollect to have said any word amiss or not from any conviction, & I therefore I can not find out where it can be abridged & where not....

Bankimbabu always allowed me the indulgence of letting

my articles appear as they were, and I hope, you too will do the same. Kindly send me the two numbers of Banga Darsan in which my review will appear.

Yours sincerely
Prafulla Ch. Banerjee

এখন প্রফুল্লবাবুর এই চিঠি থেকে বলা যেতে পারে, রঙ্গমতীর সমালোচনাটি তাঁরই।

সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা প্রফুল্লবাবুর চিঠিটির ন্যায় সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা নবীনচন্দ্র সেনেরও একটি চিঠি 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় রয়েছে। ঐ চিঠিতে নবীনচন্দ্র লিখেছিলেন--

5 Oct. 1877

My dear Sanjibbabu,

I have to thank you for 'Babrofying' me this time. You aught to be ashamed of it, old man, for it would not do to observe that distance with me....

Hembabu promised to take me with him when going over to your place and I wonder that he has given me the slip. How did you like his sing-song recital ? When do you think of reviewing his book ? I think the other old lad will do it......

এই চিঠিতে নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্রের যে বইয়ের সমালোচনার কথা বলেছেন, সেটা হল, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার—২য় খণ্ড। চিঠিতে নবীনচন্দ্র 'আদার ওল্ড ল্যাড' বলে সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রকেই বুঝিয়েছিলেন। কারণ, চিঠিতে তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকেও 'ওল্ড ম্যান' বলেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এর কিছুদিন আগেই সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে 'বুড়া বয়সের কথা' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই হিসাবেও নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে ওল্ড ল্যাড বলতে পারেন।

'রত্নমতী'র সমালোচনা করেছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র, এই বলে নবীনচন্দ্র যেমন ভুল করেছিলেন, তেমনি বৃত্রসংহার ২য় খণ্ডের সমালোচনা করবেন বঙ্কিমচন্দ্র, চিঠিতে এই কথা লিখেও ভুল করেন।

নবীনচন্দ্রের সম্ভবত ধারণা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রই নিজের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ইতিপুর্বে 'বৃত্রসংহার' ১ম খণ্ডের সমালোচনাটি লিখে ছিলেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই বোধ হয় তিনি তাঁর 'আমার জীবন'-এ লিখেছেন—

'…বঙ্গ-সাহিত্যের কথা, পলাশীর যুদ্ধ, বৃত্রসংহার ইত্যাদির কথা, বঙ্গদর্শনে উহার প্রথম ভাগের সমালোচনার কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন —এ সমালোচনার জন্য অনেকে আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে। তোমার কাছে বৃত্রসংহার কেমন লাগিয়াছে? অমি বলিলাম—আমি হেমবাবুর শিষ্যস্থানীয়। আমার আবার মত কি? বেশ ভাল লাগিয়াছে।

অক্ষয়বাবু নাছোড়বান্দা, তিনি বলিলেন—মন্দ কাহারও লাগে নাই। তবে 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' এই লাইনে যে কি অদ্ভুত কবিত্ব আছে, অনেকে বুঝে না। এ সমালোচনায় আপনার অগৌরব হইয়াছে

বঙ্কিমবাবু বড় অপ্রতিভ হইয়া আমার কাছে আপীল করিলে আমি তাঁহার মত সমর্থন করিয়া আপীল ডিক্রি দিলাম।'

এখানে এই উদ্ধৃতির অক্ষয়বাবু হলেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার। নবীনচন্দ্র একদিন অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় বসে এঁদের এই কথাবার্তা হয়।

হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্য প্রথমে দু'ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম ভাগে—১ম থেকে ১১শ সর্গ বেরিয়েছিল ১২৮১ সালে, আর দ্বিতীয় ভাগে ১২শ থেকে ২৪শ সর্গ বেরিয়েছিল ১২৮৪ সালে। বৃত্রসংহার ১ম খণ্ড প্রকাশিত হলে তখন ১২৮১ সালের মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই সংখ্যা বঙ্গদর্শনে এর একটা দীর্ঘ সমালোচনা বেরোয়। ঐ সমালোচনায় এক জায়গায় লেখা হয়েছিল—

'বৃত্রাসুর সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন—

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।

পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি।— মিলটনের যোগ্য।'

অক্ষয়চন্দ্র সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে এই লেখাটার কথাই বলেছিলেন।

বৃত্রসংহারের সমালোচনার প্রসঙ্গ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নবীনচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের এই কথোপকথনকেই অবলম্বন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাঁদের সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলীতে লিখেছেন—'কয়েকটি রচনা যে বঙ্কিমের তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। ·· বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বৃত্রসংহার' সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র সেনের (আমার জীবন) সাক্ষ্য আছে।'

এই সিদ্ধান্ত করে এঁরা এঁদের সম্পাদিত বঙ্কিম রচনাবলীতে বৃত্রসংহারের ১ম খণ্ডের সমালোচনাটি দিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এঁরা ঐ সমগ্র রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে স্থির করেও নিজেদের সম্পাদিত গ্রন্থে ঐ দীর্ঘ সমালোচনার (যা বঙ্গদর্শনে দু সংখ্যায় ১৯ পৃষ্ঠা ধরে প্রকাশিত হয়েছিল) প্রথম দিকের কিছুটা বাদ দিয়ে তার পরের মাত্র পাতা খানেক দিয়েছেন, অথচ এঁরা এই উদ্ধৃতির আগে বা পরে কোথাও কোন '…' চিহ্নও দেন নি।

এখন দেখা যাক্, বৃত্রসংহারের এই দীর্ঘ সমালোচনাটি সত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কিনা—

প্রথমত—নবীনচন্দ্রের ঐ লেখার মধ্যে এমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই যে, যাতে করে বলা যেতে পারে, ঐ সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন,•এ সমালোচনার জন্য অনেকে আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে—এই কথার এ অর্থও তো করা যায়—অন্যের লেখা এই সমালোচনাটা প্রকাশ করার জন্য অনেকে সম্পাদক হিসাবে আমাকে বিদ্রূপ করছে।

আর, এ সমালোচনায় আপনার অগৌরব হয়েছে, অক্ষয়চন্দ্র যদি সত্যই হুবহু এ কথা বলে থাকেন (কারণ, ঐ কথাবার্তার বহু বৎসর পরে নবীনচন্দ্র তাঁর 'আমার জীবন' লিখেছিলেন), তা হলেও তো আগের মতই এ কথারও অর্থ করা যেতে পারে—এ সমালোচনা প্রকাশ করায় আপনার অগৌরব হয়েছে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা নয়, অপরের লেখা প্রকাশ করায়।

বৃত্রসংহার, ১ম খণ্ডের সমালোচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮১ সালের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায়। মাঘ সংখ্যায় বইয়ের ৬ সর্গের আলোচনা করে শেষে বলা হয়েছে—আমরা ছয় সর্গের বৃত্তান্ত লিখিলাম। আর চার সর্গ বাকি আছে। আগামী সংখ্যায় তৎসমালোচনে প্রবৃত্ত হইব।

ফাল্গুন সংখ্যায় বৃত্রসংহারের বাকি কয় সর্গের অর্থাৎ ৭ থেকে ১১, এই ৫ সর্গের আলোচনা করা হয় এবং আলোচনার উপসংহারে বইয়ের ছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটা কথা বলা হয়।

দেখা যাচ্ছে, মাঘ সংখ্যায় সমালোচনার শেষে যে লেখা হয়েছিল—আর চার সর্গ বাকি আছে, আগামী সংখ্যায় সেগুলোর আলোচনা করব—এটা ভুল। কারণ, আসলে বাকি ছিল ৫ সর্গ। কারণ, ১ম খণ্ড ১১ সর্গের কাব্য।

কিন্তু ১ম খণ্ডের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথা ভেবেও ব্রজেনবাবুরা কেন যে তাঁদের সম্পাদিত গ্রন্থে মাত্র পাতা খানেক দিলেন, সে সম্বন্ধে আমার মনে হয়—এঁরা ঐ লেখা উদ্ধৃত করবার সময়েই বুঝেছিলেন, মূল বই থেকে এত রাশি রাশি কবিতার লাইন, এমন কি পাতার পর পাতা তুলে দু মাস ধরে ঐ দীর্ঘ সমালোচনা লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ নয়। এ হয়ত অন্য কারও লেখা। এই ভেবেই সমগ্র রচনাটি আর দেন নি।

একদিকে এঁদের এই চিন্তা, অপর দিকে নবীন সেনের 'আমার জীবনে'র লেখাকে 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ' বা 'সাক্ষ্য' বলে একটা ধারণা। এই উভয় সংকটে পড়ে এঁরা ঐ দীর্ঘ সমালোচনার মাত্র পাতা খানেক দিয়ে এবং শেষে বঙ্গদর্শনের সাল, সংখ্যা ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করে কাজ শেষ করেন।

ব্রজেনবাবুরা যে কোন কারণেই হোক, এই যে দেখেশুনে সামান্য একটু মাত্র উদ্ধৃত করলেন এবং উদ্ধৃত অংশের আগে বা পরে '...' চিহ্নও দিলেন না, তার ফল হ'ল এই যে, সাধারণ পাঠক-পাঠিকা—সাধারণ পাঠক-পাঠিকাই বা বলি কেন, যোগেশচন্দ্র বাগলের ন্যায় বঙ্কিম-গবেষক এবং ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকও ব্রজেনবাবুদের ঐ অল্প উদ্ধৃতিটিকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ সমালোচনা বলে স্থির করলেন। এই স্থির করে যোগেশবাবু 'সাহিত্য-সংসদ' থেকে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদিত বঙ্কিম রচনাবলীতে ব্রজেনবাবুদের উদ্ধৃতিটিই হুবহু তুলে দিয়েছেন। আর অসিতবাবু তাঁর সম্পাদিত সঞ্জীব-রচনাবলীর ভূমিকায় লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র কৃত বৃত্রসংহার ১ম খণ্ডের সমালোচনাটি 'অতি সংক্ষিপ্ত'।

ব্রজেনবাবুরা এই যে কাজটা করে গেলেন, এটা এতই স্থুল যে, এঁদের উদ্ধৃতিটা একটু ভাল করে দেখলেই, এঁদের কাজটা ধরা যায়। কারণ, এঁরা উদ্ধৃত করেছেন—২য় সর্গের আলোচনার শুরু পর্যন্ত মাত্র। এই দেখে যোগেশবাবু, কি অসিতবাবুর যদি সামান্য একটুও কৌতূহল হ'ত যে, অত বড় একটা

কাব্যের মাত্র ৩য় সর্গের শুরু পর্যন্ত সমালোচনা কেন? তা হলে এঁরা বঙ্গদর্শনটা (ব্রজেনবাবুরা উদ্ধৃতির শেষে বঙ্গদর্শনের সংখ্যা এবং পৃষ্ঠার কথা তো দিয়েই দিয়েছেন) একবার খুললেই ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন। এবং অসিতবাবুও ১৯ পাতার সমালোচনাকে কখনই বলতেন না—সমালোচনাটা অতি সংক্ষিপ্ত।

যাক্। আমি যে বলেছি, বৃত্রসংহার প্রথম খণ্ডের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের নয় বা হতে পারে না, সে সম্বন্ধেই এখন কয়েকটা কথা বলছি—

বঙ্গদর্শনে এই প্রথম খণ্ডের সমালোচনায় আমরা দেখেছি, সমালোচক সমালোচনা প্রসঙ্গে মূল বই থেকে পাতার পর পাতা তুলেছেন। যেমন—রতির কাছে ইন্দুবালার কথা হিসাবে বই থেকে একটানা ৫৬ পঙক্তি এবং জয়ন্তের সঙ্গে শত যোদ্ধার বর্ণনায়ও ৬৩ পঙক্তি উদ্ধৃতি আছে।

সমালোচনায় বই থেকে বার বার এই দীর্ঘ সংকলন যে ঠিক হচ্ছে না, এ সম্পর্কে সমালোচক হয়ত কিছুটা বুঝেছিলেন। তাই তিনি দশম সর্গের আলোচনায় লেখেন—'আমরা কৈলাস যাত্রা সম্বন্ধে দীর্ঘ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিব। পাঠকরা তজ্জন্য আমাদিগের প্রতি বিরক্ত না হইয়া কৃতজ্ঞ হইবেন, এমন বিশ্বাস আছে।'—এই বলে সমালোচক বই থেকে আবার ১৪ পঙক্তি তুলেছেন।

এখন আমার কথা হচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচক হলে তিনি কখনই ঐভাবে বই থেকে পাতার পর পাতা তুলে দেখাতেন না। আর পাঠকরা 'বিরক্ত না হইয়া কৃতজ্ঞ হইবেন' এমন কথাও বলতেন না।

সমালোচনার শেষে লেখা হয়েছে—'কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, হেমবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।'

বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচক হলে 'কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি' এমন কথাও লিখতেন না বলেই আমার মনে হয়।

কবিতার বা কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ করতেন, তাঁর লেখা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার আলোচনাটা পড়লেই তা জানা যাবে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার আলোচনার সঙ্গে বৃত্রসংহারের এই আলোচনা মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, বৃত্রসংহারের আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের হতেই পারে না।

তাছাড়া, সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা নবীন সেনের চিঠি থেকে দেখা যায়, নবীন সেন মুখে যাই বলুন, হেমচন্দ্রকে বেশ ঈর্ষাই করতেন বলে মনে হয়। তাই হেমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর কথাকে তেমন গুরুত্বও দেওয়া যায় না।

এবার হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার ২য় খণ্ডের সমালোচনার কথা—

হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার ২য় খণ্ড প্রকাশিত হলে তখন বঙ্গদর্শনের ১২৮৪ সালের মাঘ সংখ্যায় ৪৫০-৪৫৭, ফাল্গুন সংখ্যায় ৫২১-৫২৬ এবং চৈত্র সংখ্যায় ৫৪২-৫৪৯ পৃষ্ঠায় স্থান নিয়ে এই বইয়ের একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্র তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বৃত্রসংহার ২য় খণ্ডের এই সমালোচনাটিকে সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের লেখা বলে স্থির করেছেন। এই স্থির করে তিনি এই রচনাটিকে তাঁর সম্পাদিত 'সঞ্জীব রচনাবলী'র অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এ সম্পর্কে অসিতবাবু তাঁর সম্পাদিত ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—বৃত্রসংহারের 'প্রথম খণ্ডের সমালোচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়—সমালোচক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। দ্বিতীয় খণ্ডটি সমালোচনা করেন সঞ্জীবচন্দ্র। শেষোক্ত সমালোচনায় সঞ্জীবচন্দ্রের নাম নেই বলে এতদিন নিশ্চয়তাসহ কিছু বলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। সুতরাং 'বৃত্রসংহার'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনাটি সঞ্জীবচন্দ্রের নামেই মুদ্রিত হল।'

নবীনচন্দ্র অর্থাৎ কবি নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবনে' এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন বলে অসিতবাবু পাদটীকায় নবীনচন্দ্রের যে লেখাটি তুলে দিয়েছেন, তা এই—'শুনিয়াছিলাম, হেমবাবুর বিশেষ অনুরোধেও বঙ্কিমবাবু বৃত্রসংহারের দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা করেন নাই। সঞ্জীববাবুই দ্বিতীয় পর্যায়ের বঙ্গদর্শনে উহার এক অতিরিক্ত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন।'

অসিতবাবু তাঁর ঐ সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় আরও লিখেছেন—

'বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র বৃত্রসংহারের প্রতি তাদৃশ আকৃষ্ট ছিলেন না। পরে কবির অনুরোধেই সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় পর্যায়ে বৃত্রসংহারের দ্বিতীয় খণ্ডের সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন।

অসিতবাবুর লেখাটি নিয়ে এখন কিছু বলছি—প্রথমত, অসিতবাবু যে লিখলেন—'শেষোক্ত সমালোচনায় সঞ্জীবচন্দ্রের নাম নেই বলে এতদিন নিশ্চয়তাসহ কিছু বলা সম্ভব হয় নি, তাঁর এই লেখা পড়লে স্বভাবতই মনে হবে, তাহলে হয়ত প্রথমোক্ত সমালোচনায় অর্থাৎ বৃত্রসংহার, ১ম খণ্ডের সমা-

লোচনায়, অসিতবাবু যেটাকে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলেছেন, লেখকের নাম ছিল। আসলে কিন্তু বৃত্রসংহারের কোন খণ্ডেরই সমালোচনার সঙ্গে লেখকের নাম ছিল না। তখন বঙ্গদর্শনে কচিৎ দু-একটা বাদে কোন লেখার সঙ্গেই লেখকের নাম থাকত না। অথচ ঐ সবের বহু রচনাই ছিল সম্পাদক ছাড়া অন্য লেখকদের।

দ্বিতীয়ত—অসিতবাবু যে বলেছেন, বৃত্রসংহারে দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে নবীন সেন তাঁর 'আমার জীবনে' স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন, কিন্তু কই? নবীন সেন তো তা বলেন নি। তিনি বলেছেন— সঞ্জীবচন্দ্র 'দ্বিতীয় পর্যায় বঙ্গদর্শনে বৃত্রসংহার দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা প্রকাশ করেন।

'প্রকাশ করা' আর 'রচনা করা' দুটা আলাদা কথা। সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর পত্রিকায় অপরের রচনাও তো প্রকাশ করতেন। অতএব সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে এটা মোটেই স্পষ্ট উল্লেখ নয়।

তৃতীয়ত—অসিতবাবু যে লিখেছেন, হেমচন্দ্রের অনুরোধেই সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় পর্যায়ে বৃত্রসংহার সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন, এটা অসিত-বাবুর একটা নজিরহীন অনুমান মাত্র।

অসিতবাবু যদি নবীন সেনের লেখা—শুনেছিলাম হেমবাবুর অনুরোধেও বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা না করায়, পরে সঞ্জীবচন্দ্র সমালোচনা প্রকাশ করেন—এ থেকে হেমচন্দ্র কর্তৃক সঞ্জীবচন্দ্রকে অনুরোধের কথা অনুমান করে থাকেন, তাহলেও বলবো, নবীন সেনের এই শোনা কথার কোন মূল্য নেই। কারণ, 'রঙ্গমতী' সম্বন্ধে তাঁর এইরূপ শোনা কথা যে ভুল, তা আমরা আগে দেখেছি।

চতুর্থত—হেমচন্দ্রের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষের লেখা থেকে জানা যায় —সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত প্রায় ৫ বছরের বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্রের মাত্র ২টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কবিতা দুটি হল—'ভুলো না ও কুহুস্বর, ভুলো না আমায়' এবং 'একটি প্রিয় জলাশয়'। কবিতা দুটি প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১২৮৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা ও ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে। এই দুটি কবিতার সঙ্গেই লেখক হিসাবে কোথাও হেমচন্দ্রের নাম ছিল না।

অথচ সঞ্জীবচন্দ্র ১২৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে নবীনচন্দ্র সেনের একটি কবিতা প্রকাশ করে এবং ১২৮৫ সালের আষাঢ়েও নবীনচন্দ্রের আর একটি কবিতা প্রকাশ করে কবিতার শেষে লেখক হিসাবে নাম ছেপে ছিলেন—শ্রীনঃ।

সঞ্জীবচন্দ্র দীর্ঘ দিনের সম্পাদনাকালে বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্রের মাত্র দুটি কবিতা প্রকাশ করায় এবং দুটি কবিতার সঙ্গেই লেখকের কোনরূপ নাম না দেওয়ায় আমার মনে হয়, হেমচন্দ্রের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের পরিচয় থাকলেও খুব ঘনিষ্ঠতা বা বন্ধুত্ব ছিল না। এবং আমার এও ধারণা যে, বৃত্রসংহার ২য় খণ্ডের ঐ দীর্ঘ সমালোচনা সঞ্জীবচন্দ্রের নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—তাহলে বৃত্রসংহার ২য় খণ্ডের ঐ দীর্ঘ সমালোচনাটি কার লেখা হতে পারে?

আগে সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে চিঠিটি দেখিয়েছি, তা থেকে জানা যায়, প্রফুল্লবাবু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে এবং সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনেও বড় লেখকদের বই সমালোচনা করতেন এবং বড় করেই লিখতেন। আর নবীনচন্দ্র যে লিখেছেন, প্রফুল্লবাবু 'বান্ধব' পত্রিকায় কয়েক সংখ্যা ধরে তাঁর 'রঙ্গমতী' কাব্যের সমালোচনা করেছিলেন, এ থেকেও জানা যাচ্ছে, প্রফুল্লবাবু কোন বইয়ের সমালোচনা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েক সংখ্যায়ও লিখতেন।

আমার অনুমান হয়, বৃত্রসংহার ১ম খণ্ড এবং ২য় খণ্ড দুটিরই বঙ্গদর্শনে সমালোচনা করেছিলেন হয়ত ঐ প্রফুল্লবাবুই। অবশ্য একথা আমি জোর করে বলছি না। বলছি, অনুমান।

আবার আমার এও অনুমান হয়, বৃত্রসংহার ২য় খণ্ডের সমালোচনাটি সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রেরও হতে পারে। কারণ, জ্যোতিশ তাঁর পিতার বঙ্গদর্শন পত্রিকার ম্যানেজার হিসাবে শুধু পত্রিকা দেখাশুনাই করতেন না, পত্রিকায় নিজে লিখতেনও। জ্যোতিশ কেবল বঙ্গদর্শনেই নয়, এর আগে তাঁর পিতার সম্পাদিত 'ভ্রমর' পত্রিকায়ও লিখেছেন। জ্যোতিশ প্রথম দিকে কেবল কবিতাই লিখতেন। তাই কবিতার উপর বিশেষ ঝোঁক থাকায় নিজেদের কাগজে কবিতায় বই নিয়ে সমালোচনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

মূল বই থেকে পাতার পর পাতা সংকলন করে বঙ্গদর্শনে এই যেমন বৃত্র-সংহার ২য় খণ্ডের সমালোচনা করা হয়েছে, ঠিক তেমনি সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য-গ্রন্থ 'যোগেশ'-এরও একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

কাঁটালপাড়ার 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই 'যোগেশ' কাব্যের সমালোচনার পাণ্ডুলিপির অনেকটা অংশ আছে। সেই পাণ্ডুলিপির হাতের লেখা জ্যোতিশচন্দ্রের। তাছাড়া ১৩৩৮ সালের 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংখ্যায় এক প্রবন্ধে জ্যোতিশ নিজেও লিখে গেছেন, তিনিই বঙ্গদর্শনে 'যোগেশ' কাব্যের সমালোচনা করেছিলেন।

এই কারণে, বৃত্রসংহার ২য় খণ্ডের সমালোচনা জ্যোতিশের হতে পারে বলেও আমার অনুমান হয়।

যাই হোক, দু খণ্ড বৃত্রসংহারের সমালোচনা দুটি বঙ্কিমচন্দ্রের এবং সঞ্জীবচন্দ্রের কারুরই নয় বলেই আমার ধারণা। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার আলোচনার সঙ্গে বৃত্রসংহার ১ম খণ্ডের সমালোচনার তুলনা করলে এবং সঞ্জীবচন্দ্রেরও সংযত, উচ্ছ্বাসবিহীন ও আঁটসাঁট লেখার সঙ্গে বৃত্রসংহার ২য় খণ্ডের সমালোচনার তুলনা করলে—বৃত্রসংহারের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের ও সঞ্জীবচন্দ্রের নয় বলেই মনে হয়। বই থেকে পাতার পর পাতা উদ্ধৃত করে সমালোচনা করা একজন সাধারণ লেখক বা সমালোচকেরই কাজ। বঙ্কিমচন্দ্র বা সঞ্জীবচন্দ্র হলে কখনই এভাবে পাতার পর পাতা তুলে সমালোচনা করতেন না।

এই গ্রন্থে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে শুরু করে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেকেরই ছোট বড় কতকগুলো ভুলের কথা উল্লেখ করেছি। অসিতবাবুর কথাটা একটু বেশী এসেছে, তার কারণ তিনি সঞ্জীব রচনাবলী সম্পাদনা করেছেন বলেই।

এ প্রসঙ্গে আমি বিনীত ভাবেই বলছি, কারও প্রতি কোনরূপ বিরূপ মনোভাব না নিয়ে, বরং সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই এই আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি, কোথাও তথ্যের বলে, কোথাও বা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান অনুযায়ী। আমার সিদ্ধান্তে যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে, আমি নিশ্চয়ই তা সংশোধন করে নেব। কারণ, যা সত্য তাই প্রতিষ্ঠিত হোক, এইটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

পরিশিষ্ট

পদোন্নতির পন্থা

[ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় অতি জীর্ণ ও শতছিন্ন একটি পুরাতন খাতা আছে। এই খাতারই আবার প্রথম দিকের এবং শেষের দিকেরও কয়েকটা করে পাতা নেই। খাতাটি সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের হাতের বাংলা ও ইংরাজি লেখায় ভরা। বাংলা লেখাটা খুবই কাটাকুটি করা।

এই জীর্ণ খাতাটির লেখাগুলির মধ্যে প্রথম সওয়া দু পাতা এবং শেষের আঠার পাতা বাংলায়, বাকি মাঝের বাইশ পাতা ইংরাজিতে লেখা। ইংরাজি লেখাটার একটু পড়লেই বোঝা যায়, সঞ্জীবচন্দ্র যে দীর্ঘ বার বছর স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন, তাঁর সেই চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে রেজেষ্ট্রি বিভাগ সম্পর্কে কিছু লেখা। আর খাতার প্রথমের ও শেষের বাংলা লেখা দুটি পড়লে জানা যায়, এ দুটি কোন দুটি পৃথক প্রবন্ধের অংশ বিশেষ। লেখার সঙ্গে অবশ্য কোথাও কোন প্রবন্ধের নাম নেই।

ঐ ছিন্ন খাতার কাটাকুটি করা প্রথম বাংলা লেখাটি পড়ে, এটা সঞ্জীবচন্দ্রের কোন্ প্রবন্ধের অংশ হতে পারে, এই ভেবে তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলি পড়ে দেখি। পড়তে পড়তে দেখলাম, খাতার এই লেখাটি ১২৮৫ সালের চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'পদোন্নতির পন্থা' নামক একটি প্রবন্ধের শেষের দিকের একটা জায়গার অংশ। বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধের সঙ্গেও লেখক হিসাবে কারও নাম নেই। নাম না থাকলেও এখন এই ছিন্ন খাতার লেখাটা থেকেই আবিষ্কার করা গেল যে, এটা সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা। খাতার এই লেখাটা না পেলে কিছুতেই বলা যেত না যে, এটা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা।

এখন এই লেখাটা নিয়ে দু একটা কথা বলছি। চাকরিতে 'পদোন্নতির পন্থা' নিয়ে কিছু লেখা মানে, একটা নিরস বিষয় নিয়ে লিখতে বসা। এরূপ একটা নিরস বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র একাধিক গল্প বলে বলে কী সরস করে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, তা না পড়লে বোঝা যাবে না। তাছাড়া প্রবন্ধের প্রথমে যেমন গল্প আছে, শেষে তেমনি অনেক জানার মত কথাও আছে। যাঁরা চাকরি করেন এবং চাকরিতে পদোন্নতি চান, তাঁদের কাছে এ কথাগুলো আজও জানবার মত।

আর একটা বড় কথা এই যে, সঞ্জীবচন্দ্রের এই 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধ পড়েই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১২৮৫ সালের চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে, আর বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম প্রকাশিত হয় ১২৮৭র আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে। এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, ১২৮৬ সালে বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যাই বেরোয় নি।

প্রাচীন বঙ্গদর্শন পত্রিকা বর্তমানে যেমন দুষ্প্রাপ্য, তেমনি এই 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধটি আজও কোন গ্রন্থভুক্ত হয় নি। পুরাতন বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাতেই অজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রবন্ধটি এখন এখানে উদ্ধৃত করছি—]

পদোন্নতির পন্থা

(অসন্তোষ, অতৃপ্তি উন্নতির মূল ভিত্তি)

পদোন্নতির পন্থা সম্বন্ধে নানা মতান্তর দেখা যায়। সরলচিত্ত ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন যে, বিদ্যা থাকিলে পদের উন্নতি হয়। তাঁহারা বিদ্যাহীনের যদি কখন পদোন্নতি দেখেন, অদৃষ্টের গুণানুবাদ করিয়া আপনাদের ভ্রান্তি পুষ্টি করেন। বালকের মধ্যে 'কল' শব্দ যেমন সর্বব্যাপক, প্রয়োগমাত্রেই হেতু বোধ হইয়া যায়, আমাদের বয়োধিকের মধ্যে 'অদৃষ্ট' শব্দ সেইরূপ। ইহা কলে হইয়াছে, উহা কলে হয়, বলিলে বালকেরা মনে করে বুঝিয়াছি। অদৃষ্টে হইয়াছে বা হইতেছে বলিলে বয়োধিকেরা মনে করেন বুঝিয়াছি। মাথামুণ্ডু কি বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

বিদ্যাহীনের পদোন্নতি, কিম্বা অসার ব্যক্তির পদোন্নতি অথবা দুশ্চরিত্রের পদোন্নতি সর্বদাই দেখা যায়। এ দেশের ত কথাই নাই, বিদেশী কর্তৃক উপযুক্ত পাত্র নির্বাচিত হইতে গেলে ভুল সহজেই সম্ভব। কিন্তু স্বদেশে ইংরেজেরা এরূপ ভুল সর্বদাই ভুলিয়া থাকেন। কেবল ইংলণ্ড বলিয়া নহে, সকল রাজ্যে সকল সময়েই এই হইয়া থাকে। হয়ত শত শত উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত থাকিতে অতি অনুপযুক্ত ব্যক্তি কোন বিশেষ পদে মনোনীত হয়। তাহার অতি গূঢ় কারণ আছে। তাহা অনুসন্ধান করিবার পূর্বে এই স্থলে একখানি পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হইল। পত্রখানি বিদ্বেষ ভাবে পরিপূর্ণ।

সেইজন্য কিঞ্চিৎ রহস্যের প্রাধান্য আছে। কিন্তু তাহা থাকিলেও প্রকৃত কথার বড় ক্ষতি হয় নাই :—

'যাঁহাদের বিশেষ পদোন্নতি হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে দুই একটির পরিচয় দিলে বোধ হয় সুচতুর চাকরেরা বুঝিতে পারিবেন। বহুকাল পূর্বে অজদেব নামে একজন রাজকর্মচারী গঙ্গাপ্রহরী পদে নিযুক্ত ছিলেন। গঙ্গায় যে সকল নৌকা ডুবি হইত, তাহার দ্রব্যাদি উদ্ধার করা, তাহার অধিকারী থাকিলে সেই দ্রব্যাদি সমর্পণ করা, ও অধিকারী না থাকিলে তাহা রাজভাণ্ডারে প্রেরণ করা এই সকল গঙ্গাপ্রহরীর কার্য ছিল। অজদেব তাহা যথারীতি নির্বাহ করিতেন। কিন্তু তাঁহার আর পদোন্নতি হয় না দেখিয়া, বিশেষ মনোযোগ-পূর্বক কার্য করিবেন মনস্থ করিলেন। গঙ্গাপ্রহরীর যাহা প্রকৃতার্থে কর্তব্য তাহা ক্রমে করিতে লাগিলেন। গঙ্গার জল চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে বলিয়া, জলের ভার ধরিতে লাগিলেন। গঙ্গাপ্রহরী হইয়া গঙ্গার জল চুরি দেখা মহাপাপ। যে সকল গরু গঙ্গায় জল খাইত, তাহাদের নামে ফৌজদারি চার্জ আনিতে লাগিলেন। যে সকল নৌকা অন্য নদী হইতে গঙ্গায় আসিয়া ছিল, তাহাদের নামে অনধিকার প্রবেশ বলিয়া চার্জ করিতে লাগিলেন। নৌকা আর ডুবিবার অপেক্ষা রহিল না, তাহার সমুদায় মালামাল বিক্রীত হইয়া রাজভাণ্ডারে যাইতে লাগিল। রাজভাণ্ডার ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুদিন পরে রাজা জানিলেন যে, পূর্বের গঙ্গাপ্রহরীদের সময় অল্প আয় হইত, তাহারা অবশ্য অনুপযুক্ত ছিল। এক্ষণকার গঙ্গাপ্রহরী বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি, তাহাই এত আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। অজদেবের পসার দাঁড়াইয়া গেল, সেই অবধি যখন কোন উচ্চপদ খালি হইত, অজদেব সর্বাগ্রে পাইতেন।

বর্তমান সময়ের দুই একটি পরিচয় দিই। রামধনদাদা নামে একজন সদর আলা ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর হইল রাজকার্য ত্যাগ করিয়াছেন, হয়ত পৃথিবীও ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি কোন নিশ্চয় সংবাদ জানি না। রামধন দাদা যদি জীবিত থাকেন কৃপাপূর্বক আমার এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন। তাঁহার প্রকৃত উপাধি কি ছিল, আমি জানি না। তাঁহাকে সকলেই রামধন দাদা বলিত। তিনি সকলকেই দাদা বলিতেন। কাজেই সকলে তাঁহাকে দাদা না বলিয়া থাকিতে পারিত না। নিন্দুকেরা বলিত, তিনি পঞ্চম পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেইজন্য বয়ঃকনিষ্ঠদের দাদা বলিয়া আপনার বয়স কমাইতেন। কিন্তু প্রকৃত

পক্ষে তাহা নহে। তিনি পঞ্চম পক্ষে বিবাহ করিয়া ছিলেন সত্য, অথচ চুলে কলপ দিতেন না, কালাপেড়ে ধুতি পরিতেন না, টপ্পা গাইতেন না। তবে ভদ্রলোক মাত্রকেই তিনি যে দাদা বলিতেন, তাহার প্রকৃত কারণ নিন্দুকেরা জানিত না বলিয়া নানাপ্রকার উপহাস করিত। প্রথমত—তিনি একজন জজ সাহেবের সরকার ছিলেন, আবশ্যক মতে কুঠীর সমুদায় কার্য করিতেন। খানসামারা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। তিনি তাহাদের ভাল বাসুন বা নাই বাসুন, সকলকেই ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সাহেবের সন্তানটিকে সর্বদাই ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইতেন। তাহার সামান্য অসুখ হইলে চক্ষের জল মুছিতেন। কাজেই মেমসাহেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বিশেষত বিজয়া দশমীর দিবস অতি ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ হইয়া মেমসাহেবকে প্রণাম করিতেন। প্রথমবার মেমসাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করায় রামধন দাদা আমাদের হিন্দুপ্রথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মেমসাহেবের স্নেহ আরও বাড়িয়াছিল।

একবার বিজয়ার দিবস প্রণামান্তে রামধন দাদা মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, আমায় কি বলে আশীর্বাদ করিলেন?

মেমসাহেব আশীর্বাদের প্রথা পূর্বে শুনিয়াছিলেন, হাসিয়া উত্তর করিলেন —তুমি রাজা হও, এ আশীর্বাদ আমি করি নাই; কেন না ফলবান করা আমার ক্ষমতাতীত। সহস্র বৎসর পরমায়ু সম্বন্ধেও সেইরূপ। অতএব যাহা আমার আশীর্বাদে ফলিলে ফলিতে পারে, আমি তাহাই বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছি।

রামধন দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, সেটি কি?

মেমসাহেব আবার হাসিয়া বলিলেন—তুমি শীঘ্র হাকিম হও।

রামধন দাদা বলিলেন—যে আজ্ঞা মা, আমি তবে অদ্যই বাটীতে পত্র লিখি, আমি শীঘ্র মুন্সেফ হইব।

মেমসাহেব হাসিতে লাগিলেন। সেই দিবসেই আহারের সময় মেমসাহেব স্বজাতি কৌশল দ্বারা জজ সাহেবকে আপনার আশীর্বাদের পরিচয় জানাইলেন।

আশীর্বাদ যাহাতে সফল হয়, তাহার চেষ্টা করিবার নিমিত্ত জজ সাহেব হাসিতে হাসিতে স্বীকার করিলেন। একবার মাত্র বলিলেন—বিচারের কার্য অতি কঠিন। রামধন মূর্খ, তাহা পারিবে না।

মেমসাহেব বলিলেন—বিচারে যাহা ত্রুটি হয়, আপীলে তাহা সংশোধন হইয়া যাইবে।

কিছুদিন পরে রামধন দাদা মুন্সেফ হইলেন। ক্রমে সদর আমিন, সদর আলা হইয়া নানাবিধ বিবাদ ভঞ্জন করিলেন! বিচারে যত হউক বা না হউক, রফা দ্বারা অনেক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। রফায় কোন দোষ নাই। তবে যাহার দাবি মিথ্যা, তাহার কিছু লাভ হয়, অপর পক্ষের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয়। তাহা হউক, কিন্তু রামধন দাদা বিচারের দায় হইতে উদ্ধার হইতেন। বিশেষত বিচারে এক পক্ষের উকিল অসন্তোষ হইবার সম্ভব, রফায় সে সম্ভাবনা নাই।

রামধন দাদা ইংরেজি কিঞ্চিৎ জানিতেন। সাহেবদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কহিতেন। তাঁহার সকল কথা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি যে 'ইয়ার অনার' (your honor) বলিয়া ছোট বড় সকল সাহেবকে সম্বোধন কারতেন, তাহাতেই যথেষ্ট হইত।

পুলিশ দারোগা জারিন সাহেবকে তিনি শত বার 'ইয়ার অনার' বলিয়াছিলেন। যে অবধি তাঁহার মেম স্বকর্ণে তাহা শুনিয়াছিলেন, সেই পর্যন্ত স্বামীর পদগৌরব মেমের চক্ষে বিশেষ বাড়িয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে দাম্পত্য কলহও কমিয়াছিল। কাজেই রামধন দাদার নিকট ফিরিঙ্গি দারোগা বিশেষ বাধ্য ছিলেন।

জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকল সাহেবের খানসামাদের রামধন দাদা আদরে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভাই রোমজান, তোমার সাহেব কি করিতেছেন, এখন কি সাক্ষাৎ হইতে পারে?—এইরূপ সম্বোধন একজন যুবা উকিল একদিন শুনিয়া বড় আক্ষেপ করাতে রামধন দাদা বলিলেন—দাস দাসীর মান সর্বাগ্রে। ইহারা সদয় থাকিলে মুনিব সদয় হন। সময় পাইলে ইহারা উপকার করিতে পারে, অপকারও করিতে পারে। আমাদের আপনার মধ্যে কি হইয়া থাকে? জান না যে, আমাদের অধিকাংশ ভ্রাতৃবিরোধ দাস দাসীর দ্বারা উৎপত্তি হয়। আমার ভ্রাতৃবধূ অপেক্ষা তাঁহার দাসীকে আমি পূজা করি। বাটী গিয়া অগ্রে তাহাকে ডাকিয়া কাপড় দিই। সেই জন্য আমার গৃহে অদ্যাপি বিরোধ আরম্ভ হয় নাই। যেদিন দেখিব, তাহার মুখ ভার, সেইদিন জানিব আমার কপাল ভাঙিয়াছে।'

এই উদ্ধৃত অংশ যথেষ্ট। উপহাসের অনুরোধে লেখক কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি করিয়াছেন, কিন্তু যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রামধন দাদা আপনার বিদ্যাবুদ্ধি নিজে জানিতেন, কাজেই তদানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। সকলকে আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা পাইতেন। ছোট, বড় কেহ তাঁহার শত্রু ছিল না, কেহ তাঁহার উন্নতির বিরোধী হইত না। সাহেবেরা অনুগত প্রতিপালক, কেহ বা তাহা নহে। আমরা সকলেই অনুগত লোক ভালবাসি। মনুষ্যমাত্রেই অনুগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। রামধন দাদা সকলের অনুগত ছিলেন, ক্ষমতাপন্নদের বিশেষত। এ অবস্থায় তাঁহার উন্নতি নিশ্চয়ই সম্ভব। অনুগত হওয়া সকলের সাধ্য নহে। নম্রতা আবশ্যক, স্নেহ বা তৈল আবশ্যক, অভিমান জয় করা আবশ্যক। বিশেষত অন্যের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ হওয়া আবশ্যক। নম্রতা বা স্নেহ সহজ, অনেকেরই আছে। অন্যের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ হওয়াও নিতান্ত কঠিন নহে। বাক্যের সতর্কতা থাকিলে সে গুণ উপলব্ধি হইতে পারে; কিন্তু নিরভিমানী হওয়া অতি কঠিন। রামধন দাদা নিরভিমানী ছিলেন। তাহাই তাঁহার উন্নতি হইয়াছিল। উন্নতির অনেক হেতু আছে। নিরভিমানিতা তাহার মধ্যে একটি বিশেষ। যাহারা প্রতিভা-শালী বা যাহাদের বিশেষ যোগ্যতা আছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাহাদের যোগ্যতা বিশেষরূপে নাই, তাহাদের পক্ষে রামধন দাদার পন্থা উন্নতি সাধক। বিশেষত কি সাহেব কি বাঙ্গালী অনেকেই উপযুক্ত অনুপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন আপনি করিতে পারেন না। অন্যের কথায় নির্ভর করিয়া মীমাংসা করেন। এ অবস্থায় অন্যকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাখা ভাল।

যাঁহাদের পদোন্নতি হয় না, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাঁহারা বড় অভিমানী। অতি সামান্য বিষয়ে অপমানিত বোধ করেন। কাজেই কাহারও অনুগত হইতে পারেন না। হয়ত আবার কেহ কেহ আপনাদের যোগ্যতা বিষয়ে অতিরিক্ত অভিমানী। যাঁহার অধীনে কর্ম করা যায়, যোগ্যতার অভিমান থাকিলে, কখন কখন তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে। অযোগ্য ব্যক্তিরা উচ্চপদ সর্বদা পায়; অধীন ব্যক্তিরা যোগ্য হইলেও উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব ঘটে। এক পক্ষের তাচ্ছিল্য, অপর পক্ষের বিরুদ্ধতা, ফল অধীনের অনিষ্ট। এইজন্য কেহ কেহ বলেন—

যার অধীনে কাজ করি।
কেন না তার পায়ে ধরি॥

যোগ্যতা থাকিলে, তাচ্ছিল্য নানা বিষয়ে নানা প্রকারে উপস্থিত হয়। বালকেরা নীতিকথায় পড়িয়া থাকে যে, এক খরগস ও এক কচ্ছপ উভয়ে কথা হইল যে, আইস আমাদের মধ্যে কে অগ্রে ঐ পর্বতে পৌছিতে পারে। মন্দগতি কচ্ছপ তৎক্ষণাৎ ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। খরগস ভাবিল, আমি যখন ইচ্ছা তখন গেলেও কচ্ছপের পূর্বে পৌছিব। অতএব তাচ্ছিল্য করিয়া নিদ্রা গেল। নিদ্রাভঙ্গে দেখে কচ্ছপ বহু পূর্বে পৌছিয়াছে। যোগ্য অযোগ্যের কার্যপ্রণালী প্রায় এইরূপই ঘটে। এক পক্ষের যত্ন, অপর পক্ষের তাচ্ছিল্য। ফল ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির পরাজয়।

বিদ্বান ও বুদ্ধিমানেরা অনেকে যে কৃতকার্য হইতে পারেন না, তাহার এক বিশেষ কারণ যে, তাঁহারা উচিত বা উপযুক্ত বিষয়ে নিযুক্ত না হইয়া হয়ত বিপরীত বিষয়ে লিপ্ত হন। যে ব্যক্তি বক্তৃতাশক্তিতে বঞ্চিত, তিনি হয়ত উকিল হইলেন। যিনি বক্তৃতাতে অদ্বিতীয় হইতেন, তিনি হয়ত যোদ্ধা হইলেন। যিনি মহাযোদ্ধা হইতেন, তিনি হয়ত কেরাণী হইলেন। মধ্যে মধ্যে শুনা যায় যে, কেরাণী কলম ফেলিয়া তরবার ধরিবা মাত্র দেশ জয় হইল। তাহার মূল কারণ এই, প্রকৃত যোদ্ধা কেরাণীর আসনে এতদিন বসিয়া মাটি হইতে ছিলেন।

সকল দেশেই এইরূপ সর্বদা হইয়া থাকে, বিশেষত হিন্দুসমাজে। তাহার বিশেষ কারণ, আমরা পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া থাকি। স্বজাতি ব্যবসায়ে আমাদের অধিকার বা ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, তাহা অবলম্বন করিতে হয়। যে ব্যবসায়ে আমরা কৃতকার্য হইতে পারিতাম, তাহা গ্রহণ করা হয় না।

ইদানীন্তন পুরাতন প্রথা পরিবর্তন হইতেছে। স্বজাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু ইচ্ছার ভ্রান্তি হয়। যে বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তি নাই, হয়ত কখন হইবেও না, সেই বিষয়ে সময় নষ্ট করিতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কর্ণের দোষে যাহার কখন স্বরবোধ হইবার সম্ভাবনা নাই, সে হয়ত গায়ক হইবে ইচ্ছায় বহুকাল পরিশ্রম করে। যে অদ্বিতীয় চিকিৎসক হইত, চিত্রকর হইবার সাধ তাহার হয়ত অতি প্রবল হইল। যদিও এরূপ প্রবৃত্তি সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক নহে। বিশেষ কারণে প্রবৃত্তির এরূপ ভ্রম ঘটিয়া থাকে; প্রশংসাপ্রিয়তা অনেক সময় এ ভ্রান্তির হেতু বলিয়া বোধ হয়। কোন সুকণ্ঠ গায়ক আবাল বৃদ্ধের বিশেষ

প্রশংসা ভাজন হইল দেখিয়া, কেহ গায়ক হইতে সাধ করিল। হয়ত সে ব্যক্তি অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিলে সেইরূপ প্রশংসার পাত্র হইতে পারিত; কিন্তু সে ব্যবসায়ে প্রশংসিত ব্যক্তি কেহ তাঁহার চক্ষে পড়িল না বলিয়াই ভ্রমবশত গায়ক হইতে তাহার চেষ্টা হইল।

স্বজাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া আপন আপন ক্ষমতা উপযোগী বৃত্তি অবলম্বন করিবার পক্ষে ইদানীং এক বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। (university) ইউনিভারসিটি তাহা ঘটাইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় নিজ বিধান দ্বারা জানাইয়াছেন যে, নানা শাস্ত্র তুল্যানুতুল্যরূপে শিখিতে হইবে। যে তাহা না পারিবে, তাহাকে একেবারে কিছুই শিখিতে দিব না। ইউনিভারসিটিতে প্রবেশ করিতেও দিব না। সে যদি তথাপি এ দেশে থাকে, তাহাকে মূর্খ করিয়া রাখিব। সে ব্যক্তি প্রতিভাশালী হইলেও, তাহাকে কিছুই শিখিতে দিব না। রাজকার্যে বঞ্চিত করিব, তাহার উন্নতির ব্যাঘাত দিব। কাজেই অনেক বুদ্ধিমানকে মূর্খ হইয়া থাকিতে হইতেছে। যাহার সকল বিষয়ে কিছু কিছু বুদ্ধি আছে, কোন বিষয়ে তাহার বিশেষ বুদ্ধি না থাকিলেও সে ব্যক্তি বিদ্যোপার্জনে অধিকারী বলিয়া গৃহীত হইতেছে; কিন্তু যাহার বিষয় বিশেষে অসাধারণ বুদ্ধি আছে, কিন্তু সকল বিষয়ে সমান প্রবৃত্তি নাই, তাহাকে অনধিকারী বলিয়া তাহার শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করা হইতেছে। যে ব্যক্তি রসায়ন শাস্ত্রে অসাধারণ হইয়া দেশের হিতসাধন করিতেন, তিনি সাহিত্যের শ্লোক শিখিতে অমনোযোগী বলিয়া তাঁহাকে রসায়ন শাস্ত্র শিখিতে বঞ্চিত করা হইতেছে। যিনি সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইতেন, তিনি জমি জরীপ করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার সাহিত্য শিক্ষার পথরোধ করা হইতেছে। শিক্ষাদানের এরূপ পক্ষপাতিত্ব পঁচিশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এ পক্ষপাতিত্ব দ্বারা দেশের কি বিশেষ ইষ্টসাধন হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি স্পষ্ট জানা যায় নাই। যাহা হইয়াছে, অপক্ষপাতী শিক্ষাদানে তাহা যে কোন মতে হইত না, এ মতও লক্ষণ পাওয়া যায় না। এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অনেকে বি. এ. অনেকে এম. এ. উপাধি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কোন বিষয়ে যে বিখ্যাতনামা হইয়াছেন, এমত আমরা শুনি নাই। সকলেই দশকর্মা হইয়াছেন, এইমাত্র শুনা যায়। বরং তাঁহাদের অধিকাংশই মধ্যবিধ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বোধ হয় নানা বিষয় তাঁহাদের শিখিতে হয় বলিয়া কোন বিষয় বিশেষ করিয়া

তাঁহারা শিখিতে পারেন নাই। কাজেই খ্যাতিমানও হন নাই। নানা শাস্ত্র অল্প অল্প শিক্ষা ভাল, কি এক শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষা ভাল, এ বিচার করিবার নিমিত্ত আমরা এ কথা তুলি নাই। আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, এক বিষয়ে কোন ব্যক্তির যদি বিশেষ বুদ্ধি বা প্রতিভা থাকে, তাহার সেই বিশেষ বুদ্ধির স্ফূর্তি হইবার পক্ষে আমাদের ইউনিভারসিটি নিতান্ত বিরোধী। এতদূর পর্যন্ত বিরোধী যে, পাছে সে ব্যক্তি কোনরূপে আত্মশক্তি অনুযায়ী শিক্ষা পায়, এই আশঙ্কায় সকল কলেজের দ্বার রুদ্ধ করা হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, যদি সে ব্যক্তি স্বচেষ্টায় আপনার উন্নতি সাধন করিতে যায়, ইউনিভারসিটি যেন বিমাতার ন্যায় তাহার উন্নতির পন্থা রোধ করেন। বিমাতা যদি শুনেন, ওকালতিতে তাহার বিশেষ অধিকার হইয়াছে, অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার চুল ধরিয়া বলেন—তুমি আমার নও, কাজেই তোমার উন্নতি নাই। তুমি আপনার চেষ্টা করিতে পাইবে না, আমার বাছাদের অন্নের ব্যাঘাত দিতে পারিবে না, তোমায় আমি উকিল হইতে দিব না।

হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ ব্যবহার সাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের উন্নতির পক্ষে অনিষ্টকর। আমরা তাহাই বলিতেছিলাম যে, আপন ক্ষমতোপযোগী বৃত্তি অবলম্বন পক্ষে নূতন ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে।

যাঁহারা জানেন যে, আমাদের কলিকাতা ইউনিভারসিটি বিলাতের লণ্ডন ইউনিভারসিটির অনুকরণ, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, আমরা যাহা বলিতেছি, বাস্তবিক তাহা সত্য হইলে লণ্ডন ইউনিভারসিটির অন্য নিয়ম হইত। বিলাতে যে পদ্ধতি ভাল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, বাঙ্গালায় তাহা মন্দ কেন হইবে? কিন্তু তাঁহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি এ বিষয় বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, ইংরেজদের বুদ্ধি বহুমুখী, নানা শাস্ত্র শিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অতি সহজ। কেবল সাহিত্য আর শুভঙ্করী অঙ্ক আমরা পুরুষানুক্রমে শিখিয়া আসিয়াছি; কিন্তু ইংরেজেরা নানা শাস্ত্র অনেক পুরুষ অবধি আলোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে নানা শাস্ত্র শিক্ষা বৈজিক কারণে সহজ, আমাদের পক্ষে তাহা তত নহে। কিছু পুরুষ পরে সহজ হইতে পারে, আপাতত নহে। লণ্ডন ইউনিভারসিটির শিক্ষিত সাহেবেরা সকল বিষয়ে মজবুত, চৌকস, চালাক। আমাদের সেইরূপ কর্মঠ করিবার নিমিত্ত লণ্ডন ইউনিভারসিটির অনুকরণ এখানে স্থাপন করা হইয়াছে। আমাদের

পণ্ডিত করিবার নিমিত্ত কলিকাতা ইউনিভারসিটি হয় নাই। সেইজন্য যাঁহারা পণ্ডিত হইতে পারিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষায় বঞ্চিত হইতেছেন। বিলাতে এ ভুল সংশোধিত হইবার অন্য উপায় আছে। আমাদের মোটে একটি ইউনিভারসিটি, তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারিলে কোন কলেজে অধ্যয়নের উপায় নাই।

উন্নতির বিরোধী আর এক বিশেষ কারণ আছে—নিস্পৃহতা। আকাঙ্ক্ষা-হীন হওয়া প্রশংসার বিষয় বটে, কিন্তু উন্নতি সম্বন্ধে নহে। আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে বিশেষ চেষ্টা হয় না। উন্নতির ইচ্ছা অনেকের আছে সত্য, কিন্তু সে ইচ্ছা বিশেষ প্রবল নহে। নিজ নিজ অবস্থায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট অল্প লোকে, উন্নতি হইলে ভাল হয়, তাহা না হইলেও ক্ষতি নাই, ইহা অনেকের মনোগত ভাব। তাঁহাদের চেষ্টা বা উদ্যোগ কাজেই সামান্যরূপ হয়। তাহাই আমরা এ প্রবন্ধের শিরোভাগে বলিয়াছি—'অসন্তোষ, অতৃপ্তি উন্নতির মূল ভিত্তি।' নীতিজ্ঞেরা আমাদের এ কথায় খড়্গ হস্ত হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা নীতিকথা বলি নাই, উন্নতির কথা বলিতেছি। তাঁহাদের আপত্তি থাকে, উন্নতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরুন। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে যে নিয়ম, সমাজের পক্ষেও সেই নিয়ম। যেমন চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ চলিবে বলিয়া বসিয়া থাকিলে একপক্ষে ব্যক্তি বিশেষের উন্নতি হয় না, অপর পক্ষে সমাজেরও উন্নতি হয় না। যে সকল সমাজ বিশেষ উন্নত, সে সকল সমাজের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অতৃপ্তই উন্নতির মূল।

আর একটি কথা আছে। বর্তমান সময়ে যাঁহারা রাজপদে থাকিয়া উন্নতির প্রার্থী হন, তাঁহাদের ইংরেজিতে বাক্‌পটুতা আবশ্যক। ইংরেজেরা গুণগ্রাহী যতই হউন, তাঁহারা বিদেশী, আমাদের দোষগুণ বুঝা তাঁহাদের পক্ষে সহজ নহে। তাঁহারা আপনা আপনি যতই যে বিষয়ে আস্ফালন করুন, আমরা জানি তাঁহাদের ভ্রান্তি হইয়া থাকে। এক শত বৎসর অবধি তাঁহারা এই আস্ফালন করিতেছেন; কিন্তু অদ্যাপি কিছু বুঝিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহাই হউক, এক্ষণে দেখা যায় যে, তাঁহাদের নিজ ভাষায় আমরা বিশুদ্ধ ভাবে কথা কহিলে, দোষ গুণ বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, ভাষার গুণে বক্তার প্রতি তাঁহাদের কতক শ্রদ্ধা হয়। বিশেষত বিশুদ্ধ ইংরেজি শিখিতে পারিলে, যে পরিমাণে অধ্যয়ন আবশ্যক তাহাতে ইংরেজি ভাব অনেক শিক্ষা হয়। সহজেই তাহা কথায় বিস্তৃত হইয়া বাঙালী ভাব গোপন করে। সঙ্গে

সঙ্গে বক্তার দোষও ঢাকা পড়ে। এইজন্য ইদানীন্তন অনেক নীচ প্রবৃত্তির লোক ইংরেজির গুণে উচ্চ পদাভিষিক্ত হইতেছে।

ইংরেজি আর এক কারণে বিশেষ করিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক। যে সকল ব্যবহার আমাদের চক্ষে ভাল, ইংরেজের চক্ষে মন্দ, ইংরেজি জানিলে তাহা বর্জন করা যায়। হেঁট মস্তক নিম্নদৃষ্টি আমাদের চক্ষে নম্রতার পরিচায়ক। ইংরেজি চক্ষে তাহা অপরাধের চিহ্ন। আমাদের ব্যবহারানুরূপ যে ব্যক্তি সাহেবদিগের নিকট নম্রতা দেখাইল, সে একেবারে মজিল। এই সকল ব্যবহারের ও প্রথার তারতম্য জানিবার নিমিত্তও ইংরেজি বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক।

এই স্থলে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে ভাল হয় না। পরিচ্ছদ অনেক সময়ে উন্নতির সহায়তা করে; আবার অনেক সময় বৈরিতা সাধে। অতএব বুঝিয়া পরিচ্ছদ পরা আবশ্যক। আমরা সচরাচর বুঝি যে, পরিচ্ছদ ধন সম্পত্তির পরিচায়ক। ইংরেজেরা তাহার অতিরিক্ত আর একটু বুঝেন। পরিচ্ছদ মানসিক বৃত্তির পরিচায়ক। কে অসার ব্যক্তি, কে আড়ম্বরের লোক, কাহার নীচপ্রবৃত্তি, কে সাদাসিধে লোক. তাহা পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহারা বিচার করেন, এ বিচার প্রবণতা অসঙ্গত নহে। অতএব পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি রাখা ভাল। বিশেষত কতকগুলি ইদানীন্তন পরিচ্ছদ হইতে আমাদের কার্য পর্যন্ত অনুভব করিতে চাহেন। আমরা তাঁহাদের সম্মান করিতে গিয়াছি, কি অপমান করিতে গিয়াছি, তাহা তাঁহারা দূর হইতে আমাদের পোষাক দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। যেখানে এতদূর অনুভব চলিতেছে, সেখানে অবশ্য বলিতে হইবে, পোষাক ভাল মন্দ ফল দিবার কতক মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক সময়ে আমরা দেখিয়াছি, জুতার দোষে একজনের অবনতি হইয়াছিল। টুপিতে আর একজনের সর্বনাশ করিয়াছিল। পয়সা দিয়া এ শত্রু কেন ঘরে আনিয়া ছিলেন বলিয়া তিনি সর্বদাই আক্ষেপ করিতেন। এ দেশের প্রচলিত কথা আছে যে, 'আবরুচি খানা, পররুচি পেহেন্না' এ পুরাতন কথা ভুলিবার প্রয়োজন কি? অন্যের যাহাতে বিরক্তি জন্মে, এমত পরিচ্ছদ পরিয়া আপনার অনিষ্ট সাধনের প্রয়োজন কি? সংসারের সকল ভার বহন করিয়া সামান্য এক পাগড়ির ভার যাহাদের অসহ্য বোধ হয় তাহারা কাপুরুষ। আমরা তাহাদের অশ্রদ্ধা করি।

[এই যে 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করলাম, এর 'যে সকল সমাজ বিশেষ উন্নত, সে সকল সমাজের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অতৃপ্তই উন্নতির মূল'—এই বাক্যটি থেকে পরিষ্কার জানা গেল, সঞ্জীবচন্দ্র নানা দেশের সমাজের ইতিবৃত্ত অর্থাৎ Sociologyর বইও পড়তেন। তাঁর এই Sociologyর বই পড়া সম্পর্কে আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

সঞ্জীবচন্দ্র পরিণত বয়সে কখন কখন নিজের জীবনের কোন কোন বিশেষ দিনের ঘটনা টুকরো কাগজে অথবা ছোট খাতায় লিখে রাখতেন। তাঁর এইরূপ তিন বারের কয়েক দিনের করে দিনলিপি পাওয়া গেছে। প্রথম-বারের দিনলিপিটি একটা ছোট কাগজের দু পিঠে দু দিনের ঘটনার উল্লেখমাত্র। ঐ দুদিন হ'ল—১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ও ১৬ই এপ্রিল। ১৬ই এপ্রিলে লেখা দিনলিপিটি এই—

16th April '81

Morning—Read Sociology for 2 hours
...Faust for half hour
Noon—Read Sociology and suptd.
takeed for—4 hours
Evening—Talked away—0

There was rain and hail storm in the evening, Haraprosad came, read Madhabilata from Magh Bangadarsan.

এই দিনলিপির সুপারিনটেনডেণ্টকে তাগিদ বা তাগাদা দেওয়ার কথাটা মনে হয়, তাঁর বঙ্গদর্শন প্রেসের কর্মাধ্যক্ষকে তাগাদা দেওয়া।

দিনলিপির হরপ্রসাদ হলেন, সঞ্জীবচন্দ্রের বাড়ীর অদূরে নৈহাটী নিবাসী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইনি সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েরই অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন।

মাধবীলতা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা উপন্যাস। এই উপন্যাসটি তখন সঞ্জীবচন্দ্রের নিজেরই সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল।

যাই হোক, এই দিনলিপি থেকে দেখা গেল, তিনি তখন Sociology পড়ছেন।

পদোন্নতির পন্থা প্রবন্ধের প্রথমে সঞ্জীবচন্দ্র, একখানি পত্রের কিছুটা উদ্ধৃত করছি. বলেছেন। মনে হয়, ঐ পত্র তাঁরই রচনা।

আমার ধারণা, সঞ্জীবচন্দ্রের এই প্রবন্ধের রামধন দাদার কাহিনী অবলম্বনেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' রচনা করেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের এই 'পদোন্নতির পন্থা' একটি পরিচ্ছন্ন, অম্লমধুর অথচ বেশ শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ। এর তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত অত্যন্ত তীব্র ও কঠোর ব্যঙ্গাত্মক রচনা।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধে গঙ্গাপ্রহরী ও রামধন দাদার কাহিনীতে কিছুটা ব্যঙ্গ থাকলেও, এমন সহজ, সরল ও সাধারণভাবে গল্প দুটি বলা হয়েছে যে, তাতে কারও রাগ করার বা জ্বালা অনুভব করার অবকাশ নেই। অথচ এর তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মুচিরামে একেবারে শুরু থেকেই অনেকের রাগের কারণ হয়েছেন। যেমন. প্রথমত—মচিরামকে যে সম্প্রদায়ের বা জাতির লোক বলে দেখানো হয়েছে, কাহিনীর গোড়াতেই সেই সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিছু কিছু অশ্রদ্ধার কথা থাকায়, তাঁরা স্বভাবতই এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ক্ষুব্ধ।

দ্বিতীয়ত—উকিল এবং ডেপুটিদের নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মুচিরামে বেশ কিছুটা বাড়াবাড়িই করেছেন। যেমন—উকিলদের কাছেও গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়, লিখে উকিলদের প্রতি মন্তব্য করেছেন। আর 'মুচিরাম যে মূর্খ তাহাতে কিছু আসে যায় না। সেরূপ অনেক ডেপুটি আছে। ডেপুটিগিরিতে বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না।'—এই কথা লিখেও তিনি ডেপুটিদের রীতিমতই হেয় করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি যে ডেপুটির পদে আসীন ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে তাঁরা কেউই মুচিরামের মত অত বড় মূর্খ ছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত লেখেন, তার কিছু দিন আগেই তাঁর মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রকে পরীক্ষায় ফেল হওয়ার অজুহাতে ডেপুটির চাকরি থেকে অপসারিত করা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও লিখেছেন—ডেপুটির চাকরিতে পাকা হতে হলে, তখন দুটো পরীক্ষায় পাস করতে হ'ত।—সঞ্জীবচন্দ্রের চাকরি যাওয়ার আলোচনায় আমরা আগে দেখেছি, ডেপুটির পরীক্ষা একেবারে সহজও ছিল না। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরামকে ডেপুটি

খাড়া করে, ডেপুটিগিরিতে বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না, বলে যাই লিখুন, অন্তত ডেপুটির পরীক্ষায় তখন যে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন ছিল, তা স্বীকার করতেই হবে। অথচ ঐ বিদ্যাবুদ্ধির কণামাত্রও মুচিরামে ছিল না।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধে রামধন দাদার কাহিনীতে রামধনের হাকিম বা মুন্সেফ হওয়ার কথা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও আছে—'জজ সাহেব একবার মাত্র বলিলেন—বিচারের কার্য অতি কঠিন। রামধন মূর্খ, তাহা পারিবে না।—মেমসাহেব বলিলেন—বিচারে যাহা ত্রুটি হয়, আপীলে তাহা সংশোধন হইয়া যাইবে।'

শুধু এই নয়, আরও আছে—রামধন বিচারে যত হউক বা না হউক, রফা দ্বারা অনেক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন।

এই সব কথা দ্বারা মূর্খ রামধনকে হাকিম দেখিয়েও তার অক্ষমতার দিকটাও নিপুণভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মূর্খ মুচিরামকে ডেপুটি করে তার অক্ষমতার দিকটা নিখে এমনভাবে দেখাতে পারেন নি। আর সব চেয়ে বড় কথা, রামধনের কাহিনী পড়ে কারও ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন কারণ নেই। তাই আমার মনে হয়, সব দিক থেকে বিচার করলে বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরামের চেয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধের এই রামধন অধিকতর সার্থক।]

ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম

[পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রকে লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের একটি চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি—

প্রণাধিকেষু,

অনেকদিনের পর তোমার পত্র পাইলাম। আমি বাটী যাইয়া রাধানাথকে বঙ্গদর্শন কার্য হইতে একেবারে বিদায় দিব। আমি তাহাকে অদ্য…পত্র লিখিলাম। তিনি হিসাব…বাটী আসিবেন। হিসাব দিতে পারিলেও তাঁহার হস্ত হইতে কার্যভার উঠাইয়া লইব।… তোমার সেজকাকার ক… নহে।…তোমার nervousness গিয়াছে কিনা লেখ নাই। বোধ হয় গিয়াছে। নতুবা এত বড় পত্র লিখিতে পারিতে না। আমি যে 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' বলিয়া আর্টিকেল পাঠাইয়াছি, তাহার গেলি প্রুফ কি…পৌছ সম্বাদ কিছু…না। ইতি ২১ মার্চ।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই চিঠির মধ্যেকার '…' চিহ্নিত অংশগুলি ছিন্ন। তবুও এই ছিন্ন চিঠি থেকেই পরিষ্কার জানা গেল—সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের জন্য 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম, নামে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, সঞ্জীবচন্দ্র ঐ সময় যশোহরে স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রারের চাকরি করতেন। তিনি সেখান থেকেই প্রবন্ধটি পাঠিয়ে ছিলেন।

এই প্রবন্ধটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের নিজেরই লেখা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ ছিন্ন অবস্থায় আজও 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় রয়েছে। আর ঐ পাণ্ডুলিপি সঞ্জীবচন্দ্রের নিজেরই হাতে লেখা। আগে 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধের শুরুতে 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় পাওয়া যে ছিন্ন খাতাটির কথা বলেছি, সেই খাতার শেষের বাংলা লেখাটি এই 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধেরই কিছুটার অংশ।

সঞ্জীবচন্দ্রের চিঠির রাধানাথ হলেন রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি

সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা ও সঞ্জীবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শন প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

আর চিঠির তোমার সেজকাকা হলেন—বঙ্কিমচন্দ্র।

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৮৪ ও ১২৮৫ এই দু বছর বঙ্গদর্শন নিয়মিত প্রকাশিত হলেও, সারা ১২৮৬ সালটাতে বঙ্গদর্শন বন্ধ থাকে। ১২৮৭ সালের বৈশাখ থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাতেই বঙ্গদর্শন আবার প্রকাশিত হতে থাকে। এই ১২৮৭ সালের বৈশাখ সংখ্যার প্রথমেই 'ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল। বঙ্গদর্শনের অধিকাংশ প্রবন্ধের ন্যায় এই প্রবন্ধের সঙ্গেও লেখকের নাম ছিল না। সারা '৮৬ সালটায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত না হওয়ায়, সঞ্জীবচন্দ্র যথেষ্ট অবসর পেয়ে পড়াশুনা করে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন—]

ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ,

পূর্ব সূত্র,

যে অবধি ঈশ্বরের ন্যায় মনুষ্যও সাকার ও নিরাকার এই দুই বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে, সেই অবধি এক নূতন যুগোৎপত্তি হইয়াছে। ঈশ্বরের দ্বৈতবাদ আছে, মনুষ্যেরও তাহা ঘটিয়াছে। এই দ্বৈতবাদীরা বলেন, তুমি আমি প্রত্যেকের ভিতর আর একটি করিয়া তুমি আমি আছে। যেটি দেখা যায়, সেটি সাকার মনুষ্য; আবার তাহার ভিতর যেটি আছে, সেটি নিরাকার মনুষ্য। কেহ সেটিকে দেখিতে পায় না, সেটিও কোন কার্য করে না; অথচ সেটি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা, ধর্মযাজকেরা সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, মনুষ্যের ভিতর মনুষ্য আছে। তুমি জানিতেছ না, তুমি বুঝিতেছ না, তোমার ভিতর আর একজন আছে তাহার নাম আত্মা।

দ্বৈতবাদীরা আরও বলেন যে, মৃত্যুর পর নিরাকার মনুষ্য প্রকাশ পায়; সেই নিরাকার অবস্থায় সুখ দুঃখ সকলই ভোগ করিতে হয়। আমি যদি

মৃত্যুর পর স্বর্গে যাই, উত্তম বস্ত্র পরিব, চন্দন মাখিব, পুষ্পহার গলায় দিব, সিংহাসনে বসিব, অপ্সরার গীতি শুনিব, আহার নিদ্রার ত কথাই নাই। তখন শরীর নাই থাকুক, এ সকল শারীরিক সুখ ভোগের কোন ব্যাঘাতই ঘটিবে না। আর যদি নরকে যাই—এই লেখার পর তাহাই সম্ভব—তাহা হইলে নানা বর্ণের অনন্ত অগ্নি আমার নিরাকার দেহকে দগ্ধ করিবে, আমি জ্বালায় যন্ত্রণায় চীৎকার করিব, ডাক্তার পাইব না, ঔষধ পাইব না, ফোস্কা গালিতে একটি আত্মীয়ও পাইব না। যদি স্বর্গে যাইতে না পাই, আর নরকেও স্থান না হয়—ইদানীং শুনিতেছি, নরকে নাকি স্থানাভাব হইয়াছে, আমিও সেই ভরসায় কলম ধরিয়াছি—যদি স্বর্গে যাইতে না পাই, নরকেও স্থান না হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর আমি এইখানেই থাকিব, তখন দেহ থাকিবে না, কাজেই তোমরা আমায় দেখিলে প্রেত বলিয়া ভয় পাইবে।

এইরূপ আবার বস্ত্র, চন্দন, পুষ্প, সকলের আত্মা আছে, নতুবা তাহারা স্বর্গে যায় কিরূপে? যদি সেখানে তাঁতিরা গিয়া তাঁত বোনে, মালিরা গিয়া মালঞ্চ করে, তাহা হইলে সেখানে ঢাকাই ধুতি, বেনারসি চেলি জন্মিলে জন্মিতে পারে; কিন্তু সেখানে যদি তাঁতি, মালি প্রভৃতি ইতর জাতিরা যাইতে না পায় বা যাইয়া যদি তন্তুবয়ন করিতে না পায়, তাহা হইলে বস্ত্র কোথা হইতে আইসে? কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের এই পুরাতন বস্ত্রের আত্মারা স্বর্গে গিয়া ব্যবহৃত হয়। অতএব আত্মা যে কেবল আমাদের আছে, এমত নহে। কড়িগুলির আত্মা আছে, বৈতরিণী পার হইবার নিমিত্ত যে কয়েক কড়া কড়ি আমরা পাইয়া থাকি, যদি তাহাদের আত্মা না থাকে, তাহা হইলে এরূপ কড়ি আমাদের সঙ্গে দিবার ফল কি? কড়ি সরায় পড়িয়া থাকে, এ অবস্থায় বুঝিতে হইবে কড়ির আত্মারা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায়, অন্তত পারঘাটা পর্যন্ত।

রহস্য এক্ষণে এই পর্যন্ত। আমরা বলিতেছিলাম যে, যে অবধি মনুষ্যের সম্বন্ধে দ্বৈতবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে, সেই অবধি নূতন কল্প আরম্ভ হইয়াছে। সেই অবধি প্রথম ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাহার পূর্বাবধি ধর্ম গঠিবার কিছু কিছু মাত্র উদ্যোগ ছিল। ভয় মনুষ্যের স্বভাবত প্রবল—সেই ভয় হইতে দুই এক দেবতার কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল। অগ্নিদেবতা, কেন না হাত পুড়ায়; বায়ুদেবতা, কেন না ঘর ভাঙ্গে; বরুণদেবতা কেন না জলে ভাসায়; ইহাদের পূজা করা উচিত। তাহা হইলে এ সংসার যাত্রা নির্বিঘ্নে চলিবে। এইরূপে

সামান্ত মত ধর্ম উদ্ভাবিত হইতেছিল। স্বর্গ, নরক, আত্মা, পরমাত্মা, এ সকল কথার সৃষ্টি তখন হয় নাই। কাজেই ধর্ম কেবল ঐহিকী ছিল। লোকের চরিত্রও তখন পৈশাচিকবৎ ছিল—ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্দম, ভল্লুকের ন্যায় পররক্তপ্রিয়, দয়া দাক্ষিণ্য একেবারে বিরহিত; এরূপ প্রকৃতি অগ্নি বায়ু দেবতার দ্বারা উদ্দীপ্ত ব্যতীত দমিত হইবার সম্ভাবনা হয় নাই।

তাহার পর মনুষ্যের ভিতর মনুষ্য আছে, এই অনুভব ভারতবর্ষে প্রথমে উত্থাপন হইল। উত্থাপিত হইবামাত্রই নূতন এক ধর্ম স্বতঃ উপস্থিত হইল। মৃত্যুর পর আত্মা জীবিত থাকে, এই অনুভবের সঙ্গে ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য এ সকল আনুষঙ্গিক কথা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, একে একে তাহা সমুদায় অনুভব হইয়া নূতন ধর্মের উৎপত্তি হইল। যে ব্যক্তি আত্মবাদ স্বীকার করিল, তাহাকেই সেই নূতন ধর্ম গ্রহণ করিতে হইল। পৃথিবীর যাবতীয় বিচক্ষণ জাতি প্রায় সকলেই ক্রমে ক্রমে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া একে একে সকলেই এই আত্মামূলক নূতন ধর্ম গ্রহণ করিল। ভারতবর্ষ হইতে মিশররাজ্যে এই ধর্ম প্রথম প্রচার হয়, তথা হইতে য়ুনানীদেশে গৃহীত হয়। মুষা এই ধর্ম মিশরদেশ হইতে আপন দেশে লইয়া যান। মুষা হইতে পরম্পরা যীশুখ্রীষ্ট (অনেকে বলেন যে, যীশুখ্রীষ্ট আত্মা স্বীকার করিতেন না। কিন্তু সে কথা অমূলক বলিয়া বোধ হয়। Gospel of St Matthew Chapter X. P. 28 দেখ।) এই ধর্ম অবলম্বন করেন। তাহার পর মহম্মদ এই ধর্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে কাজেই তাঁহাদের উপাসকগণ, ইংরেজ, ফরাশিস, দিনামার, ওলন্দাজ, আরবী, পারসীক প্রভৃতি সকলেই এই ধর্মাবলম্বী হইয়াছেন।

ধর্মটি অতি সহজ। আত্মা স্বীকার করিলেই আপনা আপনি উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা ইহার অনুভব হইয়া যায়। নিম্নলিখিত কয়েকটি উত্তর প্রত্যুত্তর লইয়া এই ধর্ম।

প্রঃ মৃত্যুর পর আত্মা কি করে?

উঃ ঐহিকে যে কার্য করিয়াছে, তাহার ফল ভোগ করে।

প্রঃ কি ফল? কোথায় থাকিয়া তাহা ভোগ করে?

উঃ স্বর্গে থাকিয়া সুখভোগ করে, নরকে থাকিয়া দুঃখ ভোগ করে।

প্রঃ কোন্ কার্যের ফল সুখ, কোন্ কার্যের ফল দুঃখ?

উঃ বিচারকর্তা যে কার্য ভাল বলেন, সেই কর্মের ফল সুখ। বিচারকর্তা যে কার্য মন্দ বলেন, সেই কর্মের ফল দুঃখ।

প্রঃ বিচারকর্তা কে ?

উঃ তাঁহার নাম ঈশ্বর, তিনিই পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন।

প্রঃ কোন কার্য তিনি ভাল বলেন, কোন কার্য তিনি মন্দ বলেন ?

উঃ তিনি তাহা বলিয়া দিয়াছেন।

প্রঃ কাহার নিকট কি প্রকারে বলিয়া দিয়াছেন ?

এই শেষ প্রশ্নের উত্তর লইয়া তর্ক আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয় প্রভৃতি সকল ধর্মেরই মূল এক, কেবল এই স্থান হইতে পার্থক্য অবলম্বন করিয়াছে। এই পার্থক্য সামান্য। মূলধর্ম সম্বন্ধে ইহা দ্বারা কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। সচরাচর লোকেরা যে গুরুতর বৈষম্য দেখে, তাহা প্রথমত উপদেষ্টা সম্বন্ধে, দ্বিতীয়ত ঐতিহাসিক বিষয় সম্বন্ধে, তৃতীয়ত আচার সম্বন্ধে। যে কার্য ঈশ্বরের প্রীতিকর, তাহা তিনি কাহার নিকট বলিয়া দিয়াছেন, এই লইয়া প্রথম তর্ক। হিন্দু মতানুসারে ঈশ্বর আকাশবাণী দ্বারা পাপ পুণ্য বলিয়া দিয়াছেন। খ্রীষ্টান মতানুসারে স্বয়ং আংশিক অবতারস্বরূপ মনুষ্যমধ্যে আসিয়া বলিয়া দিয়াছেন। মুসলমান মতানুসারে মহম্মদের নিকট ঈশ্বর দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন। বেদব্যাস বা শ্রীকৃষ্ণ, মহম্মদ বা যীশুখ্রীষ্ট যিনিই ঈশ্বরবাক্য প্রচার করিবার ভারগ্রহণ করিয়া থাকুন, কেহই মূলধর্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেহই বলেন নাই যে, আত্মা নাই, মৃত্যুর পর সকল ফুরায়। কেহই বলেন নাই যে, স্বর্গ মিথ্যা, নরক মিথ্যা। কেহই বলেন নাই যে, পাপ পুণ্য নাই। কেহই বলেন নাই যে, পাপ পুণ্যের বিচারকর্তা ঈশ্বর নাই। যদি কেহ তাহা না বলিয়া থাকেন, তবে মূল কথার পার্থক্য কই হইল ? দেশ ভেদে বা সময় ভেদে স্বতন্ত্র উপদেষ্টা সম্ভব, উপাসকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত উপদেষ্টার অমানুষিক পরিচয়ও সম্ভব। উপদেষ্টা কে বা কিরূপে তিনি নিজে উপদিষ্ট হইলেন, কেবল এই কথা লইয়া যে উপাসকদের ধর্মজ্ঞান, তাহাদের পক্ষে এই বৈষম্য অতি গুরুতর সন্দেহ নাই। যাহারা মূলধর্ম চিনে নাই, তাহারা কেবল উপদেষ্টা চিনিয়াছে। কাজেই উপদেষ্টা লইয়া তাহারা দলাদলি করে। তাহাদের পরিচয় ধর্ম লইয়া নহে, কর্ম লইয়া নহে, কেবল দলপতি লইয়া।

ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া দ্বিতীয় তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্র না থাকায় সৃষ্টিবিবরণ লিখিবার ভার ধর্মশাস্ত্র স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিল। সৃষ্টি কেহ দেখে নাই; কিন্তু সকল দেশেই এ সম্বন্ধে একটা না একটা প্রবাদ প্রচলিত

হইয়া আসিয়াছিল। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধর্মগ্রন্থে সংগৃহীত হয়, নূতন ধর্মের সহিত সঙ্গতি করিবার নিমিত্ত হয়ত সেই সকল প্রবাদের কোন কোন অংশ পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে; কিন্তু এই সকল সংগৃহীত প্রবাদের সঙ্গে মূলধর্মের সম্বন্ধ অতি অল্প। যদি বল একটি প্রকাণ্ড অণ্ড বা ডিম্ব এক সময় পরমেশ্বর প্রসব করিয়াছিলেন, সেই ডিম্ব তিনখণ্ড করিয়া স্বর্গ, মর্ত, পাতাল হইয়াছিল; এবং সেই ব্রহ্মাণ্ড হইতে জড়জঙ্গম সকল বিনির্গত হইয়াছিল, তাহা বলিলে 'আত্মা পরকালে ফলভোগী' এ কথার অন্যথা কি হইল? অথবা যদি বল সৃষ্টির পূর্বে সকলই অন্ধকারময় ছিল, সেই অন্ধকারে জ্যোতির্ময় ভাসিতে ছিলেন, অথবা যদি বল সৃষ্টির পূর্বে সকলই জলময় ছিল, সেই জলের উপর ঈশ্বর পরিপ্লবভাবে ছিলেন, তাহা হইলে আত্মা পরকালে ফলভোগী এ কথার কিরূপে অন্যথা হইল? যে সকল সামান্য লোকেরা ধর্মগ্রন্থের কেবলমাত্র গ্রন্থ চিনিয়াছে, ধর্ম চিনে নাই, তাহারাই এই সকল প্রবাদ পার্থক্যকে ধর্মপার্থক্য মনে করে।

আচার লইয়া তৃতীয় বৈষম্য। এই পার্থক্য সম্পূর্ণ সম্ভব। দেশভেদে স্বতন্ত্র আচার, স্বতন্ত্র ব্যবহার প্রচলিত হইয়া পড়ে। উত্তপ্তদেশে নিত্য অবগাহন তৃপ্তিজনক, লাপ্লাণ্ডদেশের ন্যায় শীতপ্রধানদেশে তাহা অতি কষ্টকর; কাজেই উত্তপ্তদেশে নিত্যস্নান আচারস্বরূপ হইয়া পড়ে; শীতপ্রধানদেশে তাহা হয় না। এই স্থলে উত্তপ্তদেশের ধর্মগ্রন্থে যদি নিত্যস্নানের ব্যবস্থা থাকে, আর শীতপ্রধানদেশের ধর্মগ্রন্থে তাহা না থাকে, তাহা হইলে সামান্য লোকেরা ইহা গুরুতর বৈষম্য বিবেচনা করে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা ধর্মগত বৈষম্য নহে। স্নান, আহার ধর্মান্তর্গত হইতে পারে না। যদি কোন ধর্মোপদেষ্টা বিবেচনা করেন যে, স্নানের দোষ গুণ পরকাল পর্যন্ত পৌঁছে, তাঁহার উপদেশ কেবল অতি সামান্য লোকেরা গ্রহণ করে। এরূপ অবিবেচক ধর্মবেত্তা অনেক ছিলেন। কোন্ কার্য ঈশ্বরের প্রীতিকর তাহার উপদেশ দিতে গিয়া দুই একজন বা নির্ভয়ে সার কথা বলিয়াছেন, নতুবা অধিকাংশ উপদেষ্টারা কুসংস্কারাবৃত স্বদেশবাসীদের মন রক্ষা করিয়াছেন। এইজন্য আচারগত বৈষম্য থাকিয়া গিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, দাড়ি দেখিলে ঈশ্বর বড় প্রীত হন। কেহ বলিয়াছেন, আহার লইয়া ঈশ্বরের বড় পীড়াপীড়ি। কেহ বা খাওয়া পরার সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ঈশ্বরের পারিতোষিক লইয়া আরও মতান্তর আছে; কেহ বলেন, তাঁহাকে পুষ্পচন্দন দিলে তিনি

বড় স্নিগ্ধ হন। কেহ বলেন, তাঁহার প্রশংসা করিলে তিনি বড় খুশী হন। কেহ বলেন, তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিলে বড় আপ্যায়িত হন; কেহ বলেন, তাঁহার নিকট নম্রতা স্বীকার করিলে তিনি চিরবাধিত হন। কেহ কেহ আবার তাহা স্বীকার করেন না। এইরূপে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু এ সকল নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী কথা ছাড়িয়া যখন তাঁহারা মূলকথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন সকলেই এক মত। মনুষ্যের পৈশাচিক প্রবৃত্তি সংশোধন করিবার নিমিত্ত সকলেই আত্মসংযম একবাক্যে উপদেশ করিয়াছেন। সকলেই বলিয়াছেন, স্বার্থপরতাশূন্য হইয়া পরোপকার সাধন করিবে। আত্ম-ক্লেশ স্বীকার করিয়া পরহিত সাধন করিবে। ইহাই ঈশ্বরের প্রীতিকর কার্য। মিথ্যা কথায় পরের অনিষ্ট সম্ভব, এইজন্য সত্যবাদী হইবে। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইলে অন্যের অনিষ্ট হয়, এইজন্য জিতেন্দ্রিয় হইবে। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হইলে স্বর্গ নিশ্চয়। এইরূপ মূল নীতি সম্বন্ধে কোন অনৈক্য নাই।

যে সকল কার্যে ঈশ্বরের প্রীতি সাধন হয় বলিয়া মূলধর্মে সকল দেশেই বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই উপলব্ধি হয় যে, ঈশ্বরের প্রীতিসাধন এ ধর্মের যত উদ্দেশ্য হউক না হউক, মনুষ্য মধ্যে ভ্রাতৃভাব-সংবদ্ধ করা এই ধর্মের বিশেষ উদ্দেশ্য, অথবা সমাজসূত্র দৃঢ়ীভূত করিয়া যাহাতে সমাজের আভ্যন্তরিক শক্তি ক্রমে বিকাশ পায়, তাহার সহায়তা করা এই মূলধর্মের উদ্দেশ্য। প্রথমে ব্যক্তিগত দোষ সংশোধিত হইলে, শেষ সমাজ-গত দোষের অপনয়ন হইবে। আত্মামূলক ধর্মদ্বারা কয়েক হাজার বৎসর অবধি ব্যক্তিগত দোষের সংশোধন আরম্ভ হইয়াছে। এই ধর্মাবলম্বীদিগের আর পূর্বমত পৈশাচিক প্রবৃত্তি নাই, সামান্য ব্যক্তিগত দোষ কোন কোন অংশে পূর্বমত থাকিলে থাকিতে পারে; কিন্তু সাধারণত পৈশাচিকত্ব ঘুচিয়া মনুষ্যত্ব আরম্ভ হইয়াছে। আমরা তাহাই বলিতেছিলাম, যে পর্যন্ত আত্মানুভব হইয়াছে, সেই পর্যন্ত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে নূতন যুগোৎপত্তি আরম্ভ হইয়াছে।

আত্মা অনুভব প্রথম কে করিল তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। যিনিই করুন, তিনিই মনুষ্যের মহাগুরু ছিলেন। তিনি যে বীজমন্ত্র দিয়াছেন তাহার শক্তি অসীম। এই বীজ উচ্চারণ মাত্রেই মনুষ্যত্বের প্রথম দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক কাল হইবে মানবস্রোত এই দ্বার দিয়া বহিতেছে। দ্বিতীয় দ্বারে পৌঁছিতে বিলম্ব আছে। যে মহাগুরু দ্বিতীয়

দ্বারের বীজমন্ত্র দিবেন, তিনি এক্ষণে বহু দূরে। প্রথম বীজের কার্যারম্ভ হইয়াছে, শেষ হয় নাই। সে কার্য পরপ্রিয়তা সাধন। তাহা সংসাধিত হইলে সমাজের আশ্চর্য শক্তি পরিস্ফুট হইবে। পরপ্রিয়তা সংসিদ্ধ করিবার নিমিত্তই এই নূতন ধর্ম; এতদ্ভিন্ন ইহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। এই ধর্ম এক্ষণে পৃথিবীর সর্বত্র। মুসলমান ধর্ম বল, খ্রীষ্টান ধর্ম বল, যে ধর্মই বল কেবল নাম-ভেদমাত্র, সকল ধর্মই আত্মামূলক। আত্মা হেতু স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য, ইহকাল পরকাল উত্থাপিত হইয়াছে; আত্মা হেতু ক্রিয়া কলাপের প্রয়োজন হইয়াছে। এই আত্মা হিন্দুর আবিষ্কৃত। অতএব আত্মামূলক ধর্ম যে আকারে যেখানে প্রচলিত থাকুক, সে সকলকেই হিন্দুধর্ম বলিয়া নামকরণ করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংস্কার সূচনা

আত্মামূলক ধর্মের আমরা যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি। ইহকালের কার্য-ফল পরকালে ভোগ করিতে হয় বলিয়া এ সংসারে অনেক সৎকার্য হইয়া গিয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে। কিন্তু প্রশংসা এই পর্যন্ত।

যিনিই যাহা বলুন, কোন ধর্ম সত্য সত্যই পারত্রিক নহে। সমাজের মঙ্গল সাধনার্থ সকল ধর্মই প্রণীত হইয়াছে। কেবল তান্ত্রিক অভিধেয় পৈশাচিক ধর্মের কথা স্বতন্ত্র। নতুবা সকল ধর্মের উদ্দেশ্য, মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধ করা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তুমি কাহারও হিংসা করিবে না, কাহারও অনিষ্ট করিবে না, কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে তুমি সাধ্যমত তাহার উপকার করিবে, তোমার বামগণ্ডে চড় মারিলে, তুমি দক্ষিণগণ্ড বাড়াইয়া দিবে, যাহার যাহা নাই, তাহাকে তাহা দিবে, সকল ধর্মের এই একরূপ উপদেশ। ইহার উদ্দেশ্য কেবল সামাজিক ভিন্ন পারত্রিক নহে। অর্থদান, অন্নদান প্রভৃতি সৎকার্য এই সংসারের জন্য, দয়াদাক্ষিণ্য এইখানেই উপকারক।

নীতিশাস্ত্রের যে উদ্দেশ্য, ধর্মশাস্ত্রেরও সেই উদ্দেশ্য। উভয় শাস্ত্রের একই উপদেশ। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, নীতিশাস্ত্র বিজ্ঞতা শিখায়, ধর্মশাস্ত্র সে বিষয়ে বরং কিছু বিরোধী। নীতিশাস্ত্রের উপদেশ যে অন্যের হিতসাধন কর; ভালই, কিন্তু তাহা বলিয়া আপনার হিত বিস্মৃত হইও না। ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ যে আপনার হিত বিস্মৃত হইয়া কেবল অন্যের হিতসাধন কর। ধর্ম-শাস্ত্র বলে মিথ্যা কথায় বড় পাপ, কেন না অন্যের অনিষ্ট করে। নীতিশাস্ত্র

বলে মিথ্যাকথা বড় দোষ, কেন না আপনার অনিষ্ট ঘটাইতে পারে। এইজন্য নীতিশাস্ত্র একটু স্বার্থপর, ধর্মশাস্ত্র তাহা একেবারে নহে; অন্তত ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ দেখিয়া বিচার করিলে এইরূপই বোধ হয়। কিন্তু ফল বিবেচনা করিতে গেলে তাহার বিপরীত বোধ হয়। স্বার্থপরতা দ্বারা স্বার্থপরতা নিবারণ করিতে চেষ্টা পাওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। লোকের ভাল করিলে তোমার আপনার ভাল হইবে, এই প্রলোভন বাক্য এই ধর্মের প্রধান দোষ। কেবল আপনার প্রতি দৃষ্টি কর, আপনার মঙ্গল চেষ্টা কর, কিসে তোমার আপনার পরকাল ভাল হইবে, কেবল তাহাই চিন্তা কর, অনবরত এই পরামর্শ যে ধর্মের মূল, সে ধর্ম আলোচনায় স্বার্থপরতা কাজেই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। এক্ষণকার লোকেরা কিছু স্বার্থপর বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ধর্মই হয়ত তাহার হেতু। অনেকে বলেন যে, বয়স হইলে আমরা স্বার্থপর হইয়া থাকি। আবার ইহাও শুনা যায় যে, বয়স হইলে মনুষ্যেরা কিছু ধর্মপ্রিয় হয়। উভয় কথাই সত্য কিনা জানিতে গেলে, জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, লোকে অগ্রে স্বার্থপর হইয়া পরে ধর্মপ্রিয় হয়, কি অগ্রে ধর্মপ্রিয় হইয়া পরে স্বার্থপর হয়? কেন না দেখা যায় স্বার্থপরতা ও ধর্মনিষ্ঠা একাধারে সচরাচর থাকে; যাহারা স্বভাবত কিছু স্বার্থপর, তাহাদের স্বার্থস্পৃহা যে এই ধর্মে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইবে, ইহা এক প্রকার বুঝা যায়। এইজন্য স্বার্থপর ব্যক্তিরা বড় ধর্মপরায়ণ হয়, অথবা বলুন ধার্মিকেরা বড় স্বার্থপর হয়। উভয় কথাই সম্ভব। প্রচলিত আত্মমূলক ধর্মের পন্থাদোষে এই সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

এই স্বার্থপর ধর্মের আর এক নাম সকাম ধর্ম। এক্ষণে সকল ধর্মই আত্মমূলক, এইজন্য সকল ধর্মই সকাম। এক সময় হিন্দুধর্ম নিষ্কাম হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারতবর্ষের বড় গৌরব। অদ্যাপিও আমরা সৎ কর্মের পর 'এতৎ কর্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু' বলিয়া থাকি। কিন্তু তাহা কথায় মাত্র, মনে জানি যে, শ্রীকৃষ্ণ এমন অবিবেচক হইবেন না। আমাদের সৎকার্যের ফল অবশ্য তিনি আমাদেরই দিবেন। এক্ষণে এই সকাম ধর্মের বিদ্বেষী অনেকে হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, আমাদের হিন্দুধর্মের সংস্কার আবশ্যক।

সচরাচর যেরূপ সময়ে ধর্মসংস্কার হইয়া থাকে, বাঙ্গালায় যে সেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে, এমত নহে। সামাজিক অত্যাচার ধর্মসংস্কারের এক প্রধান হেতু; বাঙ্গালায় এক্ষণে সে অত্যাচারের বড় বাড়াবাড়ি নাই। অতএব

সেদিকে আশাও নাই। চৈতন্যদেবের ধর্ম সামাজিক অত্যাচারে জন্মিয়াছিল। তান্ত্রিক কালে বাঙ্গালা ভয়ানক নৃশংস হইয়া উঠিয়াছিল, এইজন্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রয়োজন হয়। আমরা এক্ষণে সকলেই চৈতন্যদেবের ধর্ম স্পষ্ট গ্রহণ করি বা না করি কিন্তু পাকত সকলেই বৈষ্ণব। ব্রাহ্মরা রাগ করিবেন, নতুবা বলিতাম, তাঁহারাও বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রেমধর্মের শাখাবলম্বী। এক্ষণে বাঙ্গালীর যাহা কিছু আছে তাহা চৈতন্যপ্রসাদাৎ। চৈতন্যের দ্বারা সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকুক, অথবা সমাজবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় চৈতন্য উপস্থিত হইয়া থাকুন, সে মীমাংসা এক্ষণে অনাবশ্যক। যে অবস্থায় চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচার করেন, এক্ষণে বাঙ্গালার সে অবস্থা নহে। অন্যান্য দেশে যে অবস্থায় ধর্মসংস্কার হইয়াছিল, এক্ষণে সে অবস্থাও বাঙ্গালার নহে। অতএব সামান্যত দেখিতে গেলে এক্ষণে বাঙ্গালায় ধর্মসংস্কারের সম্ভাবনা নাই; অথচ বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বাঙ্গালায় ধর্মসংস্কারের আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে।

পূর্বে সকল দেশে সকল সমাজে লোকে কেবলমাত্র একটি করিয়া ধর্ম দেখিতে পাইত বা একটি ধর্মেরই দুই চারিটি শাখা প্রশাখা দেখিত। ইদানীং নানা ধর্ম একত্রিত হইতে আরম্ভ হয়য়াছে। এই জন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি সকল দেশেই কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে। নানা ধর্ম একত্র দেখিবার ফল বাঙ্গালায় কিছু বিশেষ ফলিয়াছে। মনুষ্যের প্রকৃতি এক, তবে ধর্ম স্বতন্ত্র কেন? এ কথা বাঙ্গালার প্রায় অনেকেই আপনা আপনি আলোচনা করিয়া থাকেন। এই কথার অন্তর্গত আরও অনেক তর্ক মনে উপস্থিত হয়। স্বর্গ এক, তবে পাপপুণ্য স্বতন্ত্র কেন? মাংসভোজন এক ধর্মে পাপ, আর ধর্মে তাহা নহে কেন? জগতের স্রষ্টা এক, কিন্তু ধর্মের স্রষ্টা স্বতন্ত্র দেশে স্বতন্ত্র কেন? এইরূপ আলোচনা যে করে তাহার মনে প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া সম্ভব। অনেক বাঙ্গালীর মনে সে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই ধর্মসংস্কার আপনা আপনি আরম্ভ হইয়াছে।

এই সংস্কারের সংস্কারক নাই, এবারকার কে চৈতন্যদেব, জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর নাই। কোন পরামর্শ নাই, যত্ন নাই, উদ্যোগ নাই, অথচ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। ধর্মযাজক নাই, ধর্মপ্রচারক নাই, কোন গ্রন্থ নাই, অথচ চারিদিকে ইহার কার্য হইতেছে।

যাঁহারা এই সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায় বদ্ধ নাই, তাঁহাদের এ পর্যন্ত কোন নামকরণ হয় নাই; কিন্তু এই স্থলে তাঁহাদের

পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিতে হইতেছে বলিয়া, তাঁহাদের আপাতত বঙ্গপন্থী নাম দেওয়া যাইতেছে। তাঁহাদের আপত্তি থাকে, তাঁহারা অন্য নাম গ্রহণ করুন।

এক্ষণে কি কি বিষয়ের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন নহে। মূল সংস্কার ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে। পুরাতন ধর্মের যেরূপ মত বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল, তাহাতে ঈশ্বর মনুষ্যাকৃতি বলিয়া সাধারণত বিশ্বাস ছিল; বিদেশীরা বাঙ্গালায় আসিয়া প্রতিমা দেখিয়া কতই উপহাস করিতেন; মনুষ্যের আকার হইতে ঈশ্বরের আকার কল্পনা করা কতই অসঙ্গত বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইত। তাঁহারা তখন এক পৈঠা উঠিয়াছিলেন, আর একটি পৈঠা উঠিতে তাঁহাদের বাকি ছিল। তাঁহারা আকৃতি ছাড়িয়া ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতি গড়িতেন; অদ্যাপি তাঁহাদের মধ্যে সেই রীতি চলিতেছে। মনুষ্যের মত ঈশ্বর দয়াময়, বরং কিছু বেশী। তিনি মনুষ্যের মত রাগান্ধ, কিছু হয়ত বাড়াবাড়ি। তিনি মনুষ্যের মত প্রশংসাপ্রিয়, এই জন্য তাঁহার স্তব পূজার বিশেষ আবশ্যক। এইরূপ তাঁহারা ঈশ্বরের প্রকৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন। বঙ্গপন্থীদিগের মত স্বতন্ত্র। তাঁহারা মনুষ্যের আদর্শ হইতে ঈশ্বরের প্রকৃতি অনুভব করেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহারা হয়ত অন্যান্য মতাবলম্বী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত। খ্রীষ্টান বলুন, মুসলমান বলুন, হিন্দু বলুন সকল মতেই প্রকৃতিতে ঈশ্বর মনুষ্যের মত। সকল মতেই ঈশ্বর দয়াবান, কেন না আমরা দয়াবান। সকল মতেই ঈশ্বর ক্ষমাবান, কেন না আমরা ক্ষমাবান। সকল মতেই ঈশ্বর দণ্ডধারী, কেন না আমরা লোকের দণ্ড করি।

আমরা প্রশংসাপ্রিয়, কিন্তু ঈশ্বরও যে সেইরূপ প্রশংসাপ্রিয়, ইহা কোন মতেই বঙ্গপন্থীরা বিশ্বাস করেন না। তুমি বড়, তুমি অতি বড়, তুমি যাহা মনে কর, তাহাই করিতে পার, এই বলিলে ঈশ্বর যে আপনাকে বড় জ্ঞান করেন বা তাহাতে বিশেষ পরিতৃপ্ত হন, এ কথা বঙ্গপন্থীদিগের নিকট অতি অগ্রাহ্য। এইজন্য তাঁহাদের সন্ধ্যা আহ্নিক নাই, পূজা প্রেয়ার নাই। তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রশংসা করিয়া পরকাল হাত করিলাম, মনে করিতে চাহেন না।

ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা লোকে তাহা করে না। তাহা করাইবার নিমিত্ত তিনি আপনি আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিম্বা নায়েবস্বরূপ আপনার পুত্রকে কি কোন দোস্তকে কখন কখন পাঠাইয়া থাকেন, এ কথা বঙ্গপন্থীর নিকট অতি অগ্রাহ্য। যাঁহার নিয়মে সকল হইয়াছে, সকল চলিতেছে, তিনি এ সম্বন্ধে কোন নিয়ম বাঁধিতে অক্ষম, একথা শুনিলে বঙ্গপন্থীরা হাসেন।

যে নিয়মের বলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিতে শিখিল, সে নিয়মদ্বারা মনুষ্য কিছুই শিখিতে পারিল না বলিয়া আকাশবাণীর আবশ্যকতা হইয়াছে বা সেইজন্য তুলটে ঈশ্বরের আদেশ লেখার আবশ্যকতা হইয়াছে, এ কথায় ব্রহ্মপন্থীরা উপহাস করেন। তাঁহারা বেদ, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ ঈশ্বর প্রণীত বা ঈশ্বর আদিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন না।

যাহা সংক্ষেপে বলা গেল, তাহাই যথেষ্ট। ব্রহ্মপন্থীর ধর্মগ্রন্থ না থাকুক, তাঁহাদের মূল সূত্রের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রথমত তাঁহারা অবতার অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়ত তাঁহারা বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ কিছুই মানেন না, ধর্মগ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় বলেন। তৃতীয়ত অর্চনা, বন্দনা, স্তব, স্তুতি, পূজা প্রেয়ার তাঁহারা সকলই বৃথা বলেন। তাঁহাদের কার্য দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এক্ষণে কেবল এই তিনটি সূত্রে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, আর কয়েকটি সূত্র অস্পষ্টভাবে কিঞ্চিৎ অন্তরে আছে। তাহার একটি এই যে, পরকালের দণ্ডবিধি আইন মিথ্যা অর্থাৎ স্বর্গ নরক মিথ্যা, পাপ পুণ্য মিথ্যা। আর একটি আরও অস্পষ্ট—আরও দূরে আছে, সেটি বোধ হয় এই—মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা আপনা হইতে ক্রমে ঘুচিবে। ধূমকণার স্বতন্ত্রতা ঘুচিয়া সমুদ্র হইয়াছে, মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা গেলে সেইরূপ কি একটা হইবে তাহার অনুভবও অদ্যাপি হয় নাই, কাজেই নামকরণও হয় নাই।

পূর্ব বিশ্বাসের এই যে সকল ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহা ভাল কি মন্দ আমরা সে সম্বন্ধে এক্ষণে কোন কথা বলিতে প্রস্তুত নহি। ইহাকে ধর্মসংস্কার যদি বলা না যায়, তাহাতেও আপত্তি নাই। আমাদের এই বলিবার ইচ্ছা যে, এইটি ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্মের অঙ্কুর। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে আত্মার কল্পনা দ্বারা নতুন ধর্ম উদ্ভাবিত হইয়াছিল ; সেই কল্পনা হইতে স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি সকল কল্পিত হইয়াছিল। এক্ষণে বাঙ্গালায় তাহার অন্যথা আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রকৃতি মনুষ্যের মত নহে, এই কথাদ্বারা স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য এ সকল ভাঙ্গিতে বসিয়াছে।

ব্রহ্মপন্থীর সংখ্যা বাঙ্গালায় এক্ষণে নিতান্ত অল্প নহে।

[সঞ্জীবচন্দ্র যে কিরূপ চিন্তাশীল ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লেখক ছিলেন, এই সুন্দর প্রবন্ধটি, তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।]

গৃহ সন্ন্যাস

[১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একটা সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সমালোচনার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

'সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত, মূল্য—তিন টাকা; ১৯৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কাগজ ও ছাপা ভাল নয়, কিন্তু গ্রন্থখানির যাহা উপাদান,. তাহা সাহিত্যের স্থায়ী ভাণ্ডারের বিশেষ সম্পত্তি। এই মন্তব্য-লেখককে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার বিশেষ অনুরাগী জানিয়াই সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁহাকে এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে অনুরোধ করেন। একালের যুবকেরা সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার সহিত খুব পরিচিত নহেন; সেটা দুর্ভাগ্যের কথা। সকল দেশেই এক একবার প্রাচীন লেখকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হয়; সঞ্জীবচন্দ্রকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিবার অনেক কারণ আছে। · সঞ্জীবচন্দ্র নাম ও যশ খোঁজেন নাই,—অপ্রাকৃতিক উপায়ে ত নহেই। যাহা খোঁজেন নাই; তাহা তিনি পান নাই। হাটবাজারে চক্‌চকে মেকি জিনিষই চলে বেশী; সঞ্জীবচন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী সরল রচনা উপেক্ষিত হইয়াছে।···

সঞ্জীবচন্দ্র কখনও কাহারও অনুকরণে কিছু লেখেন নাই। সাহিত্যে উপহার দিবার মত বিষয়গুলি তাঁহার মনে ঠিক বিকশিত হইলেই তিনি কলম ধরিতেন, এবং তাঁহার নিজের মনের ভাবগুলি তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ দিয়া ফুটাইতেন। তাঁহার নিজের একটা রচনারীতি বা এবারৎ বা স্টাইল ছিল।···

সঞ্জীবচন্দ্রের অন্য বিশিষ্টতার কথা বলি—তিনি অযথা কথা ফেনাইয়া রচনা বাড়াইতেন না। তিনি অতি অল্প কথায় তাঁহার 'গৃহ সন্ন্যাস' প্রবন্ধে আসল ভাব জমাইয়াছেন। একজন সাহিত্যিক কৌশলওয়ালা উহা লিখিলে প্রবন্ধটির আয়তন দশগুণ বাড়িত। সমালোচিত গ্রন্থাবলীতে এই 'গৃহ সন্ন্যাস'টি নাই। আরও কয়েকটি সুরচিত প্রবন্ধ নাই। এটা ত্রুটি। সঞ্জীবচন্দ্রের আর একটি বিশেষত্ব এই—যে সকল ভাব আমাদের চলিত বাঙ্গলায় প্রকাশ করা যায়, সেগুলির জন্য কখনও তিনি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন নাই।

সৌন্দর্যের অনুভূতি, আর তাহা মন-মাতান ভাষায় আঁকিয়া তুলিবার ক্ষমতা, সঞ্জীবচন্দ্রের অসাধারণ ছিল। 'পালামৌ' প্রবন্ধ এ বিষয়ের বিশেষ দৃষ্টান্ত। পালামৌ বাঙ্গালার সীমান্তের চুটিয়া নাগপুরের কোল জাতির দেশ,—আমাদের কল্পনার ভূ-স্বর্গ বিলাত নয়। কত বিলাত-যাত্রী সাগর-পরের কথার কবিত্ব ফেনাইয়া ও বিদেশের জাঁকের বর্ণনায় চমক লাগাইয়া কত কিছু লিখিয়াছেন, কিন্তু পালামৌ ভ্রমণের কাহিনীর কাছে সেগুলি দাঁড়াইতে পারে নাই। যাহা তিনি আপনার সরস প্রাণ দিয়া ছুঁইতেন. তাহারই বর্ণনা করিতেন; তাই তাঁহার রচনা এত মনোহর হইয়াছে। আর উহাতে কোন রকমের ন্যাকামী নাই। জীবনের যে প্রফুল্লতায় হাসি ফুটিয়া ওঠে, সেই প্রফুল্লতার ও স্নিগ্ধ হাসির আলোকে তাঁহার রচনা সরস ও উজ্জ্বল।...'

এখানে এই উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল, সঞ্জীবচন্দ্র এক সময় 'গৃহ সন্ন্যাস' নামে একটি ভাল প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আরও জানা গেল, বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রকাশিত 'সঞ্জীব রচনাবলী'তে সঞ্জীবচন্দ্রের অন্য অনেকগুলি প্রবন্ধও দেন নি। বঙ্গবাণীর লেখাটি পড়ে খোঁজ করে দেখলাম, 'গৃহ সন্ন্যাস' ১২৮৭ সালের চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল।

সমালোচক সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। মনে হয়, বসুমতীর কর্তৃপক্ষ সঞ্জীব-রচনাবলীতে সঞ্জীবচন্দ্রের 'গৃহ সন্ন্যাস'-সহ অন্য প্রবন্ধগুলি বাদ দেওয়ায় জ্যোতিশ ক্ষুব্ধ হয়েই এ কথা সমালোচককে জানিয়েছিলেন। অবশ্য সমালোচক নিজেও অন্য কোন সূত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ রচনাগুলির কথা জেনে থাকতে পারেন। তবে জ্যোতিশই জানিয়ে ছিলেন বলে আমার ধারণা। কারণ, ভ্রমর বা বঙ্গদর্শনে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার সঙ্গে তাঁর নাম না থাকলেও, জ্যোতিশ তাঁর পিতার সমস্ত রচনারই খবর রাখতেন।

জ্যোতিশ যখন 'বসুমতী অফিস' এর (তখন 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' নাম হয় নি) মালিক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলীর সর্বস্বত্ব বিক্রয় করেন, তখন তিনি সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিও বিক্রয় করেছিলেন, এবং আশা করেছিলেন, সেগুলিও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

জ্যোতিশ কর্তৃক উপেনবাবুকে সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের একটা

বায়না পত্র 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় ছিন্নাবস্থায় রয়েছে সেই বায়না পত্রটি এই—

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়—

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়

বসুমতী অফিস বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পিতা ৺ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কাঁটালপাড়া, থানা নৈহাটী, জেলা ২৪ পরগণা কস্য বায়না পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে আমার পূজনীয় উক্ত পিতৃদেবের প্রণীত (১) কণ্ঠমালা (২) মাধবীলতা (৩) জাল প্রতাপচাঁদ (৪) সঞ্জীবনী সুধা (৫) যাত্রা সমালোচনা ও প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের কপি রাইট ৫৫১ পাঁচশ একান্ন টাকায় আপনাকে বিক্রয় করিবার চুক্তিতে অদ্য আপনার নিকট উনিশ টাকা অগ্রিম বায়নার স্বরূপ পাইলাম। উক্ত উনিশ টাকা বাদে চলিত ইংরাজি সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে একই কিস্তিতে বাকি ৫৩২ পাঁচশ বত্রিশ টাকা গ্রহণ করিয়া বিক্রয় পত্র রেজিষ্ট্রি করিয়া দিতে বাধ্য থাকিব। রেজিষ্ট্রি করার সম্বন্ধে যাহা কিছু খরচ হয়, তাহা আপনাকে দিতে হইবে। যদি উক্ত তারিখে বেবাক টাকা না পাই, তাহা হইলে বায়নার এই টাকা ফেরৎ পাইবার দাবী করিতে পারিবেন না এবং আমার ঐ সকল প্রবন্ধ ও পুস্তক অন্য কাহাকেও বিক্রয় করিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। প্রকাশ থাকে যে, ঐ সকল পুস্তক ও প্রবন্ধের একমাত্র স্বত্বাধিকারী আমিই। আমি যদি আমার পক্ষের এই বায়না পত্রের লিখিত চুক্তি ভঙ্গ করি, তাহা হইলে মাফিক আইন আমলে আসিবে। এতদর্থে নগদ ১৯ উনিশ টাকা বায়না স্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই বায়না পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি—সন ১৯০৪ সাল। তারিখ ২৮শে মার্চ।

ইসাদী শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্রীদেবেন্দ্র…

সাং…

বায়না পত্রের শেষের '…' চিহ্নিত অংশ ছিন্ন।

বায়না পত্রে দেখা যাচ্ছে, সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলীতে দেবার জন্য তাঁর 'প্রবন্ধ সমূহে'র কথাও জ্যোতিশ বলেছিলেন। কিন্তু বসুমতীর মালিক উপেনবাবু জ্যোতিশের কথিত ঐ প্রবন্ধ সমূহের একটিও গ্রন্থাবলীতে দেন নি। অথচ এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের বহু পূর্বেই 'যাত্রা সমালোচনা'র ন্যায় সঞ্জীবচন্দ্রের

'সংস্কার' ও 'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধ দুটি, দুটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। উপেনবাবু যখন গ্রন্থাবলীতে 'সংস্কার' ও 'বাল্যবিবাহ'ই দিলেন না, তখন সঞ্জীবচন্দ্রের অন্য প্রবন্ধগুলি, সেগুলি যত ভালই হোক, সেগুলির কথা আর চিন্তাই করলেন না। তার ফল হ'ল এই যে, সঞ্জীবচন্দ্রের অনেক সুরচিত রচনা চিরতরেই অজানার গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। সেই অজানার অন্ধকার থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের কিছু রচনা নানা সূত্রে বহু কষ্টে হাতড়ে হাতড়ে আজ আলোয় আনার চেষ্টা করছি।

জ্যোতিশ কর্তৃক বসুমতীর উপেনবাবুকে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলী বিক্রয় নিয়ে আরও কয়েকটা চিঠি ও কাগজপত্র কাঁটালপাড়ার 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় রয়েছে। ঐ সব চিঠি ও কাগজ পত্র থেকে জানা যায়, অনেক দরাদরি করে উপেনবাবু ৫৫১ টাকায় সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলীর সর্বস্বত্ব নিয়ে ছিলেন। আর বায়না পত্রে লেখা থাকলেও উপেনবাবু বায়নার টাকা বাদে বাকি টাকা একবারে এবং ঠিক সময়েও দেন নি। এ সম্পর্কে উপেনবাবুর বসুমতী অফিসের তৎকালীন কর্মচারী (সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদক) জলধর সেন কর্তৃক জ্যোতিশকে লেখা একাধিক চিঠিও রয়েছে।

অনেকে বলে থাকেন, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, বহু বিখ্যাত সাহিত্যিকের গ্রন্থাবলী সুলভ মূল্যে প্রকাশ ক'রে বাংলা সাহিত্যের প্রচারে যথেষ্ট উপকার করেছেন। তা করেছেন; কিন্তু এই সঞ্জীবচন্দ্রের ক্ষেত্রের মত বহু সাহিত্যিকের, তথা সাহিত্যের ক্ষতিও করেছেন প্রচুর। তাছাড়া বইয়ে ছাড় ও বিকৃত পাঠ ত থাকতই।

যাক্। এখন আবার সঞ্জীবচন্দ্রের কথাতেই ফিরে আসি। 'বঙ্গবাণী'র ঐ সমালোচনাটি চোখে না পড়লে আজ কিছুতেই বলা যেত না যে, 'গৃহ-সন্ন্যাস' সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা। এখন ঐ প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করছি—]

গৃহ সন্ন্যাস

যে স্বাধীন, নিশ্চয়ই সে সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা ছিল, সেইজন্য সন্ন্যাসীও ছিল। সন্ন্যাসীরা অনেকেই গৃহী, স্বাধীন গৃহী। জনক রাজা ভারতের প্রথম সন্ন্যাসী।

স্বাধীনতা ভারতবর্ষের ধন। জর্মানীরা ইদানীং স্বাধীনতার অর্থ কতকাংশে বুঝিয়াছে, এইজন্য জর্মানীতে সন্ন্যাসী সম্ভব হইয়াছে। ইউরোপীয় আর আর জাতিরা অসার, অনেকে আবার বাচাল; তাহাদের স্বাধীনতা অতি দূরে। ইংরেজদের কেবল দাম্ভিকতা, ফরাসিদের কেবল বাগাড়ম্বর। অদ্যাপি তাঁহারা অধীনতা স্বাধীনতা কেবল রাজ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। যে বধির সে কেবল নৃত্যকেই সঙ্গীত বলে; গীত, বাদ্য, তাল, লয় কখন তাহার কর্ণকুহরে যায় নাই। যখন ভারতাকাশ হইতে স্বাধীনতা খসিয়া পড়ে, পতনে তাহা শতধা হইয়াছিল। ম্লেচ্ছেরা তাহারই দুই এক খণ্ড কুড়াইয়া লয়; সেই ভগ্ন খণ্ড তাহাদের এখন পূর্ণ খণ্ড। আমরা তাই হাসি। ভগ্ন খণ্ডের দুই চারিটি অদ্যাপি ভারতবর্ষে পড়িয়া আছে; সেগুলি এক্ষণে মহাপীঠ। এইজন্য ভারতবর্ষ অদ্যাপি স্বাধীন; সকল দেশ অপেক্ষা স্বাধীন। ক্ষুদ্রেরা এ কথায় হাসিবে, রাজা দেশী কি বিদেশী এই লইয়া তাহারা স্বাধীনতার মীমাংসা করে।

মনুষ্যের প্রথম বেগ—উদ্ধারের চেষ্টা। জড়ের শাসন, জঙ্গমের শাসন, আপনার শাসন। জড়ের শাসন প্রথমত ইউরোপ অঞ্চলে আরম্ভ হয়। আপনার শাসন প্রথমত ভারতবর্ষে আরম্ভ হয়। এই শেষ শাসন বড় কঠিন, ভারতবর্ষ বলিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষে বাহ্যিক আভ্যন্তরিক সকল যুদ্ধই হইয়া গিয়াছে। যেখানে কুরুক্ষেত্র, সেইখানেই ঋষিদিগের তপস্যাশ্রম। প্রত্যেকের পুরাতন কথা মহাকথা; সকলগুলিই স্বাধীনতার যুদ্ধবার্তা।

বৌদ্ধদিগের সময়ে আত্মশাসনের বিশেষ বাঁধাবাঁধি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের শাক্যসিংহ ভীরু ছিলেন, সংসারকে ভয় করিয়া, সংসারকে ফেলিয়া তিনি পলাইয়াছিলেন। স্বাধীনতা সাহসিকের ধন; ভীরু কখন স্বাধীনতা পায় না, সন্ন্যাসীও হয় না।

তান্ত্রিকেরাও স্বাধীনতার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা কেবল মায়া সম্বন্ধে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, মনুষ্যেরা কেবল মায়ার নিমিত্ত পরাধীন। কিন্তু মায়া পরাধীনতার আংশিক কারণ মাত্র।

কেহ বা যোগ শিক্ষা দিয়া, দৈহিক শাসন আরম্ভ করাইয়া, স্বাধীনতার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের পরাধীনতা সম্বন্ধে ক্ষুৎপিপাসাই বিশেষ কারণ।

সম্প্রদায় বিশেষের এইরূপ চেষ্টায় পূর্ণ স্বাধীনতার উৎপত্তি হইয়াছিল। কেহ কেহ সেই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া ছিলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অতি ভয়ানক ও অদ্ভুত হইয়াছিল। 'জড়জঙ্গমের অধীন হইব না; জরার অধীন হইব না; ক্ষুধার অধীন হইব না; মায়ার অধীন হইব না; দেবতার অধীন হইব না; বরং ঈশ্বরের সমান হইয়া তাঁহার শরীরে মিলিয়া যাইব।' এই আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় স্বাধীনতার বীজ।

ভারতীয় স্বাধীনতা অতি কর্কশ, অতি ভয়ানক; কিন্তু সম্পূর্ণ। ভারতবাসী মৃত্যুরও অধীন হইতে চাহিত না। স্বাধীনতার এরূপ মূর্তি আর কোথাও অনুমিত হয় নাই। মৃত্যু আইসে, পার্শ্বে দাঁড়ায়, জোড় হাত করে, অনুমতি চায়, অনুমতি কখন পায় কখন পায় না। এই চিত্র কেবল স্বাধীনতার সংস্করণ। অদ্যাপি অনেক পরমহংস গোপনে আহার করে, পাছে ক্ষুৎ-পিপাসার বশবর্তী দেখিয়া লোকে পরাধীন মনে করে। অনেকে উলঙ্গ বেড়ায়, পাছে সমাজ প্রথার অধীন ভাবিয়া লোকে অশ্রদ্ধা করে। অনেকে দারাপুত্র ত্যাগ করে, পাছে লোকে মায়ার অধীন মনে করে। এই সকল ব্যবহার অনর্থক নহে। প্রতিধ্বনি পূর্বধ্বনির পরিচয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা একেবারে লোপ পায় নাই, এখনও ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী আছে। আমি ভস্মমাখা ভিক্ষুকদের কথা বলিতেছি না; মহাপুরুষদের কথা বলিতেছি।

স্বাধীনতার আর এক মূর্তি জর্মানদেশে কল্পিত হইয়াছে। তথাকার পণ্ডিতেরা বলেন যে, নিজে উন্নত হইয়া জড়জঙ্গম প্রভৃতি সকলের অধিকার অতিক্রম করাই স্বাধীনতা। কিন্তু কার্যত সম্পূর্ণ অতিক্রম করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত; যাহা সাধ্যাতীত তাহা কেবল মনের দ্বারা অতিক্রম করিতে হইবে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, যাহা অলঙ্ঘনীয়, যাহার উপায় নাই, তাহার নিমিত্ত কাতর কেন হইব, কেন তাহার অধীন হইয়া পড়িব? যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা সুতরাং হইতে দিব; হইতে দেওয়াই জিত, প্রভুত্বের কার্য।

এইরূপ জর্মান স্বাধীনতা নীতিসম্ভূত। এত কাল নীতিকে কেহ স্বাধীনতার প্রসূতি বলিয়া চিনিত না, এক্ষণে চিনা যাইতেছে। এই পথ অবলম্বন করিলে অনিবার্য অত্যাচারকে আর অত্যাচার বলিয়া বোধ থাকে না, মৃত্যুরও ভয়ানকতা কমিয়া যায়।

মনকে অধীন করিয়া আপনি স্বাধীন হইব, ইহা ভারতীয় মন্ত্র। মনকে উন্নত করিয়া আপনি স্বাধীন হইব, ইহা জর্মানীর মন্ত্র; পরস্পর প্রভেদ বিস্তর।

ভারতীয় স্বাধীনতায় মনকে দমন করিতে হয়, শাসন করিতে হয়, পীড়ন

করিতে হয়, অনেক সুখপ্রবৃত্তির স্ফূর্তি রোধ করিতে হয়; মনকে একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলিতে হয়; কিন্তু 'when you regulate a man, you narrow him.' এই স্বাধীনতার আর এক বিশেষ দোষ যে, এতদ্বারা সমাজের সর্বনাশ হয়। যে সকল মনোবৃত্তির প্রাবল্যে সমাজের উন্নতি, সে সকল মনোবৃত্তি একেবারে থাকে না। এইজন্য এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সমাজের উন্নতি লোপ হইয়া গিয়াছিল। ব্যক্তিগত গুণে সমাজ গুণবন্ত হয়, কিন্তু এই স্থলে সে নিয়ম খাটে নাই। সমাজের পরাধীনতা ব্যক্তিগত পরাধীনতা নহে, যাঁহারা স্বাধীন তাঁহারা সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাই লোকে তাঁহাদের স্বতন্ত্র নাম দিয়াছিল—সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীর বাক্যার্থ বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। সন্ন্যাসধর্ম সমাজের অনিষ্টকর; বিশেষত প্রথমত অবস্থায়। পরাধীনতা সমাজের মজ্জা। পরাধীনতা ভিন্ন সমাজ গঠে না, সমাজ থাকে না। পরাধীনতা পরতন্ত্রতা নহে।

সমুদয় মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য থাকিলে আর এক প্রকার স্বাধীনতার উৎপত্তি হয়। বাঙ্গালায় সে সামঞ্জস্য একেবারে নাই। এখানে মায়া মমতার প্রাধান্য অতিশয়, এইজন্য আমরা পরাধীন।

বিবাহের ঘটকালি

['প্রচারে'র ৩য় খণ্ড পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যায় অর্থাৎ ১২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ যুগ্ম-সংখ্যায় 'বিবাহের ঘটকালি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধের সঙ্গে লেখক হিসাবে কারও নাম ছিল না। তবুও এই প্রবন্ধটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের বলে জানতে পারলাম, তার কারণ, ঐ সংখ্যা প্রচারের মলাটে প্রকাশিত রচনাগুলির যে সূচী আছে, তাতে 'বিবাহের ঘটকালি' লেখাটির সঙ্গে লেখক হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্রের নাম আছে। ঐ মলাটটি না পাওয়া গেলে, ঐ প্রবন্ধকে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে জানাই যেত না। প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করছি—]

গৃহিনীরা ইদানিং সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব একচেটে করিয়া লইয়াছেন—ব্যয় ভূষণ, লৌকিকতা, সামাজিকতা সকলই এখন তাঁহাদের হাতে। বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহারা কর্তা। পুরুষ ঘটকেরা অন্দর মহলে যায় না, সুতরাং আর ঘটকালি পায় না। কাজেই তাহাদের সে ব্যবসা ছাড়িতে হইয়াছে। তাহাদের পরিবর্তে এখন স্ত্রীলোক ঘটক।

কিন্তু একটু গোল বাধিয়াছে। যেখানে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত সেখানে ঘটকের কার্য বড় গুরুতর। সে বিষয় একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। বৈজিকতত্ত্ব ভালরূপ না জানিলে ভাল ঘটক হইতে পারে না।

বংশভেদে আকার প্রকার সকলই প্রভেদ হয়, ইহা মোটামুটি অনেকেই জানেন। অনেকেই দেখিয়াছেন কোন কোন বালক গঠনে ঠিক তাহার পিতার মত, কেহ বা স্বরে পিতার মত, কেহ বা অঙ্গচালনায় পিতার মত। কিন্তু অল্প লোকেই ইহার হেতু অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। প্রকৃত হেতু নির্দেশ করা কঠিন। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, পিতার শারীরিক ও মানসিক দোষ গুণ সকল বীজবাহিত হইয়া সন্তানে যায়। এই কথা শুনিতে সামান্য, কিন্তু বুঝিতে তত সামান্য নহে। বুঝিতে গেলে অবশ্য মনে ধারণা করিতে হইবে যে, পিতৃবীজে পিতার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অংশ, শিরা, মস্তিষ্কের অংশ, রাগ দ্বেষের অংশ, রোগের পর্যন্ত অংশ আছে। আশ্চর্য!

এই আশ্চর্য ব্যাপার আমাদের পূর্ব পুরুষেরা জানিতেন। তাই কৌলিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাই কুলীনদিগের বিবাহ সম্বন্ধে এত বাঁধাবাঁধি হইয়াছিল। রাজ্য মধ্যে বিশেষ গুণবিশিষ্ট লোক বাছিয়া কৌলিন্যের সৃষ্টি হয়, এবং রাজ্যে সেই সকল গুণরক্ষার্থ কুলীনদের বিবাহ লইয়া আঁটাআঁটি করিতে হইয়াছিল। গুণসম্পন্নের বংশে দোষবিশিষ্ট রক্ত মিশ্রিত হইয়া গুণ ধ্বংস না হয়, এইজন্য কুলীনের বিবাহ কুলীনের বংশে, অন্ততঃ শ্রোত্রীয় বংশে হইবে, নিয়ম করা হইয়াছিল। কুলীনেরা নবগুণ বিশিষ্ট, শ্রোত্রীয়রা অষ্টগুণ বিশিষ্ট। প্রভেদ গুরুতর নহে। কিন্তু সে নিয়ম রক্ষা হইল না। কুলীন অকুলীনের ঘরে বিবাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের কুল ধ্বংস হইতে লাগিল অর্থাৎ কুলীন সন্তানদের গুণক্ষয় হইতে লাগিল, ক্রমে তাঁহাদের অধঃপতন হইল। তাঁহারাই ভঙ্গ কুলীন, বহুপুরুষ হইলে তাঁহাদের কুলীনবংশজ অথবা সচরাচর কেবল ‘বংশজ’ বলে।

ইংলণ্ড, ফরাসিস প্রভৃতি দেশের (Breeders) পশু পালকেরা বিশেষ জানে যে, পশুদের কোন ভাল গুণ রক্ষা করিতে হইলে দোষাশ্রিত অপর বংশের সহিত নির্লেপ রাখিতে হয়, অথচ দীর্ঘকাল পুরুষানুক্রমে স্ববংশে শাবক উৎপাদন করাইলে ক্রমে সে বংশ খর্ব ও হীনবীর্য হইয়া পড়ে। এমন কি কখন কখন বংশ লোপ হইয়া যায়। এইজন্য মধ্যে মধ্যে অপর বংশের রক্ত মিশ্রিত করিতে হয়। আমাদের মধ্যে এইজন্য পিতৃ মাতৃ গোত্রে বিবাহ নিষেধ আছে। কিন্তু দেবীবর ঘটকের মস্তকে বজ্রাঘাত হউক, তিনি পালটি ঘর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য স্ববংশে বিবাহ করার ফল ফলিয়াছে, দুই বংশে পুরুষানুক্রমে বিবাহ হইলে উভয় বংশের রক্ত এক হইয়া যায়, সুতরাং স্ববংশে বিবাহের ফল ফলে।

এখন বোধ হয় বুঝা গেল, বিশেষ বংশপরিচয় ব্যতীত সুবিবাহ হইতে পারে না। বংশপরিচয় দিবার জন্য আমাদের ঘটক ছিল। আমরা সেই ঘটকের পদ এখন এবলিস করিতে বসিয়াছি। দুর্ভাগ্য! ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অদ্যাপি ঘটক হয় নাই। কিন্তু ঐ সকল দেশের চতুষ্পদের ঘটক হইয়াছে, তাহারা ইংলণ্ডে ব্রিডার (Breeders) বলিয়া খ্যাত। তাহাদের যত্নেই ইউরোপের পশু ক্রমেই উন্নত হইতেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড-বাসী মনুষ্য অপেক্ষা বোধ হয় পশুর উন্নতি অধিক হইয়াছে। ইহার কারণ, চতুষ্পদীদের উপযুক্ত ঘটক আছে, দ্বিপদীদের তাহা নাই।

ঐ সকল দেশের (Breeders) পশুপালকদের নিকট যাও, তাহারা কোন্ ঘোড়া কোন্ বংশোদ্ভব ; কোন কুক্কুর কোন্ কুলজ বলিয়া দিবে। হয়ত বলিবে, অমুক ঘোটকের এই গুণ ছিল, তাহার বংশপরম্পরা সেই গুণ চলিয়া আসিতেছিল। পরে বিপরীত দোষ বিশিষ্ট অন্য বংশীয় ঘোটকের রক্ত মিশ্রিত হইয়া সে গুণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

মনুষ্য সম্বন্ধে এই সকল পরিচয় দিতে পারে এরূপ ব্যবসায়ী আবশ্যক। আমাদের পুরুষ ঘটক, আবশ্যক জানাইলে, সে পরিচয় দিতে পারিত। কিন্তু এখন স্ত্রীলোক ঘটক, তাহারা কেবল অলঙ্কারের পরিচয় দিতে পারে, আবশ্যকীয় বিষয়ের পরিচয় দিতে অশক্ত। আবশ্যকীয় বিষয় কি তাহা গৃহিণীরা জানেন না। সুতরাং এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান হয় না।

কর্তৃঠাকুরাণীদের সাহায্যার্থে আমরা নিম্নে কয়েকটি আবশ্যকীয় কথা লিখিলাম, ইচ্ছা হয় সন্তান-সন্ততির বিবাহ দিবার সময় এইগুলি স্মরণ করিবেন—

প্রথম—রোগগ্রস্ত বংশে বিবাহ নিষেধ। সকল রোগ কুলজ নহে ; কাশ, কুষ্ঠ প্রভৃতি কুলজ রোগ। রাগ, দ্বেষ, উন্মাদ প্রভৃতিও কুলজ রোগ। এই সকল রোগ যে সকল বংশে আছে, সে বংশ পরিত্যজ্য। পাগলের পুত্র পাগল হয়, কখন কখন পুত্র পাগল না হইয়া পৌত্র পাগল হয়। অনেক কুলজ রোগ এক পুরুষ অন্তর প্রকাশ পায়, বিশেষত কুষ্ঠরোগ। পিতার যে বয়সে কুলজ রোগ প্রকাশ পাইয়াছে, পুত্রের প্রায় সেই বয়সে কুলজ রোগ আরম্ভ হয়। তৎপূর্বে বিবাহের বয়সে সেই রোগ নাই বলিয়া ভবিষ্যতে হইবে না অনুভব করা ভুল। কোন কুলজ রোগ কেবল পুত্রগত থাকে ; আবার কোন কোন বংশে সেই কুলজ রোগ পুত্র কন্যা উভয় শাখা আক্রান্ত করে। এ বিষয়ের অনবধানতা হেতু কঠিন কুলজ রোগ ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। অনেক পবিত্র রক্ত অপবিত্র হইয়া যাইতেছে ; সংসারের সুখ নষ্ট হইতেছে।

দ্বিতীয়—অনেক বংশের আয়ু দীর্ঘ থাকে, পিতা পিতামহ প্রপিতামহ সকলেই দীর্ঘজীবী হয়। অতএব বিবাহ স্থির করিবার সময় প্রথম কেবল এই সকল বংশের সন্তান-সন্ততি অনুসন্ধান করা উচিত।

তৃতীয়—মৃতবৎসার কন্যা প্রায়ই মৃতবৎসা হয়। অতএব সে কন্যা পরিত্যাগ করিবে।

চতুর্থ—স্বল্পপুত্রীর কন্যা পরিত্যাগ করিবে। না করিলে বংশ হানি হইবার সম্ভাবনা।

পঞ্চম—কলহপ্রিয়ার কন্যা পরিত্যাগ করিবে। করিলে, সংসারে কলহ নিবৃত থাকে।

ষষ্ঠ—কন্যা অপেক্ষা বরপাত্রের বয়স ন্যূনকল্পে পাঁচ বছরের অধিক হওয়া উচিত।

সংসারের সুখ বিবাহের উদ্দেশ্য। সুস্থ শরীর, শান্ত স্বভাব এবং ধনোপার্জন প্রায় এই তিন লইয়া সংসারের সুখ। কেবল ৪টা পাস করিলেই যে সংসারের সুখ হইবে এমন নহে। ৪টা পাস করা বরপাত্র ধনোপার্জন করিলে করিতে পারে, কিন্তু তাহাই বলিয়া যে সে সুস্থশরীরী কি শান্ত স্বভাবাপন্ন হইবে, এরূপ বলা যায় না। সুতরাং কেবল পাস করা পাত্র অনুসন্ধান করিলে বিবাহ সুবিবাহ হইবে, এরূপ বিবেচনা গৃহিণীরা না করিলে ভাল হয়।

একটি ঘরের কথা

[১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা 'প্রচারে' 'একটি ঘরের কথা' ও 'একটি পরের কথা' নামে তুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধ তুটিরই শেষে লেখকের নাম হিসাবে শুধু ছিল 'শ্রীসঃ—'। এই 'স' যে সঞ্জীবচন্দ্রের নামের আত্মক্ষর তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তখনকার দিনে লেখার শেষে লেখকের পুরা নাম না দিয়ে, এইভাবে নামের আত্মক্ষরও কখন কখন দেওয়া হ'ত। যেমন, আগে দেখিয়েছি—১২৮১ সালের ভ্রমর পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রলোক' প্রবন্ধের শেষে লেখকের নামের জায়গায় ছিল—শ্রীবঃ। এইভাবে বঙ্গদর্শনে নবীনচন্দ্র সেনের নাম 'শ্রীনঃ', অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নাম শ্রীঅঃ, হিসাবেও ছাপা হ'ত।

সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ 'একটি ঘরের কথা' ও 'একটি পরের কথা' প্রবন্ধ তুটি এখানে পর পর উদ্ধৃত করছি—]

একটি ঘরের কথা

মুকুন্দ ঘোষ খুব বড় ঘরের ছেলে। বহু পূর্বে তাহার পূর্বপুরুষেরা খুব মান্য-গণ্য, ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী ছিলেন। কিন্তু ইদানীং পাঁচ সাত পুরুষ বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তালুক, মুলুক যাহা ছিল, সব গিয়াছে। ক্রমে বাগবাগিচা লাখেরাজ জোতজমাও বিক্রয় হইতেছে। ভদ্রাসনটুকুও কয়েক বৎসর নাই।

মুকুন্দরা একখানি ছোট খড়ো ঘরে থাকে। সে ঘরের চালেও আবার খড় নাই। চালাখানা স্থানে স্থানে শুকনা পাতা ঢাকা। মুকুন্দর মা, ভাইবোন প্রভৃতি পাঁচ ছয়টির পরিবার। তাহাদের তুবেলা অন্ন জুটে না। প্রায়ই ভিক্ষার উপর নির্ভর। কাহারো পরিধানের রীতিমত বস্ত্র নাই, সকলেই ছেঁড়া নেকড়া কোন রকমে গুছাইয়া পরিয়া লজ্জা রক্ষা করে। ১০।১২ বৎসরের ভাই তুটা ত্যাংটোই বেড়াইয়া বেড়ায়। মাসে তুই চারি আনা পয়সা হইলে তাহারা গ্রামস্থ পাঠশালায় তুই অক্ষর শিখিতে পারে। তাহাও জুটে না। দিবারাত্রি হো হো করিয়াই বেড়ায়। মুকুন্দর এক বৎসরের একটি ছোট ভাই তুধ খাইতে পায় না। যৎসামান্য স্তন্যপান করিয়া পেটের জালায় দিবারাত্রি

কাঁদিয়া কাঁদিয়াই কাটায়। এই ত গেল মুকুন্দর ঘরের অবস্থা। কিন্তু মুকুন্দ কলিকাতায় উন্নতি-বিধায়িনী সভার সভ্য হইয়া কেবল বড় বড় বক্তৃতা করে।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বাঙ্গালী মেম্বর হওয়াও কি ঠিক সেইরূপ নয়? বাঙ্গালী জাতি অতি অধম, অতি দরিদ্র, অতি অসার। বাঙ্গালীর ঘরে অন্ন নাই। যা এক আধ মুঠা অন্ন আছে, তাহা কেবল পরে অনুগ্রহ করিয়া লয় না বলিয়া আছে, নতুবা তাহাও থাকিবার কথা নয়। বাঙ্গালীর পরিধানের বস্ত্র নাই। যতক্ষণ না পরে একখানি আনিয়া দিবে, ততক্ষণ লজ্জা রক্ষা হওয়া ভার। একদিন বাঙ্গালী সমস্ত জগতকে কাপড় পরাইয়াছে। আজ বাঙ্গালী এতটুকু সুতার জন্যও পরের মুখাপেক্ষী। বাঙ্গালীর বিদ্যা নাই, বাঙ্গালী মূর্খ। বাঙ্গালীর সাহিত্য সবে শুরু হইয়াছে। সে সাহিত্যের শক্তি নাই, বিস্তার নাই, প্রকৃত সারবত্তা নাই, প্রকৃত সৌন্দর্য নাই, তেজ নাই, মহিমা নাই। বাঙ্গালীর দেহ দুর্বল, মনও দুর্বল। বাঙ্গালীর শৌর্য নাই, বীর্য নাই, সাহস নাই, শক্তি নাই, অধ্যবসায় নাই, উৎসাহ নাই, আশা নাই, আকাঙ্খা নাই। যাহা থাকিলে জাতি জাতি হয়, বাঙ্গালী জাতির তাহা নাই। তবে কেন বাঙ্গালী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বসিতে চায়? বাঙ্গালীর যাহা নাই বলিয়া বাঙ্গালী মানুষ নয়, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বসিলে বাঙ্গালী কি তাহা পাইবে? বাঙ্গালীর যাহা নাই বলিয়া বাঙ্গালী জাতি জাতি নয়, বাঙ্গালী কি তাহা পাইবে? তবে কেন বাঙ্গালী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বসিতে চায়? গরীবের ছেলে মুকুন্দের উন্নতি বিধায়িনী সভায় সভ্য হওয়াও যা বাঙ্গালীর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মেম্বর হওয়াও কি তাই নয়? ঘরে এত কাজ থাকিতে, আপনাকে মানুষ করিবার এত বাকি থাকিতে, আপনাদিগকে জাতি করিয়া তুলিবার এত বাকি থাকিতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মেম্বার হওয়া কেন? মানুষকে মানুষ করিতে কত শক্তি, কত সামর্থ্য, কত পরিশ্রম, কত যত্ন, কত একাগ্রতা, কত স্থির লক্ষ্য লাগে বল দেখি। এত শক্তি সামর্থ্য প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও মানুষকে মানুষ করিতে কত পুরুষ লাগে বল দেখি? আমাদের শক্তি সামর্থ্যের কি এতই বাহুল্য হইয়াছে যে, আমাদের ঘরের কাজ করিয়াও বাহিরের কাজের জন্য এত উদ্বৃত্ত থাকে? তবে কেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মেম্বর হওয়া বল দেখি?

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মেম্বর হইতেও কিছু শক্তির প্রয়োজন স্বীকার করি। কিন্তু যখন আমরা এখনও মানুষই হই নাই, জাতিই হই নাই, তখন যদি আমাদের কিছু শক্তি থাকে তবে সে শক্তিটুকু আপনাদিগকে মানুষ করিবার

কাজে ব্যয় না করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মেম্বর হওয়া প্রভৃতি মিছে কাজে ব্যয় করা কি বিজ্ঞের কাজ না দেশহিতৈষীর কাজ? আমরা মানুষ হই নাই, ইহা না বুঝিবার দরুণই আমরা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মেম্বর হইতে চাই। আমাদের ঘরের অবস্থা কি শোচনীয়, আমাদের মানুষ হইতে কতই বাকি, ইহাও আমরা বুঝি নাই—ইহা কি বিষম কথা! বাঙ্গালী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মেম্বার হইতে যাওয়াতেই ত এই বিষম কথাটা এত বিকটভাবে মনে উদয় হইল।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ইংরাজ জাতির জাতিত্বের অভিব্যক্তি। যে সকল শক্তির গুণে ইংরাজ ইংরাজ, যে সকল শক্তি সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া সহস্র রকমে ইংরাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, আজিকার ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সেই সমস্ত শক্তির অভিব্যক্তি বা অধিষ্ঠান স্থল। সে শক্তি বাঙ্গালীতে নাই, বাঙ্গালী সে শক্তিতে গঠিত হয় নাই। তবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বাঙ্গালীর স্থান কোথায়? বাঙ্গালীতে যে প্রকার শক্তি এবং যে সামান্য একটু শক্তি আছে, তাহা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টস্থিত শক্তির সহিত মিশ্ খাইবেই বা কেমন করিয়া, পারিয়া উঠিবেই বা কেমন করিয়া? কোরিন্থীয় প্রণালীতে নির্মিত যে গৃহ, তাহাতে গথিক প্রণালীতে নির্মিত যে স্তম্ভ, তাহা কেমন করিয়া খাটিবে? ইংরাজের শক্তিতে ইংরাজের পার্লামেণ্ট গঠিত। এতএব সে পার্লামেণ্ট ইংরাজকেই বুঝে, ইংরাজের আশা এবং আকাঙ্খাই মিটাইতে পারে। ভারতকে সে পার্লামেণ্ট বুঝে না, বুঝিতে পারে না এবং পারিবেও না। সে পার্লামেণ্ট কেমন করিয়া ভারতের আশা এবং আকাঙ্খা মিটাইবে? সেইজন্যই ত ব্রাইট ফসেটের ন্যায় সে পার্লামেণ্টের মহা প্রতাপশালী ইংরাজ সভ্যেরাও ভারতের জন্য কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। তবে ক্ষুদ্র বাঙ্গালী সে পার্লামেণ্টে গিয়া ভারতের জন্য কি করিবে? বাঙ্গালী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ধাত্ বুঝে না বলিয়া সে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য এত ব্যাকুল। সে ব্যাকুলতা বাঙ্গালীর অসারতার প্রমাণ মাত্র।

বাঙ্গালী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বসিয়া ভারতের কিছু কাজ করিতে পারুক আর না পারুক, ভারতের এবং সর্বাপেক্ষা বাঙ্গালীর মান বৃদ্ধি করিবে ও নাম উজ্জ্বল করিবে ইহা ও কি কথা? বাঙ্গালী বিজিত, ইংরাজ বিজেতা। বিজেতার পার্লামেণ্টে বসিয়া বাঙ্গালী যদি এমন মনে করেন যে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি হইল, তবে ত তিনি তাঁহার বিজিত বা পরাধীন অবস্থাকেই শ্রেয় বা

সম্মানসূচক অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিজেতার গোলামি করিয়াই বা সম্মানিত মনে করিবেন না কেন? বিজেতা ভাল হইলে তাঁহার অধীনে থাকার লাভও আছে এবং কিছু সুখও আছে এবং সেইজন্য বিজেতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও একান্ত কর্তব্য। কিন্তু বিজেতা যতই ভাল হউন, বিজিত অবস্থাকে সম্মানের অবস্থা মনে করিলে বিজিতেরা কখনই মানুষ হইতে পারিবে না, জাতিও হইতে পারিবে না।

আর একটু ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাঙ্গালী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মেম্বর হইলে বাঙ্গালীর মান বৃদ্ধি হইবে না, ইংরাজেরই মান বৃদ্ধি হইবে। বাঙ্গালী যদি পার্লামেণ্টের মেম্বর হইতে পারে, তবে জর্মান প্রভৃতি স্বাধীন এবং সুসভ্য জাতীয় লোকে তাহাকে প্রকৃতপক্ষে সম্মানার্হ বলিয়া মনে করিবে না, বরং ঘৃণা করিবে এরূপ সম্ভব। আর পার্লামেণ্টের মেম্বর হওয়া বিশেষ সম্মানের কথাই বা কিসের তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। পার্লামেণ্টের মেম্বর হইতে গেলে যে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন তাহাও বোধ হয় না। সামান্য একটু বুদ্ধি এবং একটু বাকশক্তি থাকিলেই পার্লামেণ্টে প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। কিন্তু সেরূপ একটু ক্ষমতা থাকিলে মানুষ যে বিশেষ সম্মানার্হ হয় তা নয়। তবে বাঙ্গালী পার্লামেণ্টের মেম্বর হইলে যাহারা প্রকৃত মানুষ তাহাদের কাছে কিসে যে সম্মানার্হ হইবে বুঝিতে পারি না। ফলতঃ বাঙ্গালী পার্লামেণ্টের মেম্বর হইলে বাঙ্গালীর মান বাড়িবে না, ইংরাজেরই মান বাড়িবে। বিজিতকে আপনার সর্বোচ্চ অসীম-মহিমা-মণ্ডিত স্বাধীন-শক্তি-সম্পন্ন শাসন সমিতিতে বসিতে দিলে প্রকৃত মানুষের কাছে ইংরাজেরই মান বাড়িবে, বাঙ্গালীর মান বাড়িবে না। তবে সে সমিতিতে বসিবার জন্য বাঙ্গালী এত ব্যাকুল কেন? বাঙ্গালীর দুর্বুদ্ধি কি ঘুচিবে না? বাঙ্গালীর সুদিনের সূত্রপাত কি হইবে না?

শ্রীসঃ—

একটি পরের কথা

পরের কথা কহিতে নাই। তবে পরকে লইয়া ঘর করিতে হইতেছে, তাই পরের কথা না কহিলেও চলে না। ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজ কেন যুদ্ধ করিলেন, এ পর্যন্ত ভাল বুঝা গেল না। কেহ বলেন, ব্রহ্মরাজ বড় অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া যুদ্ধ হইল ; কেহ বলেন, ব্রহ্মরাজ্যের ধনরাশির জন্য যুদ্ধ হইল। কোন্‌টা ঠিক কথা তাহা এখন বলা যায় না, এবং বলাও উচিত নয়। কোন্ কথাটা ঠিক, যুক্তি ও অনুমানের দ্বারা তাহা এক রকম স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা আমরা বলিব না। ধনলোভ যদি যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হয়, ইংরাজ তাহা মানিবেন না। মানিলে বিশেষ হানি কিছু নাই, বরং কিছু লাভ আছে। ধনলোভে পরের রাজ্য লইলাম, এ কথাটা বড় লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই যদি ঠিক হয়, তবে স্পষ্ট করিয়া সে কথাটা বলিলে ইংরাজের উপর বাস্তবিক তত অভক্তি হয় না। বরং সে কথাটা ছাপাইয়া, ব্রহ্মবাসীদিগের উপকার কি এমনি কোন একটা লম্বা চৌড়া কারণ নির্দেশ করিলে ইংরাজের উপর বেশী অভক্তি হয়। কিন্তু ধনলোভ যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হইলেও ইংরাজ তাহা মানিবেন না। ব্রহ্মরাজের অত্যাচারই যুদ্ধের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিবেন। স্টেটসম্যান সংবাদপত্রের সুযোগ্য এবং সরলমতি সম্পাদক মহাশয়ও সেই কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। আমরাও সেই কারণটিকে প্রকৃত কারণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া দুই একটি কথা বলিব।

ব্রহ্মরাজ থিব যে অত্যাচারী ছিল, তাহার প্রমাণ কই ? তাহার অত্যাচার যদি প্রমাণীকৃত হয়, তবে সে কি জন্য অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা ত বুঝিয়া দেখা চাই। অত্যাচার করিয়া থাকিলেই যে থিব রাজ্যচ্যুত হইবে, এমন ত কথা নাই। যাহাদিগকে থিব মারিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা যদি থিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে, থিবকে এবং তাহার পরিবারকে মারিয়া ফেলিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিবার অভিসন্ধি করিয়া থাকে, তবে তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকিলেও থিব ব্রহ্মরাজ্যের রাজনীতি অনুসারে অন্যায় কার্য না করিয়া থাকিতে পারে। এবং যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে থিবকে রাজ্যচ্যুত করিবার বিশিষ্ট কারণও জন্মে নাই। এ রকম কথাও ত লোকে বলিতে পারে। এ কথার উত্তর কি ?

বিশিষ্ট কারণেই হউক অথবা বিনা কারণেই হউক থিব যদি লোক হত্যা করিয়া থাকে, ইংরাজের তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার কারণ কি? থিব আপনার রাজ্যে আপনার প্রজাকে মারিয়াছে, ইংরাজ তাহাতে কথা কহিবেন কেন? কাহাকে একটা অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে পাঁচজনে তাহার বিরুদ্ধে অথবা তাহা নিবারণার্থ পাঁচ কথা কয় বটে, কিন্তু সে যদি তাহাদের কথা না শুনে তবে তাহারা নাচার; তাহাদের আর কথা কহিবার অধিকার থাকে না। বিশেষ সে ব্যক্তি যদি স্বতন্ত্র সমাজস্থ হয় তবে ত কাহারো কোন কথা চলে না। শ্যাম রামকে মারিয়াছে। হরি শ্যামকে নিষেধ করিল। শ্যাম নিষেধ বাক্য শুনিল না। হরি শ্যামকে মারিবে নাকি? শ্যামের অত্যাচার নিবারণের প্রকৃত উপায় রামের হাতে। রাম কেন শ্যামকে মারিয়া হউক কি অন্য যে প্রকারে হউক নিরস্ত করুক না। থিব স্বাধীন রাজা ছিল। সে অত্যাচার করিয়া থাকিলে ইংরাজ তাহাতে কথা কহিবেন কেন? সে অত্যাচার নিবারণের উপায় তাহার প্রজাদের হাতে ছিল। কিন্তু তাহারা ত কিছু করে নাই—আপনারাও কিছু করে নাই এবং ইংরাজকে কি অপর কাহারও কিছু করিতে বলে নাই। তবে ইংরাজ কথা কনই বা কেন, আর থিবকে মারেনই বা কেন?

যদিও ইংরাজ দয়াধিক্যবশত কথা কন, তাঁহার কথা থিব না শুনিলে থিবকে তিনি কোন্ স্বত্বে রাজ্যচ্যুত করেন? স্টেটসম্যান সম্পাদক মহাশয় একটা international police-এর কথা কহিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে, কোন রাজা যদি তাঁহার প্রজার উপর বেশী অত্যাচার করেন অথবা প্রজাকে মারিয়া ফেলেন, তবে অন্য রাজার তাঁহার সেই অত্যাচার নিবারণ করিবার অধিকার আছে, এবং সেই জন্য অন্য রাজা তাঁহার সহিত যুদ্ধ পর্যন্ত করিতে পারে। এ নিয়মটা কোথাও সর্ববাদী সম্মতরূপে প্রচলিত আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইউরোপে কেবল তুর্কের সম্বন্ধে চলে, আর কাহারো সম্বন্ধে চলে না। এশিয়াতে এ নিয়ম কখনই চলে নাই; এবং চলিতে পারে এশিয়ার এখনও সে রকম অবস্থা হয় নাই। ইংরাজ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান, ইংরাজ এ নিয়মের অর্থ ও উপকারিতা বুঝিতে পারে। ব্রহ্মদেশবাসী তেমন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান নয়, ব্রহ্মদেশবাসী এ নিয়মের অর্থ বা উপকারিতা বুঝিতে পারে না। অতএব international police-এর নিয়ম এশিয়াতে কেমন করিয়া খাটিতে পারে বুঝিতে পারি না। যে নিয়ম international হইবে, তাহা সকল জাতির

বুঝিয়া স্বীকার করা চাই, নহিলে সে নিয়ম কেমন করিয়া international হইবে? আর একটা কথা এই—মনে কর, এশিয়াতে international police; এর নিয়মটা যুক্তিযুক্তরূপেই হউক আর অযৌক্তিকরূপেই হউক খাটান গেল। তারপর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। একজন বড় রাজার যদি একজন ছোট রাজার অত্যাচার বা অন্যায় নিবারণ করিবার অধিকার থাকে, তবে একজন ছোট রাজারও একজন বড় রাজার অত্যাচার বা অন্যায় নিবারণ করিবার অধিকার থাকিবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মরাজের অত্যাচার বা অন্যায় বৃহৎ ইংরাজরাজ নিবারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্রহ্মরাজ যদি বৃহৎ ইংরাজরাজের অত্যাচার বা অন্যায় নিবারণ করিতে চাহেন, তাহাতে বৃহৎ ইংরাজরাজ কি কোন কথা কহিবেন না? এই যে ইংরাজরাজ্যে প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া জ্বরে কত লোক মরিয়া যাইতেছে, ইংরাজরাজ তাহা নিবারণের বিশেষ কিছু উপায় করিতেছেন না। ইহাও ত একরকম প্রজা মারা বটে! এই সে বৎসর দুর্ভিক্ষে মান্দ্রাজে যে কত লোক মরিল, সেও ত ইংরাজরাজের দোষে এবং সেও ত একরকম প্রজা মারা বটে। সে রকম মারা যে একেবারে গলা কাটিয়া মারিয়া ফেলার অপেক্ষা ভয়ানক মারা। কিন্তু ব্রহ্মরাজ কি অপর কোন ক্ষুদ্র রাজা যদি সেই জন্য ইংরাজকে কোন কথা বলিতেন বা ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেন, তাহা হইলে ইংরাজরাজ কি বড় সন্তুষ্ট হইতেন, না তাহাকে ন্যায় যুদ্ধ বলিয়া আপনার শাসন প্রণালী সংশোধন করিতেন? কখনই নয়। তবে কেন এই লম্বাচৌড়া international police-এর দোহাই দিয়া একটা অন্যায় যুদ্ধের পোষকতা কর? আরো এক কথা। বড় রাজা ক্ষুদ্র রাজাকে দমন করিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র রাজা বড় রাজাকে দমন করিতে পারে না। তবে বড় রাজা এবং ক্ষুদ্র রাজার মধ্যে কেমন করিয়া international police-এর নিয়ম খাটিতে পারে? যে নিয়ম সকলের প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা নাই, সে নিয়ম সকলের প্রতি কেমন করিয়া খাটিতে পারে বুঝিতে পারি না। ফল কথা, international police-এর কোন অর্থ নাই। ও কথাটা না তোলাই ভাল।

শেষ বলিবে যে, অত্যাচার বা অন্যায় দেখিলে যাহার তাহা নিবারণ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার তাহা নিবারণ করা কর্তব্য। মানিলাম, তাহাই ঠিক। কিন্তু অত্যাচার, অন্যায় ও নৃশংসতা ত পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। প্রশান্ত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে অসভ্য জাতিদের মধ্যে ভয়ানক মারামারি, কাটাকাটি

অত্যাচার, অবিচার হইয়া থাকে। দয়ালু ইংরাজ ত সেখানে গিয়া অত্যাচার নিবারণ করিয়া সুশাসন স্থাপন করেন না। তাহা করিবার ত ইংরাজের ক্ষমতা আছে। তবে কি দয়া ধর্মের কথাটাও মিথ্যা ?

এই সকল কারণে বাঙ্গালী ব্রহ্মযুদ্ধের বিরোধী। বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া দেও যে, ব্রহ্মযুদ্ধটা ন্যায় যুদ্ধ হইয়াছে, সে অবশ্যই ভুল স্বীকার করিবে।

শ্রীসঃ--

[এই ব্রহ্মযুদ্ধ প্রসঙ্গেই এবার শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের একটা লেখা এখানে উদ্ধৃত করছি। শ্রীশবাবু লিখেছিলেন—

'১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ বেলা সাড়ে দশটার আমলে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে রাশিয়ার বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ প্রফেসর বনরফ বঙ্কিম-চন্দ্রের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। পূর্বাহ্নে বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত এবং রাজকুমার সর্বাধিকারী প্রভৃতি কলু-টোলায় তাঁহার বাসায় সমবেত হন। প্রবীণ প্রফেসর নববিজিত বর্মামুলুক সম্প্রতি ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন—সে দেশ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কোন পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে কিনা ?

রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন—দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র যে মতামত করিয়াছে, তাহা ব্রহ্ম বিজয়ের অনুকূল নহে। কিন্তু কোন পুস্তিকা (pamphlet) কেহ লেখে নাই।

প্রফেসর পুনরায় বিশেষভাবে ইহার কারণ জানিতে কৌতূহলী হইলে বঙ্কিম-বাবু বলিলেন—আসল কথা স্পষ্ট করিয়া মতামত দিতে কাহারো সাহস হয় না।'—(বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ, তৃতীয় প্রস্তাব)।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় সেদিনের ঐ বৈঠকে শ্রীশবাবুও উপস্থিত ছিলেন।

'একটি পরের কথা' প্রবন্ধে আমরা দেখছি, সঞ্জীবচন্দ্র নানা যুক্তি সহকারেই নির্ভয়ে ইংরাজের ব্রহ্ম জয়ের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। অন্য দেশের স্বাধীনতার প্রতিও সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটা আন্তরিক ভালবাসা বা মমত্ববোধ ছিল, এই প্রবন্ধটি তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

এমনি 'একটি ঘরের কথা' প্রবন্ধেও তিনি মুকুন্দ ঘোষের উদাহরণ দিয়ে বাঙ্গালী চরিত্রের যে দৈন্য, অক্ষমতা ও মোহের তীব্র সমালোচনা করেছেন, তাতেও তাঁর ঐকান্তিক দেশাত্মবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

এবার একটা অন্য কথা—

এই 'একটি ঘরের কথা' প্রবন্ধটি চন্দ্রনাথ বসুর 'ত্রিধারা' গ্রন্থে 'বাঙ্গালীর প্রকৃত কাজ' নামে ছাপা হয়েছে। সেখানে কোথাও সঞ্জীবচন্দ্রের নাম না থাকলেও এটি সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য—

তখনকার দিনে একে অপরের রচনাকেও সম্মতি নিয়ে নিজের গ্রন্থভুক্ত করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্ত' গ্রন্থে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দুটি লেখা দিয়েছেন। অবশ্য ভূমিকায় তিনি ঐ দুই লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন।

চন্দ্রনাথ বসুও তাঁর ঐ 'ত্রিধারা' গ্রন্থেই অক্ষয়চন্দ্র সরকারের একটি পুরা প্রবন্ধ দিয়েছেন। তিনি তাঁর ঐ গ্রন্থের অন্য এক প্রবন্ধের পাদটীকায় এ প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন।

ঠিক রচনা না হলেও রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত একটি গল্প প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'নব কথা' গল্প-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রভাতকুমার তাঁর ঐ বইয়ের প্রথম সংস্করণে এ সম্পর্কে কিছু না বললেও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন—'গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে দান করিয়াছিলেন।'

ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও রবীন্দ্রনাথ এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাবেই কয়েকটি গল্প দান করেছিলেন।

আমার বিশ্বাস, চন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখাটির ন্যায় সঞ্জীবচন্দ্রেরও এই লেখাটি নিজের গ্রন্থভুক্ত করতে চাইলে, সঞ্জীবচন্দ্র তাতে সম্মতি দেন এবং রবীন্দ্রনাথের মতই নিস্পৃহ হয়ে নিজের নাম দিতে নিষেধ করেন।

নিজের নাম প্রচারের দিকে সঞ্জীবচন্দ্রের আদৌ ঝোঁক ছিল না। তিনি তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে এবং ভ্রমরে অনেকেরই পুরা নাম এবং নামের আদ্যক্ষর দিয়ে তাঁদের বহু রচনা প্রকাশ করেছেন; কিন্তু নিজের কাগজে নিজের লেখার সঙ্গে কোথাও নাম দেন নি। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনেও তাঁর লেখার সঙ্গে নাম দিতে নিষেধ করেছিলেন। কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালই তাঁর 'প্রচারে' কখন নাম দিয়ে, কখন নামের আদ্যক্ষর দিয়ে, কখন বা

লেখার সঙ্গে নাম না দিয়ে, কেবল মলাটের সূচীতে নাম দিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের ক'টি লেখা ছেপে ছিলেন।

নামের মোহ না থাকায় সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'যাত্রা সমালোচনা', 'সংকার' ও 'বাল্যবিবাহ' এই বইগুলির কোনটিতেই, এমন কি তাঁর বিখ্যাত বই 'জাল প্রতাপচাঁদে'ও নিজের নাম দেন নি। শুধু মুদ্রাকর, প্রকাশকেরই নাম ছিল।

সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখা চন্দ্রনাথের চিঠিপত্রাদি থেকে জানা যায়, চন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় মেজদা বলে ডাকতেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। সঞ্জীবচন্দ্রও চন্দ্রনাথকে খুবই স্নেহ করতেন। আমার মনে হয়, এই স্নেহের জোরেই চন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের 'একটি ঘরের কথা'কে নিজের বইয়ে দিয়ে ছিলেন। মূল প্রবন্ধের নামটা শুধু বদল করে ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের অনেক লেখায় দেখা যায়, বাঙ্গালী জাতির প্রতি তাঁর একটা গভীর দরদ ছিল। এই কারণেই হয়ত তিনিও চেয়েছিলেন, এই প্রবন্ধটা যখন নিজের কোনও বইয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তখন বাঙ্গালী তাঁদের প্রকৃত কাজ কি তা জানুক। নিজের নামের কোনও দরকার নেই।

'প্রচারে' 'শ্রীসঃ'র 'একটি ঘরের কথা' ও 'একটি পরের কথা' পর পর প্রকাশিত হয়। প্রথমটি চন্দ্রনাথের রচনা হলে দ্বিতীয়টিও চন্দ্রনাথেরই রচনা হওয়া স্বাভাবিক। আর তাহলে তিনি দ্বিতীয় রচনাটিকেও তাঁর কোন না কোন বইয়ের অন্তর্গত করতেনই। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তাই শ্রীসঃ নামের রচনা দুটি সঞ্জীবচন্দ্রেরই।

তাছাড়া আমি তো আগে বলেছি, তখনকার পত্র-পত্রিকায় অনেক সময় লেখকের পুরা নামের বদলে লেখকের নামের শুধু আদ্যক্ষর দেওয়া হ'ত। সেই হিসাবে চন্দ্রনাথ বসুর নামের জায়গায় থাকত শ্রীচঃ।

'প্রচারে' এই শ্রীচঃ নামেই চন্দ্রনাথ বসুর লেখা ছাপা হ'ত। শ্রীসঃ নামে তাঁর লেখা কখন ছাপা হয় নি। ১২৯২ সালের ফাল্গুন-চৈত্র যুগ্ম-সংখ্যা প্রচারে 'পাখিটি কোথায় গেল' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখার শেষে লেখকের নামের জায়গায় ছিল শ্রীচঃ। শ্রীচঃ ই যে চন্দ্রনাথ বসু তার প্রমাণ ঐ সংখ্যা প্রচারের মলাটে লেখার সঙ্গে লেখকের পুরা নাম দিয়ে যে সূচী ছিল, তাতে 'পাখিটি কোথায় গেল'র সঙ্গে নাম ছিল চন্দ্রনাথ বসু। তাই প্রচারে শ্রীসঃ স্বাক্ষরিত রচনা সঞ্জীবচন্দ্রেরই। চন্দ্রনাথ বসুর কখনই নয়।]

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে অনুমান করা কয়েকটি প্রবন্ধ

'ভ্রমর' ও 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত যে প্রবন্ধগুলিকে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে অনুমান করেছি, এবার সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলছি—

১২৮১র শ্রাবণ সংখ্যা 'ভ্রমরে' প্রকাশিত 'একঘরে' প্রবন্ধটির এক জায়গায় আছে—

'কোন জমিদার বা নীলকর আমাদের প্রতিবাসীকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গেলে অথবা অন্য প্রকার পীড়ন করিলে, আমরা কোন কথাই কহি না। মনে ভাবি—আমাদের উপর ত কোন পীড়ন হয় নাই, তবে অন্যের নিমিত্ত আমরা কেন কথা কহিব; যাহার বিপদ সে-ই একা ভোগ করুক, আমরা অন্যের নিমিত্ত কথা কহিয়া কেন অনর্থক দোষী হইব।

পীড়ন যদি কেবল সেই প্রতিবাসীর উপর হইয়া শেষ হইত, তাহা হইলে এই পরামর্শ বিজ্ঞের ন্যায় হইয়াছে বলিতাম। কিন্তু দমন না হইলে পীড়ন সমাজে ক্রমেই বৃদ্ধি পায়; অদ্য অন্যের উপর পীড়ন অবাধে সম্পন্ন হইল, কল্য তোমার উপর হইবে।...প্রতিবাসীর উপর পীড়ন হইয়াছে; পীড়ন আর দূরে নাই, নিকটে আসিয়াছে।

কিন্তু আমাদের সে দূরদৃষ্টি নাই। আমাদের দৃষ্টি কেবল আপনার উপস্থিত স্বচ্ছন্দতার প্রতি; কেবল আপনার ঘরের প্রতি। যতক্ষণ আপনার ঘরের মধ্যে কোন ব্যাঘাত না হয়, ততক্ষণ আমরা ভাবি পৃথিবীতে কোন বিঘ্ন নাই। সমাজের কেবল এই এক ঘরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি, এইজন্য বলি আমরা একঘরে।'

আমরা জানি সঞ্জীবচন্দ্র 'প্রতিবেশী' না লিখে 'প্রতিবাসী' লিখতেন। এই প্রবন্ধে যেমন, তেমনি তিনি 'পালামৌ'য়েও লিখেছেন—'বাঙ্গালী মাত্রেই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা। যাহা নিন্দা শুনা যায়, তাহা কেবল প্রতিবাসীরই। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়...। যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই, তাহাদের নাম ঋষি।'

আর প্রতিবাসীদের যে স্বভাবের কথা 'একঘরে' প্রবন্ধে আছে, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসেও সেই ধরণেরই কথা বলেছেন। যেমন—



সঞ্জীবচন্দ্র

'পাগলী শুনিবামাত্র ছুটিল। গ্রামের মধ্যে যাইয়া দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল—হিন্দুর হিন্দুত্ব যায়, সকলে উঠ; সতীর সতীত্ব যায়, একবার সকলে উঠ। অদিতি ভট্টাচার্যের সর্বনাশ হয়, একবার সকলে উঠ। ফৌজদারের পুত্র আসিয়া তাহার পুত্রবধূকে হরণ করে, একবার সকলে উঠ।

কেহই উঠিল না। কেহ বলিল—'যাউক শত্রু পরে পরে।' কেহ বলিল —'পরের নিমিত্ত মাথা দিবার আমার কি প্রয়োজন পড়িয়াছে?' কেহ বলিল—'অদিতির সর্বনাশ হয় যদি, তাহাতে আমার কি ক্ষতি?'

ক্ষতি আছে। আমরা ভিন্ন তাহা অপর দেশীয় সকলে বুঝে, বিপদ অদ্য আমার, কল্য তোমার। অত্যাচার একঘরে প্রবেশ করিতে চাইলে সকল ঘরে পথ পায়। অগ্নি এক ঘরে লাগিলে সকল ঘর আক্রমণ করে। পরের ঘরের অগ্নি যে নিবায়, কেবল সেই আপনার ঘর রক্ষা করে। এ বোধ বাঙ্গলা হইতে অনেক কাল অন্তর্হিত হইয়াছে।'

'একঘরে' প্রবন্ধের আর এক জায়গায় আছে—

'একতা এবং পরস্পরের সহায়তা সমাজের মূল। একতা না থাকিলে বলিষ্ঠও দুর্বল। কোন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, মনুষ্য অপেক্ষা সিংহ ও ব্যাঘ্র মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও মনুষ্যদিগকে পৃথিবী হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিল না। তাহারা পরস্পরে সহায়তা করিতে পারে না, করিতে জানে না, কোন উদ্দিষ্ট সাধন করিবার নিমিত্ত পরস্পর সমবেত হইতে পারে না, এইজন্য তাহারা মনুষ্যকে উচ্ছেদ করিতে পারিল না।'

প্রায় এই ধরণেরই লেখা দেখা যায় সঞ্জীবচন্দ্রের 'মাধবীলতা' উপন্যাসেও। যেমন—'বাঘ বলিল, আমায় পিঞ্জরাবদ্ধ করে রাখা তোমাদের কৌশলের পরিচয় মাত্র, তোমাদের বলবীর্যের পরিচয় নয়। তোমরা দুর্বল একত্রে থাকাই তাহার পরিচয়। যদি তোমরা আমাদের মত বলিষ্ঠ হইতে, তাহা হইলে তোমাদের সমাজ কখন গঠিত হইত না, তোমরা কখন একত্রে বাস করিতে না।'

'একঘরে' প্রবন্ধে যেমন দেখছি, 'কোন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন' আছে; তেমনি সঞ্জীবচন্দ্র 'পালামৌ' গ্রন্থেও লিখে গেছেন—'একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না।'

এইভাবে আরও উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে, 'একঘরে' সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা।

১২৮১ সালের জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ সংখ্যা 'ভ্রমরে' 'ভারত ভাণ্ডারি' নামে একটি কৌতুক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্র যেরূপ পরিহাস-প্রিয় মানুষ ছিলেন, তাতে করে 'ভারত ভাণ্ডারি'র মত কৌতুককর রচনা নিজের কাগজে লেখাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

ঐ '৮১র ফাল্গুনের ভ্রমরে 'বাহুবল' নামে যে প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল, সেটিও সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাহুবল ও বাক্যবল' নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রও সেইরূপ 'বাহুবল' নামে প্রবন্ধ লিখে থাকতে পারেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ১২৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, অর্থাৎ সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধ বেরোবার অনেক পরে।

১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দু সংখ্যা ভ্রমরে 'কীর্তন' নামে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্র 'যাত্রা' নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাই মনে হয়, নিজের কাগজে 'কীর্তন' প্রবন্ধটিও তাঁরই লেখা।

১২৮৫ সালের আশ্বিন মাসের ভ্রমরে 'অকাতরে বিবাহ' নামে যে প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল, সেটিও সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা বলে অনুমান হয়। কারণ, এর আগের সংখ্যায় অর্থাৎ ভাদ্র মাসের ভ্রমরে 'বাল্য-বিবাহ' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি ছিল সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা।

নিশ্চিত করে নির্দেশ করা না গেলেও, এটা ঠিক যে, ভ্রমরে তাঁর এইরূপ আরও অনেকগুলি প্রবন্ধ রয়েছে। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র ত বলেই গেছেন, সঞ্জীবচন্দ্র প্রায় একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখতেন, আর কারও সাহায্য সচরাচর নিতেন না।

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় সর্বসমেত প্রকাশিত ১৭ সংখ্যা ভ্রমর এক খণ্ডে বই আকারে বাঁধানো আছে। এই বইয়ের ভিতরে 'পুস্তানি'র পাতায় সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শতঞ্জীবচন্দ্র (জ্যোতিশচন্দ্রের পুত্র) ভ্রমরে প্রকাশিত কোন্ লেখাগুলি সঞ্জীবচন্দ্রের, কোন্ লেখাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের, আর কোন্গুলি জ্যোতিশচন্দ্রের তার একটি তালিকা লিখে রেখে গেছেন। শতঞ্জীববাবু, তাঁর

পিতা জ্যোতিশচন্দ্রের কাছে শুনেই এই তালিকাটি করেছিলেন। শতঞ্জীব-বাবুর তালিকাটি এইরূপ—

ভ্রমর মাসিক পত্রিকা

ইহাতে এক বৎসরের একত্রে বাঁধান আছে।

পিতামহ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত।

ইহাতে পিতামহ সঞ্জীবচন্দ্রের নিম্নলিখিত পুস্তক আছে—

১। কণ্ঠমালা
২। রামেশ্বরের অদৃষ্ট
৩। দামিনী
৪। একঘরে
৫। ভারত ভাণ্ডারি
৬। বাহুবল
৭। সৎকার
৮। যাত্রা
৯। কীর্তন
১০। আর্য জাতির চিত্রপট
১১। বাল্য-বিবাহ
১২। অকাতরে বিবাহ
১৩। আনারবল্লী
১৪। দুর্গাপূজা
১৫। স্ত্রীজাতি বর্ণনা

৺বঙ্কিমচন্দ্রের ।লখিত—

বৃষ্টি—পৃঃ ৫৫

বঙ্গে দেবপূজা—পৃঃ ১৫৭

পিতা ৺জ্যোতিশচন্দ্রের লিখিত—

১। জলে ফুল
২। স্বপন
৩। প্রভাত যামিনী
৪। ভ্রমর
৫। বিধবা

শতঞ্জীববাবুর এই তালিকাটি সম্বন্ধে এখন দু একটা কথা বলার আছে—

প্রথমত—তিনি যে বলেছেন, এক বছরের ভ্রমর বাঁধানো আছে, তা নয়। ১৭ মাসের ভ্রমর এক সঙ্গে বাঁধানো আছে।

দ্বিতীয়ত—'বঙ্গে দেবপূজা' নামক বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাটি ভ্রমরে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি ভ্রমরের যে পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়েছেন, তা ঠিক নয়।

তৃতীয়ত—শতঞ্জীববাবু তাঁর তালিকায় ভ্রমরে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রলোক' প্রবন্ধটির উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। এই চন্দ্রলোক প্রবন্ধটি ১২৮১ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং লেখার শেষে লেখকের নামের জায়গায় 'শ্রীবঃ' ছিল। পরে বঙ্কিমচন্দ্র এই 'চন্দ্রলোক' প্রবন্ধটিকে তাঁর 'বিজ্ঞান রহস্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে যান।

১২৮১র আশ্বিনে প্রকাশিত 'দুর্গাপূজা' প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা হওয়া অসম্ভব নয়।

'চন্দ্রলোক' প্রবন্ধের শেষে 'শ্রীবঃ' এবং 'বঙ্গে দেবপূজা' প্রবন্ধের শেষে 'বঃ' থাকলেও 'বৃষ্টি' প্রবন্ধটির শেষে লেখকের নামের জায়গায় কিছুই নেই। তবুও 'বৃষ্টি' যে বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচনা এটি শতঞ্জীববাবু ঠিকই লিখেছেন।

'জলে ফুল' কিন্তু জ্যোতিশচন্দ্রের লেখা নয়, এটি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা একটি কবিতা। এটি বাদে জ্যোতিশচন্দ্রের লেখার তালিকাটি ঠিকই আছে।

জ্যোতিশচন্দ্র বহু বছর পরে এই লেখাগুলির কথা শতঞ্জীবকে বলতে গিয়ে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রলোক' ও 'জলে ফুলে'র কথা ভুলে গিয়ে ছিলেন, তেমনি সঞ্জীবচন্দ্রের লেখাগুলির কথাও বলতে গিয়ে কিছুটা ভুল করে ছিলেন বলে আমার মনে হয়। কারণ—

১। শতঞ্জীববাবু 'আর্য জাতির চিত্রপট' প্রবন্ধটিকে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে লিখে গেছেন। কিন্তু ভ্রমরে দেখছি, এই প্রবন্ধের শেষে লেখক হিসাবে নাম আছে—শ্রীলালমোহন শর্মা। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ভ্রমরে ১২৮২র আষাঢ় মাসে।

সঞ্জীবচন্দ্র প্রমথনাথ বসু এই কাল্পনিক নামের প্র, না, ব শব্দগুলো নিয়ে ঐ ছদ্মনামে 'পালামৌ' লিখেছিলেন জানা যায়, কিন্তু তিনি কি আবার লাল-মোহন শর্মা ছদ্মনামও নিয়েছিলেন? না লালমোহন শর্মা অন্য কোন ব্যক্তি? লালমোহন শর্মা সঞ্জীবচন্দ্র নন বলেই আমার ধারণা।

২। ১২৮৫ সালের আশ্বিন সংখ্যা ভ্রমরে প্রকাশিত গল্প 'আনারবল্লী' সঞ্জীবচন্দ্রের কিনা সে বিষয়ে একটা সন্দেহ হয়। কারণ, সঞ্জীবচন্দ্র 'প্রতিবেশী' না লিখে লিখতেন 'প্রতিবাসী'। কিন্তু আনারবল্লীতে বার বার 'প্রতিবেশী' দেখছি। এইরূপ আরও দু একটা শব্দ আছে। বলা বাহুল্য, এই লেখার শেষেও লেখকের কোন নাম নেই। আর শতঞ্জীববাবু তাঁর তালিকায় 'স্ত্রীজাতি বর্ণনা' বলে যে রচনাটির কথা বলেছেন, ওটা আসলে 'স্ত্রীজাতি বন্দনা'।

৩। শতঞ্জীববাবু তাঁর তালিকায় দুটি রচনাকে সঞ্জীবচন্দ্রের না বলে ভুল করেছেন। ঐ রচনা দুটি হ'ল—ভ্রমরের প্রথম সংখ্যায় প্রথম রচনা 'ভ্রমর'। যেটা মুখবন্ধে সম্পাদকের কথা ধরণের। আর ভ্রমর এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর ১২৮২র বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম রচনা 'ভ্রমরের আত্মকথা'। এই লেখা দুটি যে সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের লেখা তাতে কোন সন্দেহই নেই।

এই প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে, শতঞ্জীববাবু তাঁর তালিকায় জ্যোতিশ-চন্দ্রের রচনা বলে যে 'ভ্রমর'-এর কথা লিখে গেছেন সেটা ঠিকই। এই 'ভ্রমর' একটি কবিতা। ১২৮৫র ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু লেখার সঙ্গে লেখক হিসাবে কারও নাম ছিল না।

এইরূপ দু একটা ভুল এবং একটু-আধটু সন্দেহ ছাড়া শতঞ্জীববাবুর তৈরি তালিকটি ঠিক বলেই মনে করি।

শতঞ্জীববাবু তাঁর ঐ তালিকায় সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে যেগুলির উল্লেখ করে গেছেন, সেগুলির মধ্যে কণ্ঠমালা, রামেশ্বরের অদৃষ্ট, সংকার, বাল্য-বিবাহ ও যাত্রা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবিতকালেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। আর সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর চার বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'দামিনী' গল্পটিকে নিয়ে 'সঞ্জীবনী সুধা'র অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করেছিলেন।

দেখা গেল, শতঞ্জীববাবু তাঁর তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের এবং সঞ্জীবচন্দ্রেরও ক'টি রচনার নাম উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। আমার মনে হয়, ঠিক এমনিই তিনি ভ্রমরে প্রকাশিত 'নিদ্রা' প্রবন্ধটিকেও সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলতে ভুলে গেছেন।

ভ্রমরের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এই 'নিদ্রা' প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কেন দৃঢ় বিশ্বাস, সে সম্বন্ধে যুক্তিসহ পুরা প্রবন্ধটি পরে উদ্ধৃত করেছি।

ভ্রমরের ন্যায় সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনেও এইরূপ অনেক প্রবন্ধ আছে, যা আজ সঠিকভাবে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে চিহ্নিত করা খুবই কষ্টকর। এখানে কেবল কয়েকটি প্রবন্ধের কথা বলছি—

১২৮৮ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্র নিজে তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক। ঐ 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের নাম ছিল না। নাম না থাকলেও আমার অনুমান ঐ প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা। কারণ—

(১) ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীন হওয়া সত্ত্বেও সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'গৃহ সন্ন্যাস' প্রবন্ধে যেভাবে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা করে বলেছেন—'ভারতবর্ষ অদ্যাপি স্বাধীন। সকল দেশের অপেক্ষা স্বাধীন। ক্ষুদ্রেরা এ কথায় হাসিবে, রাজা দেশী কি বিদেশী এই লইয়া তাহারা স্বাধীনতার মীমাংসা করে।'—তেমনি 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' প্রবন্ধেও দেখছি, এই প্রবন্ধের লেখক বিদেশী রাজার অধীনতাকে দেশের পরাধীনতা না বলে, দেশের আভ্যন্তরীণ দৈনন্দিন ব্যাপারের পরাধীনতাকেই দেশের পরাধীনতা বলেছেন। এই কারণে, 'গৃহ সন্ন্যাস' ও 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' একই লেখকের লেখা বলে মনে হয়।

(২) সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'পালামৌ' প্রবন্ধে তাঁর পালামৌয়ে থাকার অভিজ্ঞতা যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' প্রবন্ধেও দেখছি, এই প্রবন্ধের লেখক এক জায়গায় তাঁর সাতক্ষীরায় অবস্থান কালের কথা উল্লেখ করে, তাঁর সেখানকার একটা অভিজ্ঞতার কাহিনী এই প্রবন্ধে বলেছেন। আমরা আগে দেখেছি, সঞ্জীবচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি হারিয়ে কিছুদিন সাতক্ষীরায় স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন। প্রবন্ধে বর্ণিত সাতক্ষীরার কাহিনীটি সঞ্জীবচন্দ্রের নিজেরই অভিজ্ঞতার কাহিনী বলে মনে হয় এবং সেই সূত্রে মূল প্রবন্ধটিও সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা বলে মনে করি। এখন এই 'বঙ্গদেশের পরাধীনতা' প্রবন্ধটি থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

বঙ্গদেশের পরাধীনতা

পাঠশালায় ছেলেরা শিখিয়াছে যে, সাত শত বৎসর হইল বখ্‌তিয়ার খিলিজির সময় হইতে বঙ্গদেশের পরাধীনতা আরম্ভ হইয়াছে। ছেলেদের বয়স হয়, কিন্তু পাঠশালার কুশিক্ষা তাহাদের অন্তরে থাকিয়া যায়। এখনও আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, বঙ্গদেশের পরাধীনতা বহুদিনের।

পাঠশালার পুস্তক প্রণেতা বাহাদুরগণ দীর্ঘায়ু হউন, সি এস আই হউন, কিন্তু একবার তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, একবার বুঝিবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, বখ্‌তিয়ার খিলিজির সময়ে বাঙ্গলা পরাধীন হয় নাই। কোন মুসলমানের সময়ে বাঙ্গলা পরাধীন হয় নাই। ইংরেজেরা যখন দেওয়ানী লন, তখনও বাঙ্গলা স্বাধীন। তাঁহারা যখন শাসনের ভার নেন, তখনও বাঙ্গলা আপনার খায়, আপনার পরে। তাহার পর কপাল ফাটিয়াছে। সম্প্রতি— এই আমাদের সময় বাঙ্গলা পরাধীন হইয়াছে।

যে ব্যক্তি আপনার অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত অন্যের মুখাপেক্ষী হয়—অন্যের প্রতি নির্ভর করে, সে ব্যক্তি পরাধীন। সেইরূপ যে দেশ অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত বা সাংসারিক কোন সামগ্রীর নিমিত্ত অন্য দেশের প্রতি নির্ভর করে সে দেশও পরাধীন। এখনও আমাদের অন্ন জোটে সত্য, কিন্তু বস্ত্রের নিমিত্ত বঙ্গদেশ পরামুখাপেক্ষী হইয়াছে—ম্যানচেষ্টারের অধীন হইয়াছে।…

বস্ত্র সম্বন্ধে বাঙ্গলার পরাধীনতা ঘটিয়াছে।…লবণ সম্বন্ধে বাঙ্গলা পরাধীন। সহস্র সহস্র বৎসর অবধি বাঙ্গালীরা সমুদ্রের জল হইতে লবণ বাহির করিয়া লইত। সমুদ্র তাহাতে রাগ করিত না। কেহ কথা কহিত না। এখন কথা কহিবার লোক দাঁড়াইয়াছে।

এই সম্বন্ধে সাতক্ষীরা অঞ্চলের একজন দরিদ্র ব্যক্তির গল্প বলি। লেখক সেই সময় সাতক্ষীরায় উপস্থিত ছিলেন। সকল দিন সে ব্যক্তি আপনার বালক-বালিকাদের উদর পুরিয়া অন্ন দিতে পারিত না। যেদিন সে অন্ন-সংগ্রহ করে, সেদিন হয়ত ব্যঞ্জন জুটে না। একদিন দেখিল সন্তানেরা শুধু অন্ন খাইতে পারিতেছে না, অন্ন ক্রোড়ে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছে; একটু লবণ পাইলে তাহারা অন্ন খাইতে পারে, কিন্তু লবণের পয়সা নাই।

সন্তানদের চক্ষের জল মুছাইয়া সে ব্যক্তি বাহির হইল। কলাগাছের কতকগুলা শুষ্ক বাস্‌না সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নি দিল, তাহার ভস্ম এক প্রকার ক্ষারবিশেষ, তাহাই আনিয়া লবণ বলিয়া সন্তানদের দিল। তাহা কতক মৃত্তিকা, কতক ভস্ম, কিন্তু লবণাক্ত। সন্তানেরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইল।

কিছুদিন পরে পুলিশ এ সংবাদ পাইয়া দরিদ্রকে গ্রেপ্তার করিল। সকলে বলিতে লাগিল—আহা! কেন তোর এ বুদ্ধি ঘটিল? কেন তুই কলার বাস্‌না পোড়ালি? কেন তুই লবণ করিলি?

একটি বালিকা ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল—বাবাকে ছেড়ে দাও, আমরা নুণ আর খাব না।

পুলিশ সে ক্রন্দনে কর্ণ দিল না। অপরাধী সাতক্ষীরার মেজেষ্টরীতে, আনিত হইল। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নেমকহারাম নন। তিনি দুঃখীকে শক্ত দণ্ড দিলেন। লবণ ক্রয় করিতে যাহার পয়সা ছিল না, তাহার জরিমানা করিলেন, আবার কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন। কত নিমিত্ত তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই। বালক-বালিকারা লবণ পাইত না, এই হুকুমের পর হয়ত আর তাহারা অন্নও পাইল না।...

[এই বইয়ের ২০ পাতায় বলেছি,—মনে হয়, তখন সাতক্ষীরা বারাসতের অন্তর্গত ছিল।—এখানে এই লেখা পড়ে মনে হচ্ছে, সাতক্ষীরা পৃথক মহকুমা ছিল। অবশ্য সাতক্ষীরা মহকুমা না হলেও, সেকালে মহকুমা শাসকরা যেমন মহকুমার অন্তর্গত বড় শহর বা গঞ্জে গিয়ে ক্যাম্প কোর্ট বসিয়ে বিচার করতেন, তেমনও হতে পারে।]

১২৮৭ সালের পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'চাকুরির পরীক্ষা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের নাম না থাকলেও এটি সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা বলে আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ, প্রথমত, এই প্রবন্ধের এক জায়গায় আছে—'এক্ষণকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটেরা অপেক্ষাকৃত অযোগ্য, অথবা এক্ষণকার উকিলেরা যে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ পুরাতন লোক, এই প্রস্তাবলেখক তাহার মধ্যে একজন।'

প্রস্তাবলেখক বা লেখক তাহার মধ্যে একজন বলে, সঞ্জীবচন্দ্র নিজেরই কথা বলেছেন। কেননা, তিনি নিজেও আগে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং ডেপুটির চাকরির পরীক্ষা নিয়েই তাঁর ঐ চাকরিটি যায়।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখেছি, সঞ্জীবচন্দ্রকে আইনের পরীক্ষায় কম নম্বর দিয়ে ফেল করিয়ে তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি থেকে অপসারিত করা হয়েছিল। এজন্য তাঁর মনে যে ক্ষোভ ছিল, 'চাকরির পরীক্ষা' প্রবন্ধে তাঁর মনের সেই ক্ষোভ কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয়।

তৃতীয়ত, সঞ্জীবচন্দ্র যেমন ঘটনা বা ব্যক্তির উদাহরণ দিয়ে সহজ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতেন, এই প্রবন্ধে তা পুরা মাত্রায় আছে।

চতুর্থত, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের একেবারে শেষ বাক্যে যেমন কোন উপদেশমূলক বা সুচিন্তিত কথা বলে থাকেন, এই প্রবন্ধেও তাই আছে।

পঞ্চমত, সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যবহৃত 'এক্ষণকার' ইত্যাদি কয়েকটা শব্দ যেমন এই প্রবন্ধে রয়েছে, তেমনি এই প্রবন্ধের ভাষার সরলতা, বক্তব্যের স্পষ্টতা, এবং নানা উদাহরণ, সবই সঞ্জীবচন্দ্রের রচনারই অনুরূপ।

এই সকল কারণে, 'চাকরির পরীক্ষা' প্রবন্ধটিকে সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা বলে আমি মনে করি। প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

চাকরির পরীক্ষা

বিবাহ উপলক্ষে যেরূপ কুলপরিচয়ের প্রয়োজন হয়, পূর্বে চাকরি উপলক্ষেও সেইরূপ প্রয়োজন হইত। তৎকালে বিশ্বাস ছিল যে, কর্মদক্ষতা কেবল সৎ-কুলেই সম্ভব; অসৎকুলে দুর্লভ। সে বিশ্বাসের বিশেষ হেতুও ছিল; তৎকালে শিক্ষা কুলগত ছিল, এক্ষণে আর তাহা নাই। এক্ষণে শিক্ষা সকল কুলেই সম্ভব; কার্যদক্ষতাও কাজেই সকল কুলে পাওয়া যাইতে পারে। কাজেই কার্যদক্ষ ব্যক্তি নির্বাচন করা কিছু কঠিন হইয়াছে।

যোগ্য ব্যক্তিকে কার্যে নিযুক্ত করা যে অতি কঠিন তাহা সকলের সংস্কার নাই। সাধারণত বিশ্বাস আছে যে, উপযুক্ত ব্যক্তিরাই কার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা কিঞ্চিৎ বিশেষ জানেন, তাঁহাদের মত স্বতন্ত্র। এই জন্য ইংলণ্ড দেশের একজন প্রধান ব্যক্তি আপনাকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া আপন কর্তব্য কার্যের তালিকায় লিখিয়াছিলেন যে, আমি মন্ত্রী হইয়া কেবল যোগ্য লোককেই রাজকার্যে নিযুক্ত করিব। তিনি জানিতেন যে এইটি বড় সহজ নহে, ইহার নিমিত্ত বিশেষ প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। অযোগ্য ব্যক্তিরা অনুরোধের জয়পতাকা তুলিয়া সর্বদাই সুরক্ষিত দাঁড়াইয়া থাকে। তাহাদের উল্লঙ্ঘন করা অতি কঠিন। এইজন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে কার্যে নিযুক্ত করা হয় না।

ইদানীং বিজ্ঞ রাজ-পুরুষেরা অনুরোধের মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে সহজে নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা। পরীক্ষা এক্ষণে সকল রাজ্যেই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশেও প্রায় ৩২ বৎসর হইল কতকাংশে আরম্ভ হইয়াছে।

পরীক্ষা দিয়া চাকরি করা এক্ষণকার নিয়ম। যাহারা পরীক্ষা দিতে অসমর্থ, অথচ চাকরির লোভ রাখে, কেবল তাহারাই পরীক্ষা বিদ্বেষী হওয়া সম্ভব। তদ্ভিন্ন যদি আর কেহ ইহার বিদ্বেষী থাকেন, তাহা হইলে হেতু অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

উমেদার ব্যতীত সত্যই অনেক লোকে এই নিয়মের বিরোধী দেখা যায়। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, উপযুক্ত কর্মচারী নির্বাচন করিতে গেলে পরীক্ষাই তাহার একমাত্র উপায়। অথচ, আবার চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেন, 'ভাল! পূর্বকালের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা এক্ষণকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরা অযোগ্য কেন? পূর্বেও তাঁহাদের পরীক্ষা ছিল, এক্ষণেও ত সেই পরীক্ষা আছে।' আবার বলেন, 'উকিলদের পরীক্ষা পূর্বে ছিল, এখনও আছে, তবে পূর্বকালের উকিল অপেক্ষা এক্ষণকার উকিলেরা ভাল কেন?'

এ কথার প্রথমেই আপত্তি হইতে পারে যে, এক্ষণকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরা যে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য, অথবা এক্ষণকার উকিলেরা যে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ, পুরাতন লোক, এই প্রস্তাবলেখক তাহার মধ্যে একজন। যাহারা উভয় সময়ের কর্মচারী দেখিয়াছে, তাহাদের প্রমাণ গ্রহণ না করিলে আর প্রমাণ নাই। কিন্তু তাহাদের প্রমাণ যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে পরীক্ষা সত্ত্বেও এক্ষণকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-গণ অযোগ্য। পরীক্ষা সত্ত্বেও যদি এরূপ হয়, তবে পরীক্ষার প্রয়োজন? যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করিবার নিমিত্ত পরীক্ষা যে একমাত্র উপায় অথবা বিশেষ উপায় তাহা মিথ্যা হইল? অন্য দেশে পরীক্ষা দ্বারা যোগ্য লোক নির্বাচন হইতেছে, অন্তত কতকাংশে হইতেছে; কিন্তু আমাদের দেশে তাহার বিপরীত ফল কেন হয় তদন্ত করা আবশ্যক।

পূর্বে যৎকালে আমাদের দেশে উপযুক্ত ব্যক্তি বড় পাওয়া যাইত না, তখন গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; আর এক্ষণে যোগ্য লোক বাঙ্গলার সর্বত্র শত শত পাওয়া যায়; অথচ যোগ্য লোক রাজকার্যে নিযুক্ত হয় না, ইহার হেতু কি? এই কথা লইয়া বাঙ্গালীরা মধ্যে মধ্যে গোপনে আন্দোলন করিয়া থাকেন। অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে ইচ্ছাপূর্বক অনুপযুক্ত লোক নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের মধ্যে একটা কথা রটিয়াছে যে, ডিসরেলি সাহেব যখন ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় একবার তথায় কথা উত্থাপিত হয় যে, ইংলণ্ড হইতে আর

অধিক (covenanted servent) কবনাণ্টেড সারবাণ্ট পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। এই সনদি সাহেবদের বেতনে ভারতবর্ষের অনর্থক অনেক অর্থব্যয় হইতেছে। বিশেষত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে যেরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়. এক্ষণে অনায়াসে অধিকাংশ কার্য তাহাদের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। ডিসরেলি সাহেব তাহাতে ভাবিলেন, সনদি চাকরেরা বেতন দ্বারা ভারতের অনেক টাকা ইংলণ্ডে আনিতেছে। তাহাদের সংখ্যা কম হইলে ইংলণ্ডের অর্থাগম কম হইবে। অতএব এই আশঙ্কায় ডিসরেলি সাহেব গোপনে নিষেধ করেন যে, আর যেন বিশেষ উপযুক্ত বাঙ্গালীকে উচ্চপদ না দেওয়া হয়; তবে এখানে সেখানে দুই একটি ভাল লোককে কর্ম দিলে ক্ষতি নাই, বরং না দিলে নিন্দা হইবে।

অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী মহলে এরূপ অমূলক কথা রটিবে তাহার আর আশ্চর্য কি? নিত্য যাহা হয়, তাহার সামান্য ব্যতিক্রম দেখিলে যে-বাঙ্গালীরা দেবতা-দের দোষারোপ করে, সে বাঙ্গালী লোক-নির্বাচন সম্বন্ধে সামান্য ব্যতিক্রম দেখিলে যে ডিসরেলি সাহেবকে বা ইংরেজ রাজ শাসনকে দোষারোপ করিবে, ইহার আর আশ্চর্য কি? রাজমন্ত্রীর গোপন অনুমতি সম্বন্ধে তাঁহাদের এতদূর বিশ্বাস যে তাঁহারা অনায়াসে বলিয়া থাকেন—যদি গোপন নিষেধ না থাকিবে, তবে ব্যবসাদারেরা বা জমিদারগণ যে শ্রেণীর লোকদের কুড়ি কি পঁচিশ টাকায় চাকর রাখেন, এক্ষণে সেই শ্রেণীর লোকদের গবর্ণমেণ্ট চারিশত পাঁচশত বেতন দিয়া কেন রাখিতেছেন।

আমরা স্বীকার করি ঐ শ্রেণীর লোক এক্ষণে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে অনেক দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার হেতু গবর্ণমেণ্টের কোন কু-অভিসন্ধি নহে। গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ হইয়া কেবল পরীক্ষা দ্বারা সেই সকল লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। যদি তাহাতে অনুপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া থাকে, তবে সে দোষ পরীক্ষার। তাহার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

যোগ্য লোক নির্বাচনের জন্য পরীক্ষাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায় সন্দেহ নাই, কিন্তু উপযোগী পরীক্ষা এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। এই জন্য ভুল হইতেছে এবং অনেক দিন পর্যন্ত এ ভুল চলিবে।

যখন গ্রে সাহেব গবর্ণর ছিলেন, তখন এই নিয়ম করা হয় যে, পরীক্ষা করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করিতে হইবে। নিযুক্ত করিয়া আবার তাহাদের পরীক্ষা লইতে হইবে। পূর্বে এ প্রথা ছিল না, নিযুক্ত হইবার পূর্বে

আর কোন পরীক্ষা হইত না। গ্রে সাহেব তাহা প্রথম করিলেন। করিয়া ভাবিলেন, আর অযোগ্য লোক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। নিযুক্তের পূর্বে পরীক্ষা, নিযুক্তের পরে পরীক্ষা শুনিলে তাহাই আপাততঃ বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গ্রে সাহেবের সময় হইতেই আরও বিশেষরূপে অযোগ্য ও সামান্য লোক নিযুক্ত হইতে আরম্ভ হইল। গ্রে সাহেব বোধ হয় ভাবিয়া ছিলেন যে, যাহারা সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব, যাহারা অনায়াসেই সুপারিশের যোগাড় করিতে পারে, সচরাচর তাহারাই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া থাকে। তাহারা অযোগ্য হইলেও ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যাহাদের বংশ-গৌরব নাই, অথচ যোগ্য ব্যক্তি তাহারা এ পদ প্রায় পায় না। অতএব এ কু-প্রথার পথরোধ করিবার নিমিত্ত গবর্ণর সাহেব সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিলেন যে, যে কেহ ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্বাহ্নে নিয়মিত একটি পরীক্ষা দিয়া আপনার নাম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি রেজেষ্টরীতে লিখাইতে পারেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি কেবল সেই পরীক্ষোত্তীর্ণদের দেওয়া যাইবে। বলা আবশ্যক যে, পরীক্ষাটি বড় কঠিন নহে। একটু ইংরেজি, একটু অঙ্কশাস্ত্র, একটু ইতিহাস এই লইয়া সেই পরীক্ষা। আমাদের দেশে বালকেরা স্কুলে সচরাচর যাহা অধ্যয়ন করে কেবল সেই সম্বন্ধে এই পরীক্ষা। সরলচেতা গ্রে সাহেব এই নিয়ম বদ্ধ করিলে সামান্য কেরাণী, গ্রাম্য স্কুল মাষ্টারগণ নাচিয়া উঠিল। তাহারা আপনাদের অযোগ্যতা জানিত, তাহারা কস্মিনকালে হেড কেরাণী বা হেড মাষ্টার হইবার প্রত্যাশা করিত না। এক্ষণে তাহাদের কপাল খুলিল। অনায়াসে পরীক্ষা দিয়া তাহারা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে লাগিল। কেহ কেহ রহস্য করিয়া এই সকল ডেপুটিদের 'গ্রের গাধা' বলিয়া থাকেন। গ্রে সাহেব আপনার ভুল শেষ বুঝিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই সেই পরীক্ষা বন্ধ করিয়াছিলেন। গ্রের সকল ডেপুটিই গাধা নহেন, গুণবান লোক অনেকে আছেন সন্দেহ নাই।

গ্রে সাহেবের পর ক্যাম্বল সাহেব গবর্ণর হইলেন। তিনি জানিতেন বাঙ্গালীরা শিক্ষাদোষে দুর্বল। এতএব ব্যায়াম শিক্ষার উৎসাহ দিবার নিমিত্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ বলিষ্ঠের পারিতোষিক স্থির করিলেন। তাহাদের প্রথমত কার্যপ্রণালী শিক্ষার নিমিত্ত সব্ ডেপুটি পদ নূতন সৃষ্টি করিলেন। যাহারা অশ্বারোহণে, সন্তরণে, পদসঞ্চালনে বিলক্ষণ পটু তাহারাই সব্‌ ডেপুটি হইবার অধিকারী হইল। এই পদের নিমিত্ত সামান্যতম জরিপ জমাবন্দি আর

একটু আইন জানিলেই হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। ক্যাম্বল সাহেবের বিজ্ঞাপন প্রচার হইলে আবার গ্রাম্য স্কুল মাষ্টারদিগের মধ্যে উৎসাহ পড়িয়া গেল। কেরাণী ও মুহুরিদলের সুবিধার জন্য গবর্ণর সাহেব হুকুম দিলেন যে, তাহারা জরিপ জমাবন্দি প্রভৃতি শিক্ষা করিবার নিমিত্ত ছুটি চাহিলে অনায়াসে ছুটি পাইবে। সুবিধার আর সীমা রহিল না। সেই সকল মুহুরি, কেরাণী, গ্রাম্যশিক্ষক প্রথমে সব্ ডেপুটি হইয়া এক্ষণে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। ক্যাম্বল সাহেব হস্ত পদের গুণ পরীক্ষা করিয়া তাহাদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইজন্য কেহ কেহ রহস্য করিয়া তাহাদের 'ক্যাম্বেলি উট' (Campbell's camel) বলেন।

কিরূপে অযোগ্য ও সামান্য ব্যক্তিরা ইদানীং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি পদ লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা বোধ হয়, এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্বারা অনায়াসে অনুভব হইতে পারিবে। ইংরেজ কর্মচারী এদেশে প্রয়োজন ইহা বিলাতে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অযোগ্য বাঙ্গালীকে উচ্চপদে আসীন করা হয় নাই। পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের নিযুক্ত করা হইয়াছে, যদি তাহাতে অযোগ্য ব্যক্তির পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সে দোষ পরীক্ষার।

পরীক্ষার দোষ গুণ দুই আছে। পরীক্ষার গুণ আছে বলিয়া সকল দেশেই পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। পরীক্ষা থাকিলে অনুরোধের বল হ্রাস হইয়া যায়। এক্ষণে বিনা পরীক্ষায় কেবল অনুরোধের বলে আর কেহ মুন্সেফ হইতে পারেন না। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটিতে অদ্যাপি সে নিয়ম বলবৎ হয় নাই, হইবারও বিলম্ব আছে। তথাপি কথঞ্চিৎ সে নিয়ম গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেবের সময়ে হইয়াছিল। একবার তিনি একজন জজ সাহেব কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমি একেবারে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি দিতে পারি না, তিনি উপযুক্ত হইলে অনায়াসে নেটিব সিভিল সার্বিসের অর্থাৎ সব্ ডেপুটির পরীক্ষা দিতে পারিবেন। তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অনায়াসে হইতে পারিবেন।

পরীক্ষার প্রথা ছিল বলিয়া ক্যাম্বেল সাহেব অনুরোধে উপেক্ষা করিতে পারিয়া ছিলেন। পরীক্ষার অকাট্য নিয়ম থাকিলে কেহ অনুরোধ করিতে আইসে না। কাজেই উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার বাধা কমিয়া যায়।

পরীক্ষা সঙ্গত ও শ্রেয় বলিয়া সর্বত্রে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

প্রকৃত পরীক্ষা হইলে তাহাই বটে, কিন্তু যে প্রণালীতে আমাদের দেশে পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রায় অসঙ্গত। যে কার্যে যে গুণ আবশ্যক তাহা উমেদারের আছে কি না নির্ধারণ করাই পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে স্থির করা চাই যে, কোন্ পদের নিমিত্ত কি কি গুণ আবশ্যক। পূর্বাহ্নে তাহা স্থির করিয়া পরীক্ষা করিলে সেই পরীক্ষা সার্থক হয়। নতুবা আমাদের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ পরীক্ষা করেন, সেইরূপ পরীক্ষা অনর্থক। যদি নিয়ম করা যায় যে, বলিষ্ঠ পদ দেখিয়া 'ডাক রনার' নিযুক্ত করা হইবে, তাহা হইলে সঙ্গত হয়। কিন্তু যদি বলা যায়, বলিষ্ঠপদ দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটি দেওয়া যাইবে, তাহা হইলে কে না উপহাস করে? বলিষ্ঠপদ মনুষ্য মাত্রেরই প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটি কার্যের নিমিত্ত যে তাহা বিশেষ আবশ্যক ইহা কেহ প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে কে তাহাতে কর্ণপাত করে?

গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা লোকে পরীক্ষক ভাল, অনেককে গবর্ণমেণ্ট উকিলির ছাপ দিয়া ছাড়িয়া দেন। তাহার পর লোকে তাঁহাদের বাছনি করে। গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষায় তাঁহারা সকলেই যোগ্য; লোকের পরীক্ষায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অযোগ্য। তাহাই তাঁহাদের অবস্থার তারতম্য। উকিলদের আইনজ্ঞ হওয়া উচিত সত্য, কিন্তু তদ্ভিন্ন তাঁহাদের আর গুটিকতক গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা না থাকিলে কেবল আইন জানা বৃথা হয়। গবর্ণমেণ্ট সেই গুণগুলির পরীক্ষা একেবারে করেন না। কাজেই দেখা যায়, আইনের পরীক্ষা দিয়া যোগ্যতার সার্টিফিকেট হাসিল করিয়াও অনেক উকিল অযোগ্য বলিয়া আদালতে প্রায় অগ্রাহ্য হইয়া থাকেন। কাজেই বলিতে হইবে, এক্ষণে উকিলের যে পরীক্ষা আছে, তাহা অসম্পূর্ণ।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সম্বন্ধেও সেইরূপ। তাহাদেরও কেবল আইনের পরীক্ষা হইয়া থাকে। কিন্তু সকলেই নিত্য দেখিতে পান যে, কেবল আইন জানিলেই ম্যাজিষ্ট্রেটি ভাল হয় না। আইনজ্ঞ মাত্রেই যদি ভাল ম্যাজিষ্ট্রেট হইত, তাহা হইলে পরীক্ষোত্তীর্ণ ম্যাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে আর তারতম্য থাকিত না। সকলেই ভাল ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় পরীক্ষোত্তীর্ণদের মধ্যে অনেকে অযোগ্য আছেন।

বিচারকদিগের পক্ষে আইন জানার আবশ্যকতা আছে সত্য, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কেবল বিচারক নহেন, তাঁহাদের অন্য কার্যের নিমিত্ত অণ্য গুণ আবশ্যক। কেবল আইনের পরীক্ষায় সে সকল গুণের পরীক্ষা হয় না।

বিশেষত আইনের নিত্য পরিবর্তন হয়। এক সময় গুটিকতক আইনের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিলে, ভবিষ্যৎ আইন সম্বন্ধেও পরীক্ষা হইয়া রহিল, এ কথা বলা অসঙ্গত। তবে বড় জোর এই মাত্র বলা যায় যে, একবার যে ব্যক্তি উদ্যোগ করিয়া আইনের পরীক্ষা দিতে পারিয়াছেন, তিনি উদ্যোগী পুরুষ। তাঁহার স্মরণশক্তিও আছে।

কিন্তু উদ্যোগ আর স্মরণশক্তি এই দুই থাকিলেই লোকে বিচারাসনে বসিবার যোগ্য হয় এমত নহে। বিচারপতিদের নানা গুণ আবশ্যক, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটিও পরীক্ষা করেন না, বোধ হয় করিতেও পারেন না। অপক্ষপাতিতা বিচারপতির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। এক্ষণে তাহার কোন পরীক্ষা নাই। এইরূপ শত শত বিষয়ের কোনটিরই পরীক্ষা হয় না। কেবল আইনের পরীক্ষা হয়। অধিক কি যেটি সর্বপ্রধান সেই চরিত্রের পরীক্ষাই নাই। তাহাই বলিতে ছিলাম, গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষা অতি অসম্পূর্ণ। একজন বিচারপতি মধ্যে মধ্যে কোর্ট ফি গোপনে আত্মসাৎ করিতেন, হঠাৎ ধরা না পড়িলে তিনি অদ্যাপি বিচারপতির উচ্চ আসনে আসীন থাকিতেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বিচারপতির পদ দিয়াছিলেন, কাজেই লোকে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য; না করিলে গবর্ণমেণ্টকে অবমাননা করা হয়। এ অবস্থায় সচ্চরিত্র দেখিয়া বিচারপতি করা গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য, তাহা না করিলে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ত্রুটি। যোগ্য-অযোগ্য বিচার না করিয়া রাজপ্রতিনিধিরা চাকরি বিতরণ করেন। তাঁহারা সেলামের উপর সেলাম লইয়া চলিয়া যান। কিন্তু পশ্চাতে কণ্টক রাখিয়া যান। সে কণ্টক সমাজের অঙ্গে বিদ্ধ হয়, তাহাতে বিদেশী গবর্ণমেণ্টের অখ্যাতি জন্মে।

চরিত্রের পরীক্ষা করা অতি কঠিন। সদ্বংশজাত হইলে সচ্চরিত্র হয়, ইহা পূর্বের বিশ্বাস, অদ্যাপিও সে বিশ্বাস কতকাংশে আছে। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট পূর্বে বংশ অনুসন্ধান করিতেন। শুনা যায়, এক্ষণেও তাহা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার ফল বড় দেখা যায় না। ইতর বংশসম্ভূত অনেক লোক এক্ষণে উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতেছে। বস্তুত তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; যদি কর্মচারী নিজে পবিত্র হন, তবে পূর্বপুরুষ অপবিত্র বলিয়া কি হানি? কিন্তু পদাকাঙ্ক্ষী নিজে পবিত্র কিনা ইহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা আমরা জানি না। অনেকের ধারণা যে, এই অনুসন্ধান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোন উপায়ই নাই। তাহা সম্ভব। আমরা

শুনিয়াছিলাম যে, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি পদাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট একবার একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুসন্ধান করিতে একখানি 'ডিমি অফিসিয়াল' পত্র লিখিয়াছিলেন! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সে ব্যক্তিকে নিজে· চেনেন না; অতএব উমেদারের নিবাস যে অঞ্চলে তথাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেইরূপ এক পত্র লেখেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর নূতন আসিয়াছেন, কাহাকেও জানিতেন না। কাজেই তিনি থানার সব্ ইন্সপেকটরকে লিখিলেন। সব ইন্সপেকটর যথা নিয়মে তলবি পরওয়ানা পাঠাইলেন। পরওয়ানা হস্তে দুইজন কনেষ্টবল উমেদারের বাটী আসিয়া দাঁড়াইলে বাবুর চক্ষু স্থির হইল। কনেষ্টবলদের সঙ্গে অগত্যা তাঁহাকে আসামির ন্যায় যাইতে হইল। তাঁহার অন্দর মহলে কান্না উঠিল, পাড়ার লোকেরাও 'আহা' বলিয়া বিপদের সময় যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। শেষ উমেদারবাবু দারোগাবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার এজাহার লইতে আরম্ভ করিলেন। নাম, ধাম, পিতার নাম, জাতি, পেশা, বিষয় সম্পত্তি, কি বিদ্যা, কত বিদ্যা, কেমন চরিত্র আনুপূর্বিক সকল প্রশ্ন করিয়া শেষ যথানিয়মে রোয়দাদে লিখিলেন যে, এ ব্যক্তি সচ্চরিত্র ও ভদ্রবংশ বটে। ইহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট দেওয়া যাইতে পারে।

এ কথা যদি সত্য হয়, তবে রহস্যের বিষয় বটে, কিন্তু আক্ষেপও হয়। চরিত্রের পরীক্ষা অতি কঠিন, কোন রাজ্যেও তাহা সুসম্পন্ন হয় না। ইংলণ্ড হইতে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া যে সকল সনদি সাহেবকে এদেশে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট পদের নিমিত্ত পাঠান হইতেছে, তাঁহাদেরও চরিত্র পরীক্ষা হয় না। যে স্থলে চরিত্র পরীক্ষার কোন উপায় নাই, সেখানে বোধ হয় সকল লোকই সচ্চরিত্র, সত্যবাদী এবং সদাশয় বলিয়া অনুভব করিয়া লইতে হয়। যতক্ষণ তাহার অন্যথা স্পষ্ট না দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ এ অনুভব ভিন্ন আর উপায় নাই।

আমরা এ পর্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহার সংক্ষেপ এই যে, অনুরোধে 'চাকরি' দেওয়া অপেক্ষা পরীক্ষা করিয়া চাকরি দেওয়া ভাল। কিন্তু প্রকৃত পরীক্ষা আবশ্যক। যে পরীক্ষা এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট করিয়া থাকেন, তাহা অসম্পূর্ণ।

আমাদের আর একটু বলিতে ইচ্ছা যে, অযোগ্য ব্যক্তি রাজকার্যে নিযুক্ত হইলে যে ক্ষতি, তাহা গবর্ণর সাহেব বা কমিশনর সাহেবের নহে। ক্ষতি সমাজের।

['ভ্রমরে'র প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যায় অর্থাৎ ১২৮১ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'নিদ্রা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির সঙ্গে লেখক হিসাবে কারও নাম না থাকলেও, এটি সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা বলে আমার বিশ্বাস।

এখানে আগে সঞ্জীবচন্দ্রের ঐ 'নিদ্রা' প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করছি। তারপর কেন এটিকে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে বিশ্বাস করি, সে সম্বন্ধে কিছু বলছি—

নিদ্রা

আলেকজণ্ডর বেন বলেন, আমাদিগের যতগুলি শারীরিক বৃত্তি আছে, তন্মধ্যে নিদ্রা সর্বাপেক্ষা বলবতী। ইহার অর্থ আমরা ইহাই বুঝি যে, অন্যান্য শারীরিক বৃত্তিগণের চরিতার্থতা সাধন করা না করা, আমাদিগের ক্ষমতাধীন। আমরা ইচ্ছা করিলে, ক্ষুধা নিবারণ না করিলে না করিতে পারি; তৃষ্ণা পাইলে জল না খাইয়া থাকিতে পারি; তাহাতে কষ্ট হইবে, পীড়া হইবে, শেষে মৃত্যু হইবে, তথাপি সাধ্য বটে। কিন্তু নিদ্রাকর্ষণের পর ইচ্ছা করিলে জাগ্রত থাকিতে পারি না। অনেক যত্ন করিলেও আপন অজ্ঞাতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িব। নিদ্রা বোধ হয়, একাই অনিবার্য।

কিন্তু একথা নিশ্চিত বলা যায় না। চীনদেশে এক প্রকার অসাধারণ রাজদণ্ড প্রচলিত ছিল বা আছে—নিদ্রাহানির দ্বারা অপরাধীকে বধ করা। ১৮৫ সালে আময় নগরে একজন বণিক আপনার স্ত্রীকে বধ করিয়াছিল বলিয়া তাহার প্রতি এই ভীষণ দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল। দণ্ডসাধন জন্য তাহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হইল। সেখানে তিনজন প্রহরী নিযুক্ত হইল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রহরী বদল হইত; তাহাদিগের কার্য অপরাধীর নিদ্রার বিঘ্ন করা। তাহারা পর্যায়ক্রমে দিবারাত্র উপস্থিত থাকিয়া বন্দীকে এক পলক জন্য ঘুমাইতে দিল না। অষ্টম দিবসে কয়েদীর যন্ত্রণা এমন ভয়ানক হইয়া উঠিল যে, সে অনেক অনুনয় করিয়া প্রার্থনা করিল যে, আমাকে গলা চাপিয়া বধ কর। —প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল।

স্মী সাহেব বলেন যে, আমরা কিয়দংশে ইচ্ছাপূর্বক নিদ্রা আনিতে সক্ষম। আমরা হৃৎপিণ্ডের গতি মন্দীভূত এবং শারীরিক তাপ শান্ত করিয়া দিই,

তাহা হইলেই নিদ্রা আইসে। শৈত্যের ফল যে নিদ্রা ইহা অনেকেই জানেন। যাঁহারা শীতপ্রধান দেশে রাত্রে বরফে পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, সে অবস্থায় অনিবার্য নিদ্রার আবেশ হয়। সেই নিদ্রায় অভিভূত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। যাঁহারা অনিদ্রায় কষ্ট পান, তাঁহারা শীতল জল অঙ্গে সেচন করিয়া দেখিয়াছেন যে, আশু অনিদ্রা দূর হয়। যাঁহাদের কোন ঔষধে অনিদ্রা দূর হয় নাই, মূর্দ্ধা প্রদেশে শীতল জল ব্যবহারে শীঘ্রই তাঁহাদের নিদ্রা হইয়াছে।

কিন্তু ঘুম আনিবার আরও কতকগুলি কৌতুকাবহ কৌশল আছে। স্মী সাহেব বলেন—উত্তর শিয়রে শয়ন করিলে অনিদ্রা দূর হয়। পশ্চিম শিয়রে শুইলে নিদ্রার বিঘ্ন ঘটে। পার্থিব চৌম্বকাকর্ষণ কি ইহার কারণ?

'মেস্মেরাইস' করিলে ঘুম আইসে কেন? কেহ কেহ বলেন. নিদ্রা আসিবে এই বিশ্বাস, এবং নিদ্রার প্রত্যাশায় ভিন্ন অন্য বিষয় হইতে মনের বিরতি। নিদ্রার প্রত্যাশায় অনন্যমনা হইয়া স্থির থাকিলে নিদ্রা আসে একথা সত্য বটে। অনেক সময়েই এই উপায়াবলম্বন করিয়া আমরা সুসুপ্ত হই।

নিদ্রিতাবস্থায় সচরাচর অন্তরিন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয় উভয়েই ক্রিয়াশূন্য থাকে। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম সর্বদা ঘটে। কখন বা অন্তরিন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট, বহিরিন্দ্রিয় সচেষ্ট, কখন বা বহিরিন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট, অন্তরিন্দ্রিয় সচেষ্ট দেখা যায়। নিদ্রিতাবস্থায় যে কেহ কেহ উঠিয়া বেড়ায়, কথা কয়, দন্তপেষণ করে, ইহা সকলেই জানেন। অন্তরিন্দ্রিয়ের সুসুপ্তিকালে, বহিরিন্দ্রেয়ের সচেষ্টতার ইহা উদাহরণ। বহিরিন্দ্রিয়ের সুসুপ্তিকালে, মন যে কার্যতৎপর থাকে, স্বপ্ন তাহার উদাহরণ স্বরূপ সচরাচর নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। স্বপ্নতত্ত্বের বৃত্তান্ত অতি কৌতুকাবহ; কিন্তু সচরাচর আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে তদ্বিবরণ সবিস্তারে পাওয়া যায়। এজন্য আমরা সে সকল কথার কোন উল্লেখ করিতে চাহি না। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় যে মানসিক বা শারীরিক কার্য, সে সকল অপ্রকৃত। চক্ষু দেখিতেছে না, অথচ বোধ হইতেছে যে দেখিতেছে; কর্ণ শুনিতেছে না, অথচ বোধ হইতেছে যে শুনিতেছে, ইত্যাদি। স্বপ্ন ভিন্ন আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার আছে—নিদ্রিতাবস্থায় মনের প্রকৃত এবং স্বাভাবিক কার্য সকল নির্বাহিত হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি নিদ্রিতাবস্থাতেও জাগ্রতের ন্যায় নানা বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন। বর্তমান লেখকও অনেক সময়ে নিদ্রিতাবস্থাতেও এইরূপ চিন্তাক্ষম হইয়াছেন। তখন, চক্ষু দেখিতে অক্ষম, কর্ণ শুনিতে পায় না, স্পর্শ অনুভূত হয় না, কোন অঙ্গ চালনা করা যায় না, অথচ বেশ জানিতে

পারা যাইতেছে যে, আমি ঘুমাই নাই, এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে চিন্তা করিতেছি।

এখানে কেবল মনই সচেষ্ট; কিন্তু কখন কখন নিদ্রাকালে মন এবং কতকগুলি বহিরিন্দ্রিয়ও সচেষ্ট থাকে—তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিদ্রিত। আমরা জানি একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে লিখিতে কখন কখন তন্দ্রাভিভূত হয়েন; তখন তিনি স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যান। কিন্তু পূর্বে যেরূপ জবানবন্দী লিখিতেছিলেন, সেইরূপ লিখিতে থাকেন, প্রায় কোন ভুল হয় না।

সর্ উইলিয়ম হামিলটন, একজন ডাকের হরকরার কথা লিখিয়াছেন, সেও মন্দ ব্যাপার নহে। ডাকের পুলিন্দা লইয়া সে প্রত্যহ চারি ক্রোশ যাতায়াত করিত। মধ্যে একটা মাঠ—পথ নির্বিঘ্ন। মাঠ পারে একটি নদীর উপর অতি অপ্রশস্ত একটি সেতু ছিল। গোটা কত ভাঙ্গা ধাপে উঠিয়া সেই সেতুতে উঠিতে হইত। বিশেষ অনুসন্ধান ও প্রমাণের দ্বারা স্থির হইয়াছিল যে, ডাকের হরকরা যতক্ষণ ঐ মাঠ পার হইত ততক্ষণ সে ঘুমাইত; গমন নিদ্রিতাবস্থাতেই হইত। এই নিদ্রিতাবস্থাতেও সে কখন পথ ভুলিত না, ঠিক সেতুর দিকে যাইত। আর সেই ভাঙ্গা ধাপের কাছে গিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইত।

আমরাও শুনিয়াছি যে, বহরমপুরে কোন আদালতে একজন আমলা ছিলেন, তিনিও এইরূপ নিদ্রায় পটু। তিনি আহারান্তে আপিসে যাত্রা করিতেন। রাস্তায় পদার্পণ করার পরেই তাঁহার নিদ্রারম্ভ হইত। কাছারির নিকট তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। কিন্তু এ বিষয়ের সত্যতা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

ইরাস্মসের পত্রাবলীতে নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি পাওয়া যায়—অপোরিনস নামে একজন তাঁহার বিদ্বান বন্ধু ছিলেন। উভয়ে একদা এক পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। একখানি পুস্তক সম্বন্ধে উভয়ের কৌতূহল ছিল, সেখানি অপোরিনসের সঙ্গে থাকায় তিনি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইরাস্মস একটি শব্দ বুঝিতে পারিলেন না—তিনি তদ্বিষয়ে অপোরিনসকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর না পাওয়ায়, প্রশ্ন করিতে করিতে জানিতে পারিলেন যে, অপোরিনস নিদ্রিত। নিদ্রিতাবস্থাতেই গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। ইরাস্মস তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। তখন অপোরিনস দেখিলেন যে, তিনি কি পাঠ করিয়াছেন তাহার কিছু মাত্র মনে নাই। আমরা যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা বলিয়াছি, অপোরিনস্ তাঁহারই দোসর।

অতএব নিদ্রা সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা নিশ্চিত বোধ হয়—

১। নিদ্রাকালে সচরাচর সর্বাঙ্গ ও মন নিশ্চেষ্ট হয়। ইহাই সম্পূর্ণ নিদ্রা।

২। কখনও কেবল সর্বাঙ্গ নিদ্রিত হয়, মন জাগ্রত থাকে।

৩। কখন কোন কোন অঙ্গ নিদ্রিত, কোন কোন অঙ্গ জাগ্রত থাকে।

৪। নিদ্রিতাবস্থায় মন জাগ্রত থাকিলেও মনের সকল শক্তি জাগ্রত থাকে না। নিদ্রিতাবস্থায় যাহা লেখা যায় বা পড়া যায়, নিদ্রাভঙ্গের পর তাহার কিছুই মনে থাকে না।

৫। কোন কোন অঙ্গ অগ্রে, কোন কোন অঙ্গ পরে নিদ্রিত হয়। দেখা যায়, সচরাচর সর্বাগ্রে চক্ষু মুদ্রিত হয়।

[এবার কেন এই 'নিদ্রা' প্রবন্ধকে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে আমার বিশ্বাস, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—

১। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে বক্তব্যকে জোরালো ও বিশ্বাস্য করবার জন্য অনেক সময় নিজের জীবনের ঘটনাকেও উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করতেন। যেমন—

(ক) 'যাত্রা সমালোচনা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—একবার সুশিক্ষিত মার্জিতরুচি অনেকগুলি যুবাবাবু যাত্রাকর হইয়াছিলেন…আমরা আহ্লাদিত চিত্তে তাহা দেখিতে গেলাম।

(খ) 'বৈজিকতত্ত্ব' প্রবন্ধে লিখেছেন—'অনেক দিন হইল একবার আমরা কোন চিকিৎসকের গৃহে উপস্থিত ছিলাম।…'

আবার—'উপস্থিত প্রস্তাব লেখকের বংশে এই নিয়মটির যথেষ্ট প্রমাণ আছে, লেখকের পিতা পঁচাশী বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন।…'

(গ) 'পালামৌ'য়ে তো আছেই।

এই 'নিদ্রা' প্রবন্ধেও দেখছি এক জায়গায় আছে—'বর্তমান লেখকও অনেক সময়ে নিদ্রিতাবস্থাতেও এইরূপ চিন্তাক্ষম হইয়াছেন।'

২। নিদ্রা প্রবন্ধে আছে—'আমরা জানি একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে লিখিতে কখন কখন তন্দ্রাভিভূত হয়েন।' সঞ্জীবচন্দ্র নিজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তাই এটা তাঁরই নিজের জানা কাহিনী বলেছেন, বলে মনে হয়।

৩। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধকে প্রামাণ্য ও তথ্য সমৃদ্ধ করবার জন্য যেমন দেশ বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের লেখা উদ্ধৃত করতেন, এই 'নিদ্রা' প্রবন্ধেও তা আছে।

৪। আমরা জানি, সঞ্জীবচন্দ্র বিভিন্ন দেশের সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি পাঠ করতেন এবং অনেক সময় তাঁর সেই অধীত বিদ্যাকে তাঁর প্রবন্ধে প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করতেন। 'নিদ্রা' প্রবন্ধেও এইরূপ দেশ-বিদেশের কাহিনী রয়েছে।

সঞ্জীবচন্দ্র নিজের প্রবন্ধে যে প্রয়োজন মত দেশ-বিদেশের কাহিনী বলতেন, তার উদাহরণ হিসাবে এখানে তাঁর 'সংকার' প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

সংকার

এক্ষণে এদেশে মৃত্যুর পরই দেহের সংকার করা হয়। যে কিছু বিলম্ব হয় তাহা কেবল কাষ্ঠ প্রভৃতি আবশ্যকীয় উপকরণ আহরণ করিবার নিমিত্ত। কিন্তু পূর্বে এরূপ ছিল না। শাস্ত্রে বিধি আছে মৃত্যুর পর অন্যূন দ্বাদশ দণ্ড পর্যন্ত দেহ রাখিতে হইবে। এই বিধির কোন বিশেষ যুক্তি ছিল, এক্ষণে তাহা আমরা সকলে জানি না এবং তাহার অনুসন্ধানও করি না। কিন্তু এক্ষণে সেই যুক্তি ইউরোপে আদরিত হইয়াছে।

মৃত্যুর অব্যহিত পরেই দেহের সংকার না হয়—এইরূপ একটি আইন করিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর হইল একবার ফরাসীদিগের ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব হয়। তাহাতে অনেকে বলেন যে, এই সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত আইন করিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। তদুত্তরে সভাস্থ একজন বৃদ্ধ বলিলেন যে, এইরূপ আইন সর্বদেশে আবশ্যক. তাহা প্রতীতি করিবার নিমিত্ত একটি অদ্ভুত ঘটনার পরিচয় দিই, আপনারা একটু মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন। অন্যূন পঁচিশ বৎসর হইল কোন যুবা পাদরী একদিন একটি গির্জায় ধর্ম উপদেশ দিতে ছিলেন, বিস্তর লোক সমবেত হইয়া একাগ্রচিত্তে তাহা শুনিতে ছিল। এমত সময়ে হঠাৎ পাদরির হাত হইতে বাইবেল পড়িয়া গেল; এবং সেই মুহূর্তে পাদরি স্বয়ংও পড়িয়া গেলেন। নিকটস্থ লোকেরা ছুটিয়া আসিয়া দেখে পাদরির সংজ্ঞা নাই। পাদারির মৃত্যু হইয়াছে। তখন সকলে আর কি করে, সে দেহ ধরাধরি করিয়া পাদরির বাটিতে লইয়া গেল এবং গোর দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইত্যবকাশে ডাক্তার সাহেব আসিলেন। আসিয়া

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া মৃত্যুর কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারিলেন না; শেষে বলিলেন, 'শব আর শয্যায় ফেলিয়া রাখা বৃথা, সমাধিস্থানে লইয়া যাও।' তদনুসারে গোর দিবার বাক্স খাটের নিকট আনীত হইল। তাহার পর যখন বাক্সে শব তুলিবার উদ্যোগ আরম্ভ হইল তখন একজন বলিল, 'এখন এইরূপ থাকুক, পাদরির সহোদরকে সংবাদ দেওয়া গিয়াছে। তিনি আসিয়া অবশ্য সহোদরের দেহ একবার দেখিতে চাহিবেন।' এই কথায় সকলে নিরস্ত হইল এবং অনেকে স্ব স্ব কার্যে চলিয়া গেল।

পাদরির সহোদর প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে কোন গ্রামে থাকিতেন। সংবাদ পাইবামাত্র অশ্বারোহণে বায়ুবেগে আসিয়া পাদরির গৃহে প্রবেশ করিলেন। সহোদরের শব দেখিয়া অতি কাতর স্বরে, 'ভাই আমার' বলিয়া মৃত দেহ জড়াইয়া ধরিলেন। মৃতদেহ যেন অল্প হস্ত নাড়িল, পরক্ষণেই মৃতদেহ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সহোদরের সহিত কথা কহিতে লাগিল।

পুনর্জীবিত হইয়া পাদরি তখন সহোদরকে বলিতে লাগিলেন, 'ভাই আমি মরি নাই, আমার কেবল শরীর অবশ হইয়াছিল মাত্র। আমি অজ্ঞানও হই নাই, যে যাহা বলিতেছিল, তাহা সমুদয় শুনিতে ছিলাম। আমায় যখন সকলে ঘরে আনিল তাহাও জানি, তোমায় যখন সংবাদ দিবার নিমিত্ত লোক গেল তাহাও জানি, ডাক্তার আসিয়া যাহা বলিলেন তাহাও শুনিয়াছিলাম, যখন বাক্সে আমায় বন্ধ করিবার নিমিত্ত বাক্স আনিল, তখন আমার বড় কষ্ট হইয়াছিল, তাহারা জানে না যে আমি মরি নাই, আমিও তাহাদিগকে আমার জীবিত অবস্থা জানাইতে পারিতেছি না, অথচ দেখিতেছিলাম তাহারা আমাকে বাক্সে বন্ধ করিতে আসিতেছে। আমি না মরিয়াও মরিতে চলিলাম ভাবিয়া সে সময়ে যে কি কষ্ট হইয়াছিল, তাহা কি জানাইব! তখন হস্তপদ নাড়িতে এত চেষ্টা করিলাম, কোন মতেই পারিলাম না। এই সময় তোমার আসিবার কথা উত্থাপন হওয়ায় আমার ভরসা হইল। আমি নিশ্চয় জানিতাম, তুমি আসিলেই আমি হস্ত-পদাদি চালনা করিতে পারিব, তাহা না হয় অন্তত তুমি কোন মতে আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবে। যাহারা এক্ষণে উপস্থিত আছে, ইহারা তোমার আগমন শব্দ প্রথমে কেহই শুনিতে পায় নাই। তোমার আসিবার সময় অতীত হইয়াছে বলিয়া ইহারা যখন বাদানুবাদ করিতে ছিল, আমি তখন তোমার অশ্বপদধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলাম; কিন্তু আমার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না।

বৃদ্ধ এই পরিচয় দিয়া বলিলেন, তাহার পর পাদরি ক্রমে আরোগ্য লাভ করিয়া অদ্যাপি জীবিত আছেন। এক্ষণে মহাশয়েরা বিচার করিয়া দেখুন, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেহের সৎকার করা অনুচিৎ কিনা।

কেহ কেহ বলিলেন, আপনি যে পরিচয় দিলেন, তাহা মহাশয় কোথায় শুনিয়াছেন? আমরা জানি না, কিন্তু এ অদ্ভুত ঘটনা যদি মহাশয়ের বিশ্বাস্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেহ সংকার সম্বন্ধে একটা সময় নির্দিষ্ট করা উচিত।

বৃদ্ধ পুনরায় উঠিয়া বলিলেন, যে পরিচয় দিলাম তাহা আমার আপনার পরিচয়। যে পাদরির মৃত্যু হইয়াছিল বলিলাম, সে পাদরি আমি স্বয়ং, অন্য নহে। আমি যে অদ্য আপনাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এই কথা কহিতেছি, তাহা কেবল, আমার সংকারের বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া, নতুবা আমি কবে মাটি হইয়া যাইতাম।...

এইরূপ ঘটনা আরও অনেক ঘটিয়াছিল। একবার একজন ধনবান সাহেবের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সাহেব অতি সমৃদ্ধি সহকারে তাহার গোর দেন। যাহারা শব বহন করিতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন অলক্ষ্যে দেখিল যে, শবের হস্তে একটি বহুমূল্যের অঙ্গুরি রহিয়াছে এবং তাহা কেহ খুলিয়া লইল না। এই ব্যক্তি লোভপরবশ হইয়া রাত্রিযোগে সমাধিস্থলে আসিল। কেহ কোথায় নাই, সকল নিস্তব্ধ দেখিয়া শববাহক ধীরে ধীরে গোর খনন করিতে লাগিল। সে শবের বাক্স ভাঙ্গিয়া মৃতব্যক্তির অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরি মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু পারিল না। তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া একখানি শাণিত ছুরিকার দ্বারা অঙ্গুলিটি কাটিয়া অঙ্গুরি বাহির করিয়া লইল। কিন্তু অঙ্গুলি কাটিবামাত্র রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, চোর তাহা কিছুই দেখিতে পাইল না, কেবল তাহার বোধ হইল যেন মৃতদেহ একটু নড়িল। চোর প্রথমে ইহা ভৌতিক ব্যাপার মনে করিয়া পলায়নোন্মুখ হইল। এই সময় এক দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার কর্ণগোচর হইল। চোর না পলাইয়া বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া যাহা দেখিল, তাহা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে যাইয়া বলিল। সাহেব তৎক্ষণাৎ লোক সহকারে তথায় আসিয়া দেখিলেন, তাহার স্ত্রী উঠিয়া বলিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দুর্বলতা প্রযুক্ত পারিতেছে না। স্বামী নিকটবর্তী হইলে তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন, 'আমায় শীঘ্র ঘরে লইয়া চল, আমায় কোথায় আনিয়াছ? এখানে আমার বড় কষ্ট হইতেছে।

আর আমার অঙ্গুলিতে কিসের আঘাত লাগিয়াছে বড় জ্বলিতেছে।' সাহেব এই সকল কথা শুনিয়া নয়নাশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রিয়তমাকে গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় যত্নে এবং শুশ্রূষায় মেমসাহেব শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিলেন। তাহার পর তিনি বহুদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার অনেক সন্তান-সন্ততি হইয়াছিল।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। সম্প্রতি বিলাতে একজন সাহেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার আত্মীয়েরা খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রথানুসারে তাহাকে বাক্সে বদ্ধ করিলেন। বাক্সে পেরেক মারিয়া তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দিয়া আবৃত করিয়া রাখিলেন। বৈকালে সমাধি ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইবে, এই সংবাদ জ্ঞাতি কুটুম্ব ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিকট পাঠান হইল। আত্মীয়গণ ক্রমে ক্রমে আসিতে লাগিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন আসিয়াই মৃত ব্যক্তিকে একবার দেখিতে চাহিলেন। কতদিন তাহাকে দেখেন নাই, আর কখনও দেখিতে পাইবে না, এ জন্মের মত একবার দেখিতে চাওয়া নিতান্ত অন্যায় নহে বলিয়া সকলেই বাক্স খুলিতে অনুরোধ করিলেন। ছুতার ডাকাইয়া বাক্স খোলা হইল, কিন্তু খুলিয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইল। মৃতদেহ যে পার্শ্বে এবং যে অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছিল তাহা আর নাই ; শব পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া রহিয়াছে, আর তাহার গাত্র বস্ত্র খণ্ড খণ্ড হইয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিবামাত্র সকলেরই প্রতীতি হইল যে, প্রথমে যখন মৃত ব্যক্তিকে সমাধি বস্ত্র পরাইয়া বাক্স বদ্ধ করা হয় তখন তিনি বাস্তবিক মরেন নাই, মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন, আত্মীয়েরা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাহার পর এক সময় তাঁহার চেতনা হইয়াছিল, কিন্তু তখন তিনি বাক্সে বদ্ধ ; তাঁহার চেতনা হইয়াছে একথা তিনি কাহাকেও জানাইতে পারেন নাই, বাক্সও ভাঙ্গিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। নিরুপায় হইয়া যন্ত্রণায় বস্ত্র পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন। এ অবস্থায় বলিতে হইবে তাঁহার মরণের হেতু তাঁহার আত্মীয়গণ। ··

'নিদ্রা, প্রবন্ধটিতেও 'সৎকারে'র ন্যায় এইরূপ বিদেশী কাহিনী রয়েছে। এই সব কারণে ভ্রমরে প্রকাশিত 'নিদ্রা' প্রবন্ধটিকে সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা বলে আমি মনে করি।]

ভূতের জাতি

[সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'পালামৌ'য়ে লিখেছেন—'সাধুদের গৃহিণারা নাকি সাধুভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁহারা বলেন, সাধুভাষা অতি অসম্পন্ন. এই ভাষায় গালি চলে না, ঝগড়া চলে না, মনের অনেক কথা বলা যায় না।'

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'বিবাহের ঘটকালি' প্রবন্ধেও লিখেছেন—'গৃহিণীরা ইদানীং সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছেন।...বিবাহের সম্বন্ধেও তাঁহারা কর্তা।...কেবল পাস করা পাত্র অনুসন্ধান করিলে বিবাহ সুবিবাহ হইবে, এরূপ বিবেচনা গৃহিণীরা না করিলে ভাল হয়।'

এখানে এই দ্বিতীয় উদ্ধৃতির মধ্যেকার শেষ বাক্যটি 'বিবাহের ঘটকালি' প্রবন্ধের শেষ বাক্য।

সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত ১২৮৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'ভূতের জাতি' নামে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গদর্শনের অধিকাংশ প্রবন্ধের ন্যায় এই প্রবন্ধের সঙ্গেও লেখকের নাম নেই। তবে 'ভূতের জাতি' প্রবন্ধের শেষে এই কথাগুলো আছে—'এক্ষণে আমাদের কেবল আপনাদের নিজের প্রতি দৃষ্টি। তাহার মূল কারণ, এক্ষণকার গৃহিণীরা স্বার্থপর হইয়াছেন।...'

পালামৌ এবং বিবাহের ঘটকালি প্রবন্ধ দুটির ন্যায় 'ভূতের জাতি' প্রবন্ধেও 'গৃহিণী'র কথা দেখে মনে হচ্ছে, এই প্রবন্ধটিও সঞ্জীবচন্দ্রেরই রচনা। 'গৃহিণী'র কথা ছাড়াও আমার এরূপ মনে করার আরও কারণ হ'ল—

১। সঞ্জীবচন্দ্র সাধারণত যেরূপ পড়াশুনা করে ও নানা তথ্য দিয়ে নতুন নতুন ধরণের প্রবন্ধ লিখতেন, এই 'ভূতের জাতি' প্রবন্ধটিও সেই রকমের। গল্প, উদাহরণ ও তথ্যে ভরা সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত 'সংকার' প্রবন্ধের ন্যায়ই এই 'ভূতের জাতি' প্রবন্ধটি।

২। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর রচনায় সাধারণত 'এখন' বা 'এখনকার' শব্দ ব্যবহার না করে 'এক্ষণে' বা 'এক্ষণকার' শব্দ ব্যবহার করতেন। সেই এক্ষণ ও এক্ষণকার শব্দ দুটিই এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। সঞ্জীবচন্দ্রের অধিকাংশ প্রবন্ধেই মাঝে মাঝে যে একটা হাল্কা কৌতুক বা রহস্য থাকে, এই প্রবন্ধে তাও আছে।

৪। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর সব প্রবন্ধের শেষেই যেমন নিজস্ব একটা মতামত বা বক্তব্য রাখতেন, এই প্রবন্ধেও তা রয়েছে।

৫। ভাষার ও বক্তব্যের সরলতা ও সহজবোধ্যতা সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় যেটা প্রধান গুণ, সেই গুণ এই প্রবন্ধে পুরাপুরি বর্তমান।

৬। আমরা দেখেছি, সঞ্জীবচন্দ্র দেশ-বিদেশের সমাজতত্ত্বের বই পড়তেন। এই প্রবন্ধে তাঁর সেই পড়ার যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

৭। সঞ্জীবচন্দ্রের নানা প্রবন্ধে বাঙ্গালী জাতির জন্য তাঁর যে দরদ ও আন্তরিকতা দেখা যায়, এই প্রবন্ধেও তা আছে।

এই সকল কারণে 'ভূতের জাতি'কে আমি সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলেই মনে করি। প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করছি—]

ভূতের জাতি

ভূতের জাতি বলিলে কাহাদের বুঝায়, তাহা বাঙ্গলায় বড় বলিয়া দিতে হয় না। বুদ্ধিমান বাঙ্গালীরা তাহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কাফ্রি ও অন্যান্য দেশে ভূতের জাতি সাহেবদের বলে। (Krumen call Europeans the Ghost-tribe—Burton.) মঙ্গোপার্ক আফ্রিকার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া দুইজন কাফ্রি রুদ্ধশ্বাসে পলায়, প্রায় অর্ধক্রোশ গিয়া আর দুই চারিজন স্বদেশীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের ভয় যায়। কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রিরা মঙ্গোপার্ক সাহেবকে যে ভূত মনে করিয়াছিল, তাহা কেবল তাঁহার বর্ণের দোষে। কাফ্রিরা মনে করে মনুষ্যের কখন শ্বেতবর্ণ হইতে পারে না; শ্বেতবর্ণ ভূতের। অনেক স্থানে ভূত আর শ্বেত মনুষ্য উভয় অর্থে এক শব্দই প্রয়োগ হয়।

কেবল কাফ্রিরা কেন, দক্ষিণ সমুদ্রের উপদ্বীপে যত কৃষ্ণবর্ণ জাতি বাস করে, সকলেরই বিশ্বাস মনুষ্য মরিয়া ভূত হয়; কিন্তু ভূত হইলে বর্ণ ভিন্ন আর কিছুরই পরিবর্তন হয় না। মনুষ্য অবস্থায় যে আকার, যে প্রকার, যে বয়স ছিল, তাহা সকলই থাকে, কেবল বর্ণ পরিবর্তন হয়। সাহেবদের মধ্যে কাহাকে তাহারা দেখিলে কাজেই মনে করে, এ ব্যক্তি পূর্বে আমাদের মধ্যে একজন ছিল, মরিয়া এই দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ ভূত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ একজন মরিল, অমনি তাহারা নিশ্চয় বুঝিল যে, সাহেবদের মধ্যে একজন বাড়িল। সাহেবদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ইহা তাহারা অনেকে বিশ্বাস করে না। ভূত ত জন্মে না, তাহারা বলে মনুষ্য যে বয়সে মরে, প্রেতদশায় সেই বয়স প্রাপ্ত

হয়। কাজেই সাহেবদের জন্ম হয় না। যদি তাহারা সাহেবদের শিশু দেখে তাহা হইলে মনে করে অবশ্য তাহাদের কাহার শিশু মরিয়াছিল। যুবাসাহেব দেখিলে সেইরূপ মনে করে যুবার ভূত।

একবার অষ্ট্রেলিয়া দেশে পুত্রশোকাকুলা একজন বৃদ্ধা (Sir George Grey) সর্ জর্জ গ্রেকে দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হয়। তাহার নিশ্চয় ধারণা হয় যে, তাহার মৃত পুত্র আসিয়াছে। অতএব সর্ জর্জকে বৃদ্ধা কতই আদর করিয়াছিল।

একবার টমসন সাহেবের মেমকে দেখিয়া অষ্ট্রেলিয়ার একাংশের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই চিনিয়াছিল যে, কিছুদিন পূর্বে মেমসাহেব তাহাদের মধ্যে একজন ছিল। তখন মনুষ্য ছিল, জীবিত ছিল। এক্ষণে বেচারা আর মনুষ্যও নাই, জীবিতও নাই, খাঁটি ভূত হইয়াছে। বাস্তবিক তাহারা মনে করিতে পারে যে, শ্বেতকায় পুরুষেরা যদি ভূত না হবে, তবে তাহাদের এত ক্ষমতা, এত বৈভব কিরূপে হইল?

বন্যজাতিরা সাহেবদের কেন ভূত বলে তাহার কারণ (Bonwick) বনউক সাহেব এই অনুভব করেন যে, বন্যরা মৃতমনুষ্য আহারের পূর্বে ছাল ছাড়াইবার সময় দেখে যে. তাহার ভিতর শাদা। অতএব শাদাই যে ভূতের বর্ণ ইহা তাহাদের নিশ্চয় বোধ হইয়া পড়ে।

আমাদের ভূতের শ্বেতবর্ণ কি কৃষ্ণবর্ণ তাহার নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু আমাদের মনুষ্য মরিলেই যে ভূত হয়, ইহার নিশ্চয়তা আছে। তাহারা দৌরাত্ম্য করে, গাছ ভাঙ্গে, ছেলেপিলের ঘাড় ভাঙ্গে। তবে বন্য জাতির ভূতের ন্যায় তাহারা রীতিমত সংসার করে না। বরং কিছু স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারে। বোধ হয়, কিছু অন্নাভাব, পয়সা কড়ির বড় সংস্থান থাকে না, মৎস্য তাহারা বড় ভালবাসে, অথচ তাহা সংগ্রহ করিতে পারে না। কেহ কোথায় মৎস্য লইয়া যাইতেছে দেখিলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 'দেঁনা দেঁনা' বলিয়া ছুটিতে থাকে। তদ্ভিন্ন আমাদের ভূতের গঠন বড় সুন্দর নহে; ভাল ভাল লোকের মুখে শুনা যায়, তাহাদের পা দুখানি বাঁকা, আর তাহাদের হাসি বড় বিকট। কিন্তু এ সকল বিষয়ে সাহেব ভূতের জিত আছে; সুগঠন, আবার অর্থেরও অভাব নাই। তাহাই বন্যরা বলে যে মরিলে They will jump up white men with plenty of six-pence in their pockets. (Spencer)

বিলাতী ভূত এখন সকল দেশেই ব্যাপিয়াছে, তাহাদের এখন জয় জয়াকার। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র তাহাদের বর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ অপকৃষ্টতার পরিচায়ক, কখনই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পৃথিবীতে প্রধান হয় নাই। যাহারা চিরকাল এ পৃথিবীতে জয়ী, তাহাদের মধ্যে কোন জাতিই কৃষ্ণবর্ণ ছিল না। মিশর দেশে যাঁহারা রাজ্য স্থাপন করিয়া কীর্তিপতাকা তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন না। আফ্রিকা দেশে সকল জাতিই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু মিশরবাসীদের বর্ণ সুন্দর ছিল। তাহাই তাঁহাদের এত প্রতিপত্তি হইয়াছিল। আর্যেরা সাবেক আমলের প্রধান ছিলেন, তাঁহারা সমুদয় ভারতবর্ষ ও ইউরোপ ব্যাপিয়া ছিলেন, সেই আর্যেরা শ্বেতবর্ণ ছিলেন। তাতার জাতিরা চীনরাজ্য জয় করিয়া তথায় বাস আরম্ভ করিয়াছে। তাতারীয়েরা কৃষ্ণবর্ণ নহে। কাফ্রিদের মধ্যে ডেঙ্কা জাতির বিষয়ে সুইনফোর্ড সাহেব বলেন যে, তাহারা কৃষ্ণবর্ণ বটে, কিন্তু আহাদের মধ্যে যাহারা পর্বতে বাস করে, তাহারা বড় কাল নহে, ডেঙ্কা জাতির মধ্যে সেই পার্বতীয়েরাই প্রধান।

লিবিংস্টোন সাহেব বলেন যে, কেবল সূর্যের তাপে লোকে কাল হয় না, সূর্যের উত্তাপ আর ভিজে হাওয়া এই দুই একত্রে মানুষকে কাল করে। আর অনেকে বলেন যে, এই দুই একত্রে লোককে দুর্বল ও নিস্তেজ করে।

পৃথিবীর মধ্যে উত্তর আফ্রিকা, আরবস্থান, পারস্য দেশ, তিব্বত ও মগল দেশ প্রভৃতি সংলগ্ন দেশ সমূহ ইংরেজি মানচিত্রে বৃষ্টিহীন rainless district বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। এই সকল দেশে বড় বৃষ্টি হয় না। ইহাদের হাওয়া কাজেই ভিজে নহে। তথাকার অধিবাসীরা কাজেই কৃষ্ণবর্ণ নহে। ইহারাই চিরকাল পৃথিবী জয় করিয়াছিল। আর্যরাও এই অংশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ প্রথম জয় করেন। পরে তাঁহাদের বংশ ভারতবর্ষের সূর্যতাপে ও জল সম্পৃক্তবায়ু দ্বারা ক্রমে নিস্তেজ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িলে, আবার সেই বৃষ্টিহীন অঞ্চল হইতে বাবর সা প্রভৃতি আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করেন। তাহার পর বাবরের বংশাবলীরও সেই দশা হয়। এক্ষণে আর এক শ্বেতবর্ণ জাতিরা আসিয়া ভারত জয় করিয়াছেন। আর্যদের যে অংশ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিলেন, তাঁহারা জলসম্পৃক্তবায়ুর দোষে নিস্তেজ হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহাদের যে বংশ ইউরোপে বাস করিয়াছিল, এক্ষণে সেই বংশ আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিল। সুবিধার মধ্যে ইংরেজেরা ভারতবর্ষে বাস করিলেন না। বাস করিলে তাহারাও আমাদের মত হইয়া যাইতেন। অন্যে আসিয়া আবার

তাঁহাদের জয় করিত। যাঁহারাই ভারত জয় করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতে বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাই অধঃপাতে গিয়াছিলেন। ইংরেজেরা সে বিপদের পথ ছাড়াইয়াছেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ বাস করিবার একবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কি কারণে তাহার অনুমোদন হইল না, তাহা আমাদের এক্ষণে ঠিক স্মরণ নাই। কিন্তু বোধ হয় এ প্রস্তাব আবার হইবে।

অতিরিক্ত সূর্যতাপ ও তাহার সঙ্গে জলসম্পৃক্তবায়ু এই দুই আমাদের ভারতবর্ষের মূল দুর্ভাগ্য, বিশেষত বাঙ্গলার পক্ষে। রাজপুতানা হইতে দক্ষিণ কতকদূর পর্যন্ত এই স্থানের বায়ু জলসম্পৃক্ত নহে, এইজন্য তথাকার অধিবাসীরা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মুসলমানেরা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট বড় একটা প্রভুত্বলাভ করিতে পারেন নাই। অদ্যাপি ভারতের যাহা কিছু গৌরব আছে, তাহা কেবল এই রাজপুতানা অঞ্চল সম্বন্ধে।

বাঙ্গলার উল্লেখ করিতে বড় কষ্ট হয়। সূর্যতাপ আর জলসম্পৃক্তবায়ু বাঙ্গলায় যেরূপ ভয়ানক, সেরূপ অন্য দেশের দুর্ভাগ্য কোথাও ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। চিরকালই এই কারণে, বাঙ্গলা নিস্তেজ রহিয়াছে, চিরকালই হয়ত এইরূপ নিস্তেজ থাকিবে। মহাপরাক্রান্ত আর্যেরা আসিয়া বাস করিলেন, কয়েক পুরুষের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া গেলেন। তাহার পর মোগল পাঠানেরা আসিয়া বাস করিল, তাহাদেরও সেই দশা হইল। যে কয়েক ঘর পর্তুগীজ আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহারাও মাটী হইয়া গিয়াছে। উপহাস করিয়া লোকে তাহাদের এক্ষণে মেটে ফিরিঙ্গি বলে।

বাঙ্গলার বায়ু কস্মিনকালে যে সংশোধিত হইবে না, এমত ঠিক বলা যায় না। দেখা যাইতেছে, কোন কোন দেশের বায়ু কৌশল দ্বারা কতকাংশে সংশোধিত হইয়াছে। যেখানে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইত, সেখানে জঙ্গল কাটায় বৃষ্টি কমিয়াছে। বাঙ্গলায় সেরূপ অরণ্য নাই, এখানে বৃষ্টির হেতু বোধ হয় আসাম ও ভূটানের পর্বতশ্রেণী। অতএব জঙ্গল কাটিলে বৃষ্টি কমিবে না, তবে প্রয়ঃপ্রণালী বিশেষ মত নূতন করিতে পারিলে বোধ হয় বৃষ্টির দোষ অর্থাৎ ভিজে মাটি কতক কমিতে পারে। মাটি ভিজে থাকিলে বায়ু ভিজে থাকিবার কতক সম্ভাবনা।

কৃষিকার্যের নিমিত্ত খাল কাটাইবার প্রস্তাব হইয়া থাকে, কিন্তু বায়ু শুষ্ক রাখিবার নিমিত্ত ড্রেনেজ হওয়া উচিত। অন্তত ড্রেনেজ দ্বারা বায়ু শুষ্ক হইতে পারে কিনা তাহার মীমাংসা করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানবিৎদের একত্র-

করা উচিৎ। তাঁহারা একত্র হইয়া যদি কিছু স্থির করিতে না পারেন, তথাপি কি উপায়ে বাঙ্গলার জলসম্পৃক্তবায়ু নষ্ট হইতে পারে, তাহার একটা অনুভব হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে যতদিন আমাদের পরস্পর নিজের প্রগাঢ় যত্ন না হইবে, ততদিন কোন ভরসা নাই। এক্ষণে ভাল মন্দ সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করা আমাদের অভ্যাস পাইয়াছে। সুশাসনের প্রধান দোষই এই। গবর্ণমেণ্টের উপর যত শ্রদ্ধা বাড়ে, আপনাদের চেষ্টা তত কমে। এক্ষণে আমরা আপনাদের মঙ্গল জন্য কোন চেষ্টা করি না। করিতে পারিও না। মনে করি যদি আবশ্যক হয়, তবে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট অবশ্য তাহা করিবেন।

সুশাসনের নিমিত্ত আমরা যে অকর্মণ্য হইতেছি, তাহা গবর্ণমেণ্ট কতক বুঝিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে তাহার অন্যথা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যাহা আমাদের সম্বন্ধে বুঝিয়াছেন, আমরা তাহা এখনও বুঝি নাই। আমাদের লেখাপড়া শিক্ষা হইতেছে, কিন্তু সামাজিকতা লোপ পাইতেছে। দেশের ইষ্ট নিমিত্ত আমরা আর কোন কার্য করিতে পারি না। আমাদের পূর্বপুরুষ যতদূর সামাজিক ছিলেন, আমরা আর ততদূর নহি। এক্ষণে আমাদের কেবল আপনাদের নিজের প্রতি দৃষ্টি, তাহার মূল কারণ, এক্ষণকার গৃহিণীরা স্বার্থপর হইয়াছেন; কিন্তু সেই স্বার্থপরতা অবলম্বন করিয়া যদি বলা যায় যে, বাঙ্গলার বায়ু শুষ্ক করিতে পারিলে তাঁহাদের সন্তানেরা সুন্দর হইবে, তাহা হইলে কি হয় বলা যায় না।

[রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন—'তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে-লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দ বেগেই লিখিত; ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া। এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে, তাহার পরে সেই মুখে-বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরও অল্প লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।'

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই বইয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের যে ক'টি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করেছি, পাঠক-পাঠিকারা সেইগুলিই পড়বার সময় নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন,—সঞ্জীবচন্দ্র এক অসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভার বলে 'কথা কহার অজস্র আনন্দবেগেই' প্রবন্ধগুলি লিখে গেছেন এবং যেন বরাবরের জন্যই ছাপার অক্ষরে আসরও জমিয়ে রেখে গেছেন।

এই বইয়ের পাঠক-পাঠিকারা আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন যে, সঞ্জীবচন্দ্র যেমন প্রচুর পড়াশুনা করা মানুষ ছিলেন, তেমনি একজন সত্যকার স্বদেশ-দরদী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাশীল লেখকও ছিলেন।]